বৃন্দাবন-কথা

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত।

উৎসর্গ

পরমারাধ্যা স্বর্গীয়া জননী-দেবীর

শ্রীচরণ-কমলে—

মা! তোমার সঙ্গে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক তীর্থ দেখিয়া আসিলাম। গৃহে ফিরিয়া স্থির হইল যে, দক্ষিণাপথে রেল খুলিলে, তোমাকে লইয়া সেদিকে তীর্থ-দর্শনে যাইব। যখন সেদিকে রেল খুলিল, যাত্রার আয়োজন করিতেছি, সেই সময়ে তুমি অকস্মাৎ এই অভাগাকে কাঁদাইয়া, অমরধামে চলিয়া গেলে। তোমাকে পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া, মনে বড় ক্ষোভ রহিল। অগত্যা পুরীধামে যাইয়া, স্বর্গদ্বার ঘাটে, তরুণ-অরুণ-উদয়কালে, তরঙ্গ-তাড়িত লবণাম্বু-সিক্ত সৈকতে বসিয়া, সাগর-সলিলে নয়ন-সলিল মিশাইয়া, সস্ত্রীক তোমার করে মহাপ্রসাদ নিবেদন করিয়া, সে মনঃক্ষোভ কথঞ্চিৎ প্রশমিত করি। আর আজি এই অকিঞ্চিৎকর বনকুসুমাঞ্জলি তোমার চরণে সমর্পণ করিতেছি।

মা! নদীয়ার সেই প্রেমিক সন্ন্যাসী-সমর্পিতা উজ্জ্বল পীযূস-রস-পরিপ্লাবিতা মধুর-সাধনা শিখিবার লোভে, আমি ত কয়েকবার বৃন্দারণ্যে ছুটিয়াছিলাম। কৈ মা! কি শিখিলাম? কি পাইলাম? আমি কি "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে! হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত! ভ্রাম্যতি, কিং করোম্যহং?" বলিয়া প্রাণকান্তের চরণপ্রান্তে পঁহুছিতে পারিলাম? না আত্মহারা প্রাণে সর্ব্বজীবে সেই আনন্দঘনের সত্বা

দেখিতে শিখিলাম? ও সকল ত অনেক দূরের কথা,—কৈ মা! এই পাষণ্ড পামর হৃদয়টাকে, তৃণাদপি সুনীচ, তরোরিব সহিষ্ণু, অমানী মানদ করিতে পারিয়াছি কি? অকপট অন্তরে "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে" বলিতে পারি কি? বিষয়-বাসনা-পিপাসিত রসনায় "মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ" বলিয়া, আমি সচ্চিদানন্দের সেই প্রেমময় উচ্চ নাম কি করিয়া উচ্চারণ করিব? আমি কি কখন, আত্মভোলা প্রাণে নিষ্কাম পরহিতব্রত পালন করিয়াছি যে, অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিব? বল মা! সেই রসময়ের চরণে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করিয়া, কেবল তিলক-মালা-কন্থা-কৌপীনে এ দেহটাকে সাজাইলেই কি আমি বৈষ্ণব-নামের যোগ্য হইব? আমার অসংযত চিত্ত হইতে আজিও সে স্বার্থাভিমান-দম্ভের মালিন্য ও বিলাস-লালসার কলুষভাব ত ঘুচে নাই। তবে এ ছোট মুখে, কোন্ সাহসে সেই সব বড় কথা আনিব?

অসহায় শৈশব সময় হইতে আশাকাঙ্ক্ষাতৃষিত কণ্ঠে তোমায় যে নামে ডাকিয়াছি, সেই স্নেহবিগলিত 'মা' নামই যে মুখে আইসে, সন্তান-প্রতিপালিনী জগজ্জননীকে সেই মধুর মা নামেই যে ডাকিতে জানি। "সর্ব্বান্ কামাংশ্চ দেহি মে" যখন এ অস্থি মজ্জায় বিজড়িত, তখন মা-নাম ছাড়িব কি করিয়া? আমার মা-নামই ভাল। আমি আদার ব্যাপারী, আমারও জাহাজের খবরে কাজ কি? আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে মা!—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া,
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ সদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥

অধম পুলিন

বিনীত নিবেদন

মহর্ষি বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া, কত শত যোগী, ঋষি, কবি, লেখক, সাধু, সাধকজনেরা ভারতের বিবিধ ভাষায়—পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, নাটক, গীতি, গাথায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী কীর্ত্তন করিয়াছেন, শুধু ভারতে কেন? ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি বিপুলা বসুন্ধরার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত, যাঁহার গীতোক্ত দার্শনিক তত্ত্ব সকল আলোচিত হইতেছে, জল-গণ্ডূষ-নিষেকে সেই মহাসাগরের পরিসর-পরিবর্দ্ধন-জন্য এ প্রয়াস নহে।

প্রতিমা-পূজা-বিদ্বেষী ধন-রত্ন-লোলুপ দুর্দ্দান্ত শোষক-পাঠান শাসকেরা করাল কৃপাণ, ও কুলীশ-কঠোর দণ্ড পরিচালনা করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পুরাণোক্ত পবিত্র লীলাভূমিকে * পাঁচ শত বৎসর যাবৎ দেবশূন্য, জনশূন্য, জঙ্গলাকীর্ণ-প্রায় করিয়া দিয়াছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের প্রারম্ভে, বিশেষতঃ উদারচরিত, সর্ব্বধর্ম্মে সমদর্শী আকবর-পাতসাহের সুখশান্তিময় সময়ে ও তাঁহার সহায়তায়—"কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য"—যে সকল বিষয়-বাসনা-বিমুখ ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষেরা সম্মিলিত হইয়া লুপ্ততীর্থ ও গুপ্ত দেববিগ্রহগুলিকে আবিষ্কার করিয়া-

---

* পুরাণাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে জন্মরাত্রিতে গোকুল বা মহাবনে নীত হইয়াছিলেন। আড়াই বৎসর বয়সে নন্দগ্রামে যাইয়া বাস করেন। একাদশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বৃন্দাবন-লীলা, দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত মথুরায় অবস্থান। তৎপরে ষোড়শ বৎসর বয়সে দ্বারকায় চলিয়া যান, ও ১২৫ বৎসর বয়সে লীলা সম্বরণ করেন। এখানে আমরা লীলাভূমি অর্থে, কেবল মহাবন নন্দগ্রাম, বৃন্দাবন ও মথুরা প্রভৃতি বাল্যলীলার স্থানগুলিকেই উল্লেখ করিতেছি।

ছিলেন, এবং যে সকল স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শিল্পকলানুরক্ত ভগবদ্ভক্ত ভূপতিগণ বিপুল-বিভব-ব্যয়ে সুরম্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, বর্ত্তমান বৃন্দাবনকে শোভাসৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলির বিবরণই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। সংক্ষেপে, এখানি বৃন্দাবনের ইতিহাস, লীলা-বর্ণনাত্মক কাব্য নহে।

তবে যে দেশে অতিরঞ্জিত অনৈসর্গিক ঘটনা-মালা-পরিপূর্ণ পুরাণাদি সত্য ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া আছে, সে দেশের জনপ্রবাদ-কথাগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে চলে না, মুখে মুখে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইলেও, সেগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি না, সেই জন্য এ গ্রন্থে সেগুলিকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়াছি। উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা, বা না করা, পাঠকের স্বেচ্ছাধীন।

যতদূর পারিয়াছি, ভারত-ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি ; তবে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি নাই।

মুনিগণের মধ্যেই যখন "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং", তখন সাধারণ জনগণ মধ্যে মতভেদ অনিবার্য্য ; সে জন্য চিন্তা নাই। তদুপরি, এ ক্ষুদ্র অধম অযোগ্য লেখকের যে ভ্রম প্রমাদ থাকিবে না, তাহাও অসম্ভব। তবে ভবিষ্যতে কোন সুযোগ্য সুলেখক সে ভ্রমগুলিকে 'নেতি নেতি' ভাবে অপনীত করিয়া, সত্যে উপনীত হইতে পারিবেন, ইহাই আমার কামনা। সত্য নিরূপণের ইহাই প্রশস্ত পন্থা।

গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ—নানা কারণে আমাকে, ইং ১৮৮০ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত, সাতবার বৃন্দাবনধামে যাইতে হইয়াছে। প্রথম চারিবার সাধারণ তীর্থযাত্রীর মত দর্শনাদি করিয়া আসি। ৫ম বারে ১৯১২ সালে চৈত্রমাসে বৃন্দাবনে যাইয়া, একজন প্রাচীনা ব্রজ-বাসিনীর নিকট হইতে গীতগোবিন্দ, ব্রহ্মসংহিতা, উপাসনা-পদ্ধতি

প্রভৃতি কয়েকখানি পুথি, ও আনন্দবল্লভ ফটোগ্রাফারের তোলা কতকগুলি সুরম্য কারুকার্য্যখচিত মন্দিরের চিত্র, ক্রয় করিয়া আনি। গ্রন্থকয়েকখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়াছি; এবং ফটোগ্রাফগুলি তথাকার সদস্যগণকে প্রদর্শন করি।

১৯১৫ সালে হোলির সময় বৃন্দাবনে যাইয়া, এক মাস থাকিয়া, হোলি উৎসব ও কুম্ভমেলা দর্শন করি। এবারে তথাকার কিছু কিছু বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনি। এই সময়ে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকার মাননীয় সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়, তিনি আমার আনীত ফটোগুলি দেখিয়া, ঐ সকল মন্দিরের বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। আমি না জানি বৃন্দাবনের বিবরণ, না পারি প্রবন্ধ লিখিতে, কি ছাই লিখিব? তবে তাঁহার উৎসাহবাক্যে মনে কেমন একটা উন্মাদনা উপজিল। বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে পড়িতে আরম্ভ করিলাম, ও ১৯১৬ সালে পুনরায় হোলির সময় বিবরণ-সংগ্রহ জন্য বৃন্দাবনে গেলাম।

এবার তথাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সার্ব্বভৌম, বনমালীলাল গোস্বামী, ও রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়দিগের নিকট পরিচিত হইলাম এবং তাঁহাদের চরণপ্রান্তে বসিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ শ্রদ্ধাস্পদ বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয় পুত্রস্নেহে আমাকে, অপরের অজ্ঞাত অনেক তথ্য বলিয়া দিলেন; তাঁহাদের গৃহে রক্ষিত প্রায় চারিশত বৎসরের পুরাতন 'সেবা-প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়' নামক জীর্ণ শীর্ণ পুথি হইতে, কোন্ সময়ে মদনমোহন, গোবিন্দদেব ও রাধা-দামোদর প্রভৃতি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের ঠাকুরগুলি স্থাপিত হইয়াছিল, এবং রূপ, সনাতন, জীব, গোপালভট্ট, রঘুনাথ দাস, প্রভৃতি গোস্বামীগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব কাল অবগত হইতে পারিলাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে

আমাদের অভিজ্ঞ প্রবীণ ব্রজবাসী—প্যারীলাল চৌঁটীওয়ালা মহাশয়ের সঙ্গে মন্দিরে মন্দিরে, কুঞ্জে কুঞ্জে, আখড়ায় আখড়ায়, বেড়াইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে লাগিলাম।

এই সময়ে ৪।৫ দিন মথুরায় যাইয়া, তথাকার প্রাচীন দেবালয়গুলি ও গবর্ণমেণ্টের আয়োজনে খনিত বৌদ্ধ যুগের স্তূপাদি দেখিয়া আসি। মথুরার যাদুঘরেও দুই দিন কাটাই। ইহা ব্যতীত চারিশত হইতে দুই হাজার বৎসরের পুরাতন পাষাণ-রচিত কয়েকটি ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করিয়া আনি। সেগুলি এই—

(১) মথুরার কঙ্কালী টীলা হইতে অনুমান ১৫ শত বৎসরের পুরাতন ভগ্ন নারী হস্ত। (২) কেশব দেবের পুরাতন মন্দির (যাহা ভাঙ্গিয়া আওরঙ্গজেব মস্‌জীদ করিয়াছেন) হইতে ভগ্ন গোমুণ্ড। (৩) মানসিংহ নির্ম্মিত গোবিন্দজীর মন্দির হইতে, অর্দ্ধবিকশিত কমল-কোরক। ও (৪) ভরতপুরের পাথরে খোদিত কয়েকটি লতাপাতা।

এই অঞ্চলে কোন ভগ্নাবশেষ (relic) আবিষ্কৃত হইলে, গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামত সে সমস্তই যাদুঘরে পাঠাইতে হয়। কাজেই অধিক পাওয়া যায় না।

মথুরা মণ্ডল হইতে কোন ধ্বংসাবশেষ আনিতে হইলে, মথুরার যাদুঘরের কিউরেটার পণ্ডিত রায় রাধাকিষণ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া আনিতে হইবে, নতুবা দণ্ডনীয় হইতে হয়। সুতরাং তাঁহার নিকট অনুমতি আনিতে যাইয়া আমার দুইটি লাভ হইল। ১ম—তিনি আমাকে মাঠ গ্রামে (যথা কনিষ্কের মুণ্ডহীন মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন) প্রাপ্ত একটি কৃষ্ণপ্রস্তর রচিত নারীমস্তক উপহার দিলেন, ২য়—ইংরাজী কোন্ কোন্ গ্রন্থে, মথুরার বৌদ্ধযুগের কথা পাইব, তাহাও বলিয়া দিলেন। কলিকাতায় আসিয়াও কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গোস্বামী মহাশয়-

দিগের নিকট গিয়াছি। ধ্বংসাবশেষগুলি প্রস্তাবিত রমেশ ভবনের জন্য পরিষদে পাঠাইয়া দিয়াছি।

সেই সকল গ্রন্থ পাঠ ও অনুসন্ধানের ফল, ব্রজকাহিনী নাম দিয়া, "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। ইচ্ছা ছিল—বৃন্দাবন, মথুরা ও বনযাত্রার সকল কথাই একত্র প্রকাশ করিব। কিন্তু শেষ দুইটির অনেক কথা, এখনও জানিতে বাকি আছে। আর একবার না দেখিয়া আসিলে, তাহা বলিতে পারিব না, এজন্য এখন কেবল "বৃন্দাবন-কথা" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। পরে যদি বাঁচিয়া থাকি, ও ভগ্নস্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হই, তবেই অবশিষ্ট কথা বলিতে পারিব। নচেৎ এই পর্য্যন্ত!

মানসীতে প্রকাশিত হইবার পর, টীকাসমেত অনেক বিষয় এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে! এ পুস্তকে আর কিছু হউক বা না হউক, যাঁহারা বৃন্দাবন দেখিতে যাইবেন, তাঁহারা ইহাকে সহচর (guide) রূপে ব্যবহার করিতে পারিবেন। আর যাঁহারা তথায় যাইবেন না, তাঁহারাও গৃহে বসিয়া বৃন্দাবনের অধিকাংশ বিষয় জানিতে পারিবেন, ইহাই আমার বিশ্বাস।

জরা-জীর্ণ রোগ-শীর্ণ ক্ষীণদৃষ্টি লেখকের প্রুফ-সংশোধন ত্রুটি পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন, ইহাও আমার প্রার্থনা।

১নং সিকদারপাড়া লেন,
কলিকাতা
২রা জানুয়ারী, ১৯২০

শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত

লেখ্য-সূচি

পরিচ্ছেদ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	পৌরাণিক ও সাধারণ কথা, চৈতন্যদেব, বর্ত্তমান বৃন্দাবন	১
২।	গোবিন্দদেব, রূপ গোস্বামী, আকবর, মানসিংহ …	২৩
৩।	মদনমোহনজী, সনাতন গোস্বামী, কৃষ্ণ দাস কর্পূর	৫১
৪।	গোপীনাথজী, জাহ্নবা ঠাকুরাণী, রায়সিংহ …	৬৯
৫।	রাধাদামোদরজী, জীবগোস্বামী … …	৭৭
৬।	রাধারমণজী, গোপাল ভট্ট, শ্রীনিবাস আচার্য্য	৮৪
৭।	রাধাবিনোদ, গোকুলানন্দ, লোকনাথ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর, রঘুনাথ ভট্ট, রঘুনাথ দাস গোস্বামী	৯৬
৮।	শ্যামসুন্দরজী, শ্যামানন্দ গোস্বামী ও ব্রজমণ্ডলের পরিচয়	১১১
৯।	বাঁকেবিহারী জী, হরিদাস স্বামী, তানসেন …	১২৭
১০।	রাধাবল্লভজী, হিত হরিবংশ … …	১৩৪
১১।	যুগলকিশোরজী, হরিরাম ব্যাস, যুগলবিহারীজী …	১৩৯
১২।	বল্লভাচার্য্য, মীরা বাই … …	১৪৪
১৩।	অন্ধ সুরদাস, সুরদাস মদনমোহন, থানেশ্বরী জগন্নাথ	১৫৯
১৪।	তুলসীদাস, শিবলিঙ্গ, সূর্য্যমন্দির, শক্তিপীঠ, নাগপূজা	১৬৫
১৫।	বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ, জয়দেবের মন্দির, সাক্ষীগোপাল	১৭১
১৬।	বংশীবট, অদ্বৈত বট, শৃঙ্গার বট, অক্রূর-ঘাট, ভোজন-টীলা, আমলিতলা	১৮০
১৭।	ধীর-সমীর, উদ্যান, কুণ্ড, বাপী, কূপ … …	১৯৩
১৮।	দ্বাদশ আথরা, মোনীদাসের টাটী, জ্ঞান গুদরী, যমুনা-পুলিন, চৌষট্টিমোহান্তের সমাজ	১৯৯
১৯।	আওরঙ্গজেবের উপদ্রব, জয়সিংহ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, জয়পুর, ভরতপুর ও অহল্যা বাঈয়ের দেবালয়	২১০

২০।	ইংরাজ-আমলে প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরাদি ...	২৩৮
২১।	শেঠদের মন্দির	২৫৬
২২।	সাহজীর মন্দির	২৬৭
২৩।	উপসংহার, ঘাট, পল্লী, সনাঢ্য, গোরহে-ছত্রী	২৭৩
	পরিশিষ্ট, তীর্থযাত্রীর করণীয়	২৮২

চিত্র-সূচি

১।	আদি কৃষ্ণ-মূর্ত্তি (টাইটেল পেজ) বিবরণ টীকায় ...	১৮২
২।	বৃন্দাবন-দৃশ্য—ঘন বসতি	[illegible]
৩।	রূপগোস্বামী-আবিষ্কৃত গোবিন্দদেব	৩১
৪।	মানসিংহ-বিনির্ম্মিত গোবিন্দদেবের পুরাতন মন্দির ...	৩৫
৫।	হিন্দুবেশে আকবর	৪[illegible]
৬।	মানসিংহ	৪৩
৭।	পুরাতন মন্দিরের ভিত্তি-বিন্যাস	৪৬
৮।	বৃন্দাবনের মদনমোহনজী	৫৯
৯।	গুণানন্দ-নির্ম্মিত মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির ...	৬২
১০।	গোপীনাথজী (সঙ্গিনী-পরিবৃত)	৭৩
১১।	জীবগোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের সমাধি	৮৩
১২।	রাধারমণজী	৯৩
১৩।	লোকনাথ ও নরোত্তমের সমাধি	১০৩
১৪।	রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাধি	১১০
১৫।	ব্রজমণ্ডলের মানচিত্র	১১৭
১৬।	মথুরার বিশ্রাম-ঘাট	১১৯
১৭।	যমুনা হইতে মথুরার শোভা	১২৩
১৮।	হরিদাস স্বামী— (তানসেনের গুরু) ...	১২৮

১৯। বাঁকেবিহারীজীর মন্দিরের ফটক ১৩২
২০। হিত হরিবংশ গোস্বামী ১৩৫
২১। রাধাবল্লভজীর ঝুলন ১৩৮
২২। যুগলকিশোরজীর মন্দির ১৪২
২৩। বল্লভাচার্য্য ১৪৬
২৪। মীরাবাই ১৫৫
২৫। বলদেবের শেষ মূর্ত্তি ১৭২
২৬। চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ ২১১
২৭। সওয়াই জয়সিংহ (দ্বিতীয়) ২২০
২৮। জয়পুর মান-মন্দির (২৯) জয়পুর রাজপথ ... ২২২
৩০। লক্ষ্মীরাণী-বিনির্ম্মিত কেশীঘাট (৩১) সুরজমল ... ২৩২
৩২। মল্‌হর রাও হোলকার ২৩৫
৩৩। শিবপূজানিরতা অহল্যা বাই (৩৪) চীর বা চৈন-ঘাট ২৩৭
৩৫। লালাবাবুর মন্দির ২৪৩
৩৬। ব্রহ্মচারীর মন্দির ২৪৭
৩৭। লালা ব্রজকিশোরের মন্দির ২৪৯
৩৮। শেঠদের মন্দির ২৫৭
৩৯। শ্রীরঙ্গনাথজী (৪০) গোদম্বা দেবী (৪১) রঙ্গাচার্য্য ২৫৯
৪২। শেঠেদের রথ (৪৩) বিষ্ণুধ্বজ বা সোণার তালগাছ ২৬১
৪৪। গজেন্দ্রমোক্ষণ কুণ্ড ২৬৫
৪৫। সাহজীর মন্দির ২৭১
৪৬। কালীয়দমন ঘাট ২৭৫

বৃন্দাবন-কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বঙ্কিমবাবু 'কৃষ্ণচরিত্রে' ৪র্থ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, "এই বৃন্দাবন কাব্য-জগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিতা পুলিন-শালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত কুঞ্জবন পরিপূর্ণা, গোপ-বালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্য কুসুমামোদ-সুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণ-সমলঙ্কৃতা বৃন্দাবন-স্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়।"

কি সুন্দর সুবিমল সুকোমল, সুমধুর চিত্র! এই কয়েকপংক্তি পাঠ করিবামাত্র মনোমধ্যে কেমন একটি সুপবিত্র ভাবের উদয় হয়!

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাসদ্-কবি জয়দেব বোধ হয়, এই রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক ও বৃন্দাবন-বর্ণনাত্মক গীতি-কবিতাবলী (সংস্কৃত ভাষায়) রচনা করিবার পথ প্রথম প্রদর্শন করেন। তাঁহার পর ও চৈতন্যদেবের শত বৎসর পূর্ব্বে, মৈথিল-কবি বিদ্যাপতি ও নান্নুরের চণ্ডীদাস, নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার পদানুসরণ করেন। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি দুই শতাধিক বাঙ্গালার কবিকুল তাঁহাদের গীতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন; আজিও করিতেছেন।

সেই সকল কীর্ত্তন-পদ বাঙ্গালার প্রতিগ্রামে, প্রতিগৃহে কতই না আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দেয়। বঙ্কিমবাবু সেই জন্যই বৃন্দাবনকে "কাব্য-জগতের অতুল্য সৃষ্টি" বলিয়াছেন।

Washington Irving ইউরোপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, 'Every mouldering stone is a chronicle.' আমরাও তাঁহার ন্যায় বলিতে পারি যে, ব্রজমণ্ডলের প্রত্যেক ক্ষয়শীলপাষাণ-খানিতে ইতিহাস অঙ্কিত আছে।

ব্রজমণ্ডলের কথা বাল্মীকির রচিত রামায়ণে এইরূপ লিখিত আছে। —মধুনামে একজন দৈত্য কঠোর তপস্যা করিয়া, মহাদেবের নিকট হইতে একটি ত্রিশূল প্রাপ্ত হন। তাঁহার পত্নীর নাম কুম্ভনসী। মধু এই স্থানে একটি সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম হইতে এই স্থানের নাম মধুপুরী হইয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম লবণ। ইনিই শিব-দত্ত ত্রিশূলপ্রভাবে ঋষিগণের প্রতি অত্যাচারী হইলে, শ্রীরাম-চন্দ্র তাঁহাকে বধ করিবার জন্য শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করিয়া এই স্থানে প্রথম আর্য্য-রাজধানী স্থাপন করেন।

মহাভারতের সময়ে এখানে উগ্রসেন, কংশ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতেন। রামায়ণের সময় হইতেই এই ব্রজমণ্ডলের নাম শূরসেন-পুরী হইয়াছিল। তাঁহাদের ভাষাকে লোকে শৌরসেনী ভাষা বলিত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে নাটকাদিতে উচ্চবংশীয়া মহিলাগণের মুখে শৌর-সেনী ভাষা (মধুর ব্রজভাষা) দিবার বিধান আছে।

প্রাচীন পুরাণ সকলে ব্রজমণ্ডলের নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা পাওয়া যায়।

কালিদাসের সময়েও ইহার উপবনাদির সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ ছিল; কেন না, তিনি রঘুবংশ-কাব্যে, স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে সুনন্দা-মুখে ইন্দুমতীকে,

বলিতেছেন "বৃন্দাবনে চৈত্ররথাদনূনে"—বৃন্দাবন স্বর্গের চৈত্ররথ-কানন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; এবং "শিখণ্ডিনাং প্রাবৃষি পশ্য নৃত্যং কান্তাসু গোবর্দ্ধনকন্দরাসু"—বর্ষাকালে মনোহর গোবর্দ্ধন-গুহায় ময়ূরগণের নৃত্য দেখিও।) আজিও এ অঞ্চলে ময়ূর বিস্তর।

(শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই, যুধিষ্ঠির মহাপ্রস্থান সময়ে পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরে ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভকে ব্রজমণ্ডলের (মথুরা প্রদেশের) রাজ্য দিয়া যান।

পণ্ডিতগণের মুখে শুনি, "স্কন্দপুরাণান্তর্গত চতুরধ্যায়ী ভাগবত-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে ষোলটি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চারিটি দেব যথা—বৃন্দাবনে গোবিন্দদেব, মথুরায় কেশবদেব, গোবর্দ্ধনে হরিদেব এবং মহাবনে বলদেব; চারিটি গোপাল যথা—গোবর্দ্ধনে শ্রীনাথগোপাল, বৃন্দাবনে সাক্ষীগোপাল, গোপীনাথগোপাল ও মদনগোপাল; চারিটি শিবলিঙ্গ যথা—বৃন্দাবনে গোপেশ্বর, মথুরায় ভূতেশ্বর, গোবর্দ্ধনে চক্রেশ্বর, এবং কাম্যবনে কামেশ্বর; চারিটি দেবীমূর্ত্তি যথা—মথুরায় মহাবিদ্যা, বৃন্দাবনে বৃন্দাদেবী, চীর বা বস্ত্রহরণ ঘাটে কাত্যায়নী এবং সঙ্কেত গ্রামে সঙ্কেতবাসিনী। বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত স্কন্দপুরাণে কেবল গোবিন্দ ও হরি এই দুইটি মাত্র নাম পাই, তবে 'অন্যান্যদেবাদি' শব্দ হইতে অপর দেবমূর্ত্তি ছিল বলিয়া জানা যায়।

সাধারণ ব্রজবাসীরা বলেন যে, বজ্রনাভ তিনটি মাত্র বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে মদনমোহন নির্ম্মাণ করান, তাঁহার চরণ দুইটি শ্রীকৃষ্ণের মত হইয়াছিল। পরে গোপীনাথ বিগ্রহ নির্ম্মিত হইলে তাঁহার বক্ষস্থল শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয়। শেষে যখন গোবিন্দদেব নির্ম্মিত হইলেন, তখন তাঁহার মুখারবিন্দ শ্রীকৃষ্ণের এত সুসদৃশ ও সজীবের ন্যায়

হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া বজ্রনাভের জননী উষাদেবী লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিলেন।)

পুরাণাদি হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত জানিতে পারি। শ্রীকৃষ্ণের অথবা বজ্রনাভের পর ব্রজমণ্ডলে কি ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বা পরবর্ত্তী সংস্কৃত গ্রন্থ সকলে মথুরা ও বৃন্দাবনাদির মাহাত্ম্য বিষয়ক শত শত শ্লোক কীর্ত্তিত হইয়াছে; কোন্ তীর্থে, কুণ্ডে বা নদীতে স্নান, দান করিলে অথবা কোন্ দেবতার প্রণাম, প্রদক্ষিণ বা প্রসাদ ভক্ষণ করিলে, কয়পুরুষ পর্য্যন্ত কোন্ দেবলোকে বাস করিতে পারিবে, তৎসম্বন্ধে অসংখ্য আখ্যান পাওয়া যায়; কিন্তু দেশের প্রকৃত ইতিহাস একছত্রও পাওয়া কঠিন।

রামচন্দ্র অথবা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদির সময়ের পর কত শত যুগ অতীত হইয়াছে। সে সময় আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কি করিয়াছিলেন, কোন্ দেবতার পূজা করিতেন, কিরূপ প্রণালীতে রাজ্যশাসন করিতেন, অথবা তাঁহাদিগকে বৈদেশিক কোন্ কোন্ জাতি আসিয়া উৎপীড়ন করিত, তাহার কোন কথাই আমাদিগের গ্রন্থ মধ্যে পাওয়া দুর্ল্লভ। রোমান্, গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক, বুদ্ধিনিষ্ঠ চৈনিক পরিব্রাজক এবং ধনরত্ন-লোলুপ মুসলমান লুণ্ঠনকারিগণের গ্রন্থ হইতেই আমরা যাহা কিছু দুই একটা ছিন্ন পৃষ্ঠা দেখিতে পাই। হায়! আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যদি ধ্যানদৃষ্ট পরলোকের এতটা বাহুল্য বৃত্তান্ত না লিখিয়া প্রত্যক্ষদৃষ্ট ইহলোকের মুখ্য ঘটনাগুলির কোনরূপ ধারাবাহিক বিবরণ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আর পরবর্ত্তী বংশধরগণকে বহু অনুসন্ধান করিয়া তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা, ভগ্নমূর্ত্তি, শিলালেখ বা কুলগ্রন্থ প্রভৃতি ঘাঁটিয়া, যোড়াতাড়া দিয়া, সংশয়-সঙ্কুল ইতিহাসের খণ্ডিত প্রতিমা খাড়া করিতে হইত না।

গজনিপতি মামুদ ১০১৮ খৃঃ অব্দে মথুরামণ্ডল লুণ্ঠন করেন। ব্রজমণ্ডল ধ্বংস করিয়া গেলে বহুশতাব্দি এ প্রদেশ জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ ও পতিত-প্রায় হইয়াছিল। কদাচিৎ দুই এক জন ধর্ম্মপ্রাণ সন্ন্যাসী ভয়াকুলিত চিত্তে এ সকল স্থান দেখিতে যাইতেন। পূজারীরা কোথাও বনমধ্যে, কোথাও বা কূপ, নদী অথবা সরোবরে, কোথাও মৃত্তিকাভ্যন্তরে দেবমূর্ত্তি সকল লুকাইয়া ম্লেচ্ছভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। দেশ তখন হীনবল শেষ-পাঠান-রাজগণের শিথিল-হস্তচ্যুত হইয়া, খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। তখন মুসলমানগণের প্রলোভনে বা উৎপীড়নে দেশের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ। তদুপরি দস্যু, তস্কর ও ঠগীগণের উপদ্রবে পথ বিপদ-সঙ্কুল। সেই তমসাচ্ছন্ন ঘোর দুর্দ্দিনে একজন 'তৃণ-পর্ণশালাবাসী' 'কৌপীনধারী' বাঙ্গালী সন্ন্যাসী—শ্রীচৈতন্যদেব—ব্রজমণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ও গুপ্তদেবমূর্ত্তি সকলের উদ্ধার করিবার জন্য সঙ্কল্প করেন। তৎপ্রেরিত পার্ষদ ও ভক্তগণের প্রযত্নেই ব্রজমণ্ডল পুনঃ প্রকটিত ও সুশোভিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই সময় হইতে ব্রজকাহিনী আরম্ভ করিব।

শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র জীবনকাহিনী অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন, তথাপি সংক্ষেপতঃ এই স্থানে তাহার পুনরাবৃত্তি করিলে হানি নাই।—শ্রীহট্ট হইতে জগন্নাথ মিশ্র নামে জনৈক দাক্ষিণাত্য-বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, গঙ্গাতীর-বাস-কামনায় পত্নী শচীদেবী সহ, তখনকার প্রধান নগর ও "সরস্বতী পীঠ" নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথের পিতা উপেন্দ্র মিশ্র, উড়িষ্যার যাজপুর হইতে শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন। জগন্নাথের অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা হইয়া অকালে মরিয়া যায়। বিশ্বরূপ নামে একটি পুত্র কিশোর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া গৃহত্যাগ করেন। চৈতন্যদেব পিতামাতার শেষ সন্তান। ইঁহার

প্রকৃত নাম বিশ্বম্ভর। মৃতবৎসা জননী সভয়ে ইঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন (কারণ নিম তিক্ত, যমে ছুঁইবে না)। ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃঃ অব্দে) ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি কিছু চপল-স্বভাব ছিলেন। অল্প বয়সেই সেই সময়ে প্রচলিত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তর্কে এতদূর পটু ছিলেন যে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতেরা ইঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া যাইতেন। 'অদ্বৈত প্রকাশ' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি অদ্বৈত প্রভুর নিকট, লোকনাথ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে একত্র, বেদ-বেদান্তাদি ও দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই নিকট 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন। ইহাঁর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মী-দেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী দ্বিতীয়া ভার্য্যা গ্রহণ করেন। পিতৃবিয়োগের পর যখন ইনি পিণ্ড দিবার জন্য গয়াধামে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনে ইঁহার প্রেমাবেশ হইল। গয়াধামে ঈশ্বরপুরী নামক জনৈক বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর নিকট ইনি বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। হরি-প্রেমে বিভোর হইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বাটীতে ছাত্রদিগকে পড়াইবার যে টোল ছিল, তাহা উঠিয়া গেল। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি স্নেহময়ী জননী, প্রিয়তমা ভার্য্যা, নবদ্বীপবাসী আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইয়া, কণ্টকনগরে (কাঁটোয়ায়) গিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরম সুন্দর 'চাঁচর চিকুর' মুণ্ডিত হইল। এই ঘটনার পর হইতে ইঁহার নাম হইল কৃষ্ণচৈতন্য বা চৈতন্যদেব। তিনি বর্ণচিহ্ন যজ্ঞসূত্র ফেলিয়া দিয়া, সন্ন্যাসী-বেশে দেশে দেশে হরিনাম প্রচার জন্য বহির্গত হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে পুরীধামে থাকিবার জন্য অনুমতি করিয়াছিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল বৈষ্ণব-প্রধান দক্ষিণ-ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ

করিয়া ৩১ বৎসর বয়সে (১৫১৬ খৃঃ অঃ) শরৎকালে ঝাড়িখণ্ড বা বনপথে বৃন্দাবন দর্শন করিতে গেলেন। তাঁহার সঙ্গে বলভদ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন মাত্র অনুচর ছিল। সে সময়ে ব্রজধামে যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন :—

কেশবজী, দীর্ঘবিষ্ণু ও বিশ্রামদেব নামে তিনটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, ভূতেশ্বর ও স্বয়ম্ভু নামে দুইটি শিবলিঙ্গ ও গোকর্ণেশ্বর নামে একটি শিব-বিগ্রহ এবং মহাবিদ্যানামে যোগমায়া মূর্ত্তি—মথুরায় এই সাতটি মাত্র দেবমূর্ত্তি ছিল। খাস বৃন্দাবনে কোন দেবমূর্ত্তি মোটেই ছিল না। কেবল দুই চারিটি টীলা বা স্তূপ ও চারি পাঁচটি ঘাটের নাম পাই। গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে মানস-গঙ্গার নিকটে হরিদেব এবং পর্ব্বতোপরে গোপালদেব ছিলেন। * খদির বনে অনন্তনাগ-শয্যায় শয়ান লক্ষ্মী-নারায়ণ বা 'শেষশায়ী'। তাহার পর নন্দীশ্বর পর্ব্বতে গুহামধ্যে ;—

* অনুমান সেকেন্দর লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৮—১৫১৬ খ্রীঃ অঃ) বা তাহার কিছু পূর্ব্বে মাধবেন্দ্রপুরী নামে একজন মহাপ্রভাবশালী সন্ন্যাসী ব্রজমণ্ডলে তীর্থ করিতে যাইয়া, গোবর্দ্ধন সমীপে মানসগঙ্গা নামক সরোবরের সন্নিকটে বনজঙ্গল মধ্য হইতে, এই গোপালমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া, পর্ব্বতোপরি ঝোপড়া বাঁধিয়া ঠাকুরের পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তথায় গ্রামবাসিগণের সাহায্যে অন্নকূট মহোৎসব সম্পন্ন করেন! অল্পদিন মধ্যে মথুরার একজন ধনী বণিক গোপালজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ইহার কিছুদিন পরে তথায় দুইজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ আসিলে, তাহাদের হস্তে ঠাকুর সেবার ভার দিয়া চন্দন আনিবার উদ্দেশে মাধবেন্দ্র দক্ষিণ দেশে চলিয়া যান। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গৌড়ীয় বা বাঙ্গালীগণের বোধ হয় এই সময় হইতে পূজারী কর্ম্ম প্রথম আরম্ভ।

এদিকে মাধবেন্দ্র দক্ষিণদেশ হইতে চন্দন আনিয়া, রেমুণায় বা বালেশ্বরে

'দুই দিকে পিতামাতা পুষ্ট কলেবর।
মধ্যে হয় শিশু এক ত্রিভঙ্গ সুন্দর॥')
মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ

গোপীনাথজীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথাকার ভক্তবৎসল ঠাকুর, মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য বস্ত্রাঞ্চলে ক্ষীরভাণ্ড লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, তদবধি তাঁহার নাম "ক্ষীরচোরা গোপীনাথ" হইয়া গেল। এই স্থানে অবস্থানকালে মাধবেন্দ্র স্বপ্নে আদেশ পাইলেন, "এখন বৃন্দাবনে যাইবার পথ ম্লেচ্ছ বা পাঠানগণের উপদ্রবে দুর্গম হইয়াছে, অতএব তুমি ক্ষীরচোরা গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন মাখাইলে আমার (গোবর্দ্ধনস্থ গোপালজীর) অঙ্গ শীতল হইবে।" মাধবেন্দ্র সেইভাবেই আদেশ পালন করিলেন।

অতঃপর মাধবেন্দ্রপুরীর অন্তিম শয্যায় রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী নামে দুইজন শিষ্য তাঁহার রোগের পরিচর্য্যা করিত। রোগী শয্যায় পড়িয়া, "মথুরা পাইলাম না" বলিয়া অণুক্ষণ আক্ষেপ করিতেন। ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে এরূপ প্রলাপ না বকিয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেন। মাধবেন্দ্র তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন "আমি কোথা কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কাঁদিতেছি, আর তুই কিনা আমার শিষ্য হইয়া আমাকে এই সঙ্কটকালে বেদান্তের উপদেশ দিতে আসিয়াছিস্ মূর্খ! আমার সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা!" এই বলিয়া তিনি তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। তদবধি ঈশ্বরপুরী একাকী স্বহস্তে গুরুর মলমূত্রাদি পরিষ্কার ও অশেষবিধ শুশ্রূষা করিয়া গুরুর কৃপাবলে কৃষ্ণপ্রেমালাভ করিলেন। মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার দেহ গোপীনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সমাহিত করা হইল।

এই মাধবেন্দ্রপুরীই সর্ব্বাগ্রে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর বা কান্তভাবে কৃষ্ণসেবা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেবের গুরু, (হালিসহর-নিবাসী বাঙ্গালী) ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রভৃতি অনেকে ইহাঁর শিষ্য। ইনিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, বা সূত্রপাত করিয়া যান। চরিতামৃতে (অন্ত্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ) লিখিত আছে যে, মাধবেন্দ্রপুরী—

তখন সর্ব্বসমেত সমগ্র ব্রজমণ্ডলে এই দ্বাদশটি মাত্র দেবমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিলেন। চৈতন্যদেব ব্রজমণ্ডলের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রূপ ও সনাতন নামে দুইজন বাঙ্গালীকে নানা উপদেশ দিয়া ব্রজমণ্ডল উদ্ধারের জন্য

"পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর।
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর॥"

অর্থাৎ মাধবেন্দ্রপুরী কৃষ্ণবিরহরূপ প্রেমভক্তির যে বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন মহাবৃক্ষরূপে চৈতন্যদেব সেই ফল জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, সেই জন্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতে—

"কৃষ্ণের বিরহ ভক্তের ভাব-বিশেষ।"

অর্থাৎ বিরহ-কাতরা নায়িকার মত একনিষ্ঠ হইয়া, প্রেমভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা করাই জীবের সর্ব্বোচ্চ বা চরম সাধনা। এই মধুর বা কান্তভাবই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব। মাধবেন্দ্রপুরী কোন্ দেশীয় লোক, তাহা জানা যায় না। তাঁহার আবিষ্কৃত গোপালজীকে অনেকে গোবর্দ্ধননাথ বা শ্রীনাথ নামে অভিহিত করেন। পাঠানগণের ভয়ে গোপালজীকে গাঁঠুলি গ্রামে সরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। চৈতন্যদেব তথায় ইহাঁকে দর্শন করিয়াছিলেন। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে আরংজেবের উপদ্রবভয়ে গোপালজীকে উদয়পুরে নাথদ্বারে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বল্লভাচার্য্যের বংশীয় লোকেরা এখন ইহার সেবাইত। রাজপুতানার রাজগণের মুক্তহস্ত দানে এই দেবালয়ের বার্ষিক আয় বার লক্ষ টাকার উপর; শুনা যায় এখানে যেরূপ বহুমূল্য সামগ্রী দিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হয়, ভারতের অন্য কোথাও সেরূপ হয় না। এই শ্রীনাথজী-মূর্ত্তিটি সোজা দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বামকর উর্দ্ধে উত্তোলিত, দক্ষিণ হস্ত কটিদেশে ন্যস্ত। ব্রজবাসীরা এরূপ মূর্ত্তিকে গিরিধারী বিগ্রহ বলেন। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরাই বাৎসল্যভাবে এইরূপ মূর্ত্তির উপাসক। মানসগঙ্গা-তীরে হরিদেবেরও এইরূপ গিরিধারী মূর্ত্তি। আকবরের রাজস্ব-সচিব টোডরমল হরিদেবের যে পাষাণ রচিত সুন্দর মন্দিরটী করিয়া দিয়াছিলেন; তাহার নানাস্থান ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। গোপালজীর মন্দিরের ভিত্তি মাত্র এখনও গোবর্দ্ধন সমীপে দেখিতে পাওয়া যায়।)

পাঠাইয়া দেন। চৈতন্যদেব বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮ বৎসর কাল পুরীধামে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং "আপনি আচারি ধর্ম্ম জীবেরে" শিখাইয়াছিলেন। এই পুরীধামে ৪৮ বৎসর বয়ক্রম কালে ১৫৩৩ খৃঃ অঃ আষাঢ়ী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে পদস্ফোটে আক্রান্ত হইয়া তিঁনি লীলা-সম্বরণ করেন, জয়ানন্দ-রচিত 'চৈতন্যমঙ্গলে' এইরূপ বিবৃত আছে। চৈতন্যদেব-বিরচিত কোন গ্রন্থ নাই, তবে তাঁহার রচিত শিক্ষাষ্টক নামে ৮টি শ্লোক চরিতামৃতে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনের ইতিহাস বলিতে হইলে, যে সময়ে (১৫১৬ খৃঃ অঃ) চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলী বৃন্দাবনে গিয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিতেছিলেন, সেই সময়ের রাজ্যশাসনের বিবরণ দিতে হয়, নতুবা বিষয়টা বুঝিবার সুবিধা হইবে না। তখন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, দুর্ব্বল শেষ-পাঠান-সম্রাট ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। দিল্লী, আগ্রা ও তন্নিকটবর্ত্তী যৎকিঞ্চিৎ স্থান মাত্র তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। অনেক হিন্দু ও পাঠান নরপতিরা বাঙ্গালা, গুজরাট ও রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। কাবুলাধিপতি বাবর আসিয়া, ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধে, দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পশ্চিমে পাঞ্জাব হইতে, পূর্ব্বে বিহার পর্য্যন্ত দেশ সকল মোগল-সম্রাট বাবরের করতলগত হইল। ১৫৩০ খৃঃ অঃ বাবরের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন তাঁহার ভারতবর্ষের মধ্যগত রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই হুমায়ূনের রাজত্বকালেই (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) মদনগোপাল এবং ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে গোবিন্দদেব প্রকট হইয়াছিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা কেবল ভক্তিগ্রন্থ রচনা ও গোবর্দ্ধন, মহাবন, গোকুল, নন্দগ্রাম, বষাণ ও যাবট প্রভৃতি স্থানে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় কি লীলা করিয়াছেন, মথুরা-মাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া তাহারই অনু-

সন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতেন। কেহ কেহ বা সেবার্চ্চনা করিয়া কালযাপন করিতেন।

হুমায়ূন দশ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, বিহারের পাঠান জায়গীরদার সের শাহ ১৫৪০ খৃঃ অব্দে হুমায়ূনকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। অতি দক্ষতার সহিত সের শাহের রাজত্ব চালিত হইয়াছিল। তিনি বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য রাজ্যমধ্যে অনেক পথ, খাল, কূপ ইত্যাদি কাটাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত যে সহস্র-ক্রোশ-ব্যাপী, সুদীর্ঘ, সুপ্রশস্ত রাজপথ তিনি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ রাস্তার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ, প্রতি ক্রোশে কূপ খনন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর পথিকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ সরাই নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এই পথ দিয়া বাঙ্গালা হইতে বৈষ্ণবগণের বৃন্দাবন যাতায়াতের অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

সের শাহ ও তাঁহার বংশীয়েরা ৬ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, হুমায়ূন কাবুল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সহিন্দের যুদ্ধে, পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৫৫৬ খৃঃ অঃ নিজ সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। মোগল ও পাঠানেরা সিংহাসন লইয়া পরস্পরে বিবাদ ও যুদ্ধে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন বলিয়া, হিন্দুগণের বৃন্দাবনাদি স্থানে লুপ্ততীর্থ প্রভৃতির অনুসন্ধানে অবকাশ ও অনেকটা সুযোগ হইয়াছিল বলিতে হইবে। অল্প দিন পরেই হুমায়ূনের মৃত্যু ঘটিলে ১৫৫৬ খৃঃ অব্দে আকবর উত্তর-ভারতের সম্রাট্ হইলেন। এই উদার-হৃদয় বাদশাহের রাজত্বকালে তাঁহার হিন্দু-সেনাপতি মানসিংহ, রায়সিংহ প্রভৃতির অজস্র ব্যয়ে বৃন্দাবনধাম, নানা কারুকার্য্যখচিত নয়নাভিরাম মন্দির ও ঘাট প্রভৃতির দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল।

এখন আমরা একবার বাঙ্গালার কথা বলিব। ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত হুসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন। তিনিও প্রজাগণের সুবিধার জন্য নিজ রাজ্যে অনেকগুলি রাজবর্ত্ম ও পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া দেন। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন এবং বাঙ্গালী কবি ও পণ্ডিতগণের সম্মান করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালেই কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত, ও দ্বিজ-অনন্ত রামায়ণ প্রথম রচনা করেন। কাশীদাসের 'অমৃত সমান' মহাভারতও নাকি ইহাঁর রাজত্বসময়েই অনূদিত হইয়াছিল। হুসেন শাহ আকবরের মত হিন্দুদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। রূপ ইহাঁর দবিড় খাস (প্রধান মন্ত্রী) এবং সনাতন ইহাঁর সাকরমল্লিক (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন। চৈতন্যদেব এইরূপ সুদক্ষ, সুপণ্ডিত, ধর্ম্মপ্রাণ, দৃঢ়ব্রত ভক্ত পাইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি-প্রচারের ও তীর্থ-উদ্ধারের সুবিধা হইয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা "যোগীপাল, ভোগীপাল, মহী-পালের গীত" গাহিয়া বেড়াইত। অথবা বিষহরী (মনসা) দেবীর পূজা ও রাত্রিজাগরণ করিয়া গীতবাদ্যাদি করিত। ধনী ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা অনেকেই তন্ত্রোক্ত মতে শক্তির পূজা করিতেন। 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণ' মহেন্দ্রদেব ও দনুজদেবের মুদ্রা হইতে সে সাক্ষ্য আমরা পাই। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা কেহ শৈব, কেহ বা বৈদান্তিক মতে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। শঙ্করাচার্য্য-নিগৃহীত বৌদ্ধমূর্ত্তিসকল কোথাও শিবশক্তি, কোথাও বা ধর্ম্মঠাকুর রূপে হিন্দু-পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে তখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাহুল্যভাবে প্রচলিত ছিল কি না, ঠিক বলা যায় না। এখানে কোন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মঠ বা দেবালয়ের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে নাই। স্বল্পসংখ্যক লোকে,—মুরারি গুপ্ত ও বল্লভ (রূপসনাতনের কনিষ্ঠভ্রাতা) প্রভৃতি,—রামানন্দ-প্রবর্ত্তিত

রামোপাসনা করিতেন। অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা চতুর্ভুজ বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করিতেন বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেবই যে রাধাকৃষ্ণ-পূজা এ দেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, চরিতামৃতের নানা স্থানে সে কথা স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে। ইহাঁর নাম সেইজন্যই কৃষ্ণচৈতন্য রাখা হইয়াছিল। চৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ে আছে যে—

> "যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
> করাইলা চৈতন্য— কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
> এতেক তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
> সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যতো হৈল ধন্য॥"

রাধা-পূজাও যে তাঁহারই দ্বারা প্রবর্ত্তিত, সে বিবরণ ১৯শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

পাঠান-রাজগণের সময় হইতে এদেশে ধর্ম্মের অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের নাগপাশের (বঙ্কিম বাবুর সাম্যপ্রবন্ধ দেখুন) ভীষণ পেষণে, জাতিভেদের অনুচিত বৈষম্যে ও যাবনিক প্রলোভন, প্ররোচনা বা প্রপীড়নে, (১) অথবা মুসলমান হইলে

(১) মামুদ গজনি ১৭ বার ভারত লুণ্ঠন করিয়া নানা প্রসিদ্ধ দেবালয় ও সমৃদ্ধ নগর ধ্বংস করিয়া যান। তিনি ১০১৮ খ্রীঃ অঃ মথুরা হইতে অনেকগুলি মণিমাণিক্য-বিজড়িত, স্বর্ণ ও রৌপ্য-বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি অপহরণ করিয়া, পাষাণময় মূর্ত্তিগুলিকে ও সহস্রাধিক মন্দিরাদি চূর্ণ করিয়া পরিশেষে অগ্নি-সংযোগে নগরীরে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। ২০ দিন ধরিয়া লুণ্ঠন করিয়া এখান হইতে তিনি ৫০০০ বন্দী ও ৩ কোটি টাকা লইয়া যান।

মথুরা-লুণ্ঠনের পূর্ব্বে বারণ বা বুলন্দ সহরের রাজা দুর্ব্বল হরদত্ত নিজ রাজ্যের মধ্যস্থ সমস্ত দেববিগ্রহ জলে ফেলিয়া দিয়া ও এক কোটি টাকা এবং ৩০টা হস্তী

জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি লাভের আশায়, উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর অসংখ্য লোকেরা দলে দলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

মামুদকে উপহার দিয়া সপরিবারে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপিত হয়। ওদিকে মহাবনের তেজস্বী বীর রাজা কুলচন্দ্র মামুদের সহিত ভীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হইয়া যান। সমস্ত সেনা নষ্ট হইয়া গেলে তিনি গৃহে ফিরিয়া প্রথমে মহিষীর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া সেই তরবারি নিজবক্ষে বসাইয়া দিয়া আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করেন।

ফিরোজ সা টোগলক (১৩৫১—১৩৮৮ খ্রীঃ অঃ) নিজ রাজ্যান্তর্গত সমস্ত দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করিয়াছিলেন। দিল্লিতে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একখানা তক্তার উপর অভীষ্ট দেবের মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিত শুনিয়া, ফিরোজ তাহাকে ধরিয়া আনাইলেন। অভাগার হাত পা বাঁধিয়া প্রাসাদ-সম্মুখে সেই তক্তাখানা-সমেত জীবন্তে দগ্ধ করিয়া মারেন! তাঁহার আমলে কোন হিন্দু, তীর্থদর্শন বা পবিত্র নদীসঙ্গমাদিতে স্নান করিতে পারিত না। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণকে জিজিয়া কর দিতে হইত না। ফিরোজ তাহাদিগকেও এই জিজিয়া কর দিতে বাধ্য করেন।

ফিরোজের আত্মজীবনীতে আছে—"জিজিয়া কর হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় হিন্দুরা নানাদেশ হইতে দলে দলে আসিয়া মুসলমান হইতে লাগিল; আমিও তাহাদিগকে আদর দেখাইয়া উপহার ও পুরস্কার দিয়াছি!" অন্যে পরে কা কথা, এইরূপ ভূসম্পত্তি-পুরস্কার-লোভেই লক্ষ্মণ পাল, সম্বরপাল এবং সগর পাল নামে তিন জন যদুবংশীয় রাজকুমার ফেরোজের আমলে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। (See Cunningham's Archaeological Survey Vol XX.) ইহার পর সেকেন্দর লোদী ও একজন গোঁড়া মুসলমান সম্রাট (১৪৮৮—১৫১৬ খ্রীঃঅঃ) যখন যে দেশ জয় করিতেন, তথাকার দেবমূর্ত্তি ও মন্দির ধ্বংস করিতেন এবং কোন স্থানে পবিত্র মেলা বা হিন্দুদিগের উৎসব হইতে দিতেন না। তাঁহার আদেশে রাজ্যমধ্যে কেহ পবিত্র কুণ্ড নদী বা সরোবরে স্নান করিতে পারিত না। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী "যে কোন ধর্ম্মই হউক না কেন, দৃঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তির

ইহার প্রতিকার ও ধর্ম্মস্থাপন জন্য তৎকালে কয়েকজন মহাপুরুষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল—মহারাষ্ট্রে তুকারাম, গুজরাটে ও রাজপুতনায় বল্লভাচার্য্য, পঞ্জাবে নানক, বারাণসীতে রামানন্দ, বিহারে কবীর এবং বঙ্গ ও উড়িষ্যায় চৈতন্য দেব। ইহাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বাঁধন অনেকটা শিথিল করিয়াছিলেন। নানক, কবীর ও চৈতন্যদেব হিন্দু

সহিত সাধন করিলে ভগবান তাহা গ্রহণ করেন," এই মত প্রচার করিয়াছিল বলিয়া রাজাজ্ঞায় তাহার প্রাণদণ্ড হয়। সেকেন্দর লোদী মথুরার সমস্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া সেই সকল স্থানে কসাইদিগের দোকান বসাইয়া দেন এবং বিগ্রহের ভগ্ন খণ্ডগুলি লইয়া মাংস-ওজনের বাটখারা করিয়াছিলেন। মথুরার হিন্দু-অধিবাসিগণের ধোপা নাপিত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

চৈতন্যদেব এই সেকেন্দর লোদীর রাজত্বের শেষ বৎসরে (১৫১৬ খ্রীঃ অঃ) ব্রজমণ্ডল দেখিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে ম্লেচ্ছ বা পাঠানগণের উপদ্রবের কিছু কিছু আভাষ চরিতামৃতে আছে। আকবর-প্রমুখ দুই চারিজন সদাশয় নরপতি ভিন্ন প্রায় অধিকাংশ মুসলমান রাজারা হিন্দু ও তাহাদিগের ধর্ম্মের উপর অল্পবিস্তর অত্যাচার করিয়া গিয়াছেন। কোরাণে সাকার উপাসনা নিষিদ্ধ বলিয়া, মুসলমান ঐতিহাসিকেরা প্রতিমাভঙ্গ, মন্দির ধ্বংস ও হিন্দুর প্রাণদণ্ড প্রভৃতি দুষ্ক্রিয়াগুলিকে মুসলমান বাদশাহগণের গৌরবজনক পুণ্যময় কার্য্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। (See Elliot's History of India)। আরঙ্গজেবের উপদ্রব-কাহিনী ১৯শ পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। ইহার পর ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে নৃশংস নাদীরসার সেনাপতি আমেদ শা দুরাণী ব্রজধাম লুণ্ঠন ও অধিবাসিগণকে নিরপরাধে হত্যা করিয়া গিয়াছেন। আমরা এখানে কেবল মথুরা-মণ্ডলের উৎপীড়নের কথাই বলিলাম। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে মথুরা প্রদেশ ইংরাজ-শাসনে আসিয়াছে। তদবধি কত শত সুরম্য সুবিশাল মন্দিরাদি এখানে অবাধে স্থাপিত হইয়া আসিতেছে। আমরা সুসভ্য ইংরাজের আমলে কিরূপ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব অভীষ্ট দেবের পূজা করিতে পারিতেছি, বুঝিয়া দেখুন।

মুসলমান উভয়কে শিষ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা চৈতন্যদেবের উদারতার একটা উদাহরণ দিব। হুসেন শাহ কোন কারণে বিরক্ত হইয়া নবদ্বীপের জমিদার সুবুদ্ধি রায়ের মুখে 'করওয়াকা' জল দিয়া জাতি-চ্যুত করিয়া ছাড়িয়া দেন। নবদ্বীপ ও কাশীর স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরা তাঁহাকে তপ্ত ঘৃত পান বা তুষানলে প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিলেন। চৈতন্য-দেব তখন বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া কাশীতে অবস্থান করিতে-ছিলেন। সুবুদ্ধি রায় ইঁহার শরণাপন্ন হইলে, চৈতন্যদেব বলিলেন, "তুমি মথুরায় গিয়া অবশিষ্ট জীবন একান্তমনে হরিনাম করিয়া কাটাও, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" কি উদার, কি সহজ ব্যবস্থা! কোথায় তপ্তঘৃত পান আর কোথায় হরিনাম গান!

উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পুরুষোত্তম জানা এই চৈতন্যদেবের শিষ্য। রায় রামানন্দ, রঘুনাথ দাস, শিবানন্দ প্রভৃতি অনেক ধনী-সন্তানেরাও ইঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, প্রকাশানন্দ স্বামী প্রভৃতি বড় বড় বৈদান্তিক পণ্ডিতেরাও ইঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জাতীয় লোকেরাই ইঁহার প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করিতে লাগিল।

আভিজাত্য-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণ-শাসিত দেশে চৈতন্যদেব সাম্য ঘোষণা করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

—হরিভক্তি-পরায়ণ চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হরিভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল অপেক্ষা অধম। এই নজীর বলেই কায়স্থ রঘুনাথ দাস, সদ্গোপ শ্যামানন্দ—গোস্বামী পদ-লাভ করিয়াছিলেন।

অনেক ব্রাহ্মণ-বৈদ্যাদি উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা শূদ্র নরোত্তম ও বাসুঘোষ প্রভৃতি বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইয়া তাঁহাদের পদধূলি লইতেন। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি তীর্থস্থানে আজি পর্য্যন্তও শূদ্র জাতীয় লোকেরা ভেক লইয়া মোহান্ত খ্যাতি পাইয়া শালগ্রাম শিলা এবং দেববিগ্রহ সকল স্পর্শ ও পূজা করিতেছেন। তাঁহারা স্বহস্তে অন্নপাক করিয়া ঠাকুরকে ভোগ এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকগণকেও প্রসাদ খাওয়াইয়া থাকেন।

এখন আমরা বৃন্দাবনের বর্ণনা আরম্ভ করিব। এই বনে রাধার সখী বৃন্দা বা তুলসীদেবী তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। তাহা ছাড়া রাধারও একটি নাম বৃন্দা; বৃন্দার বন বলিয়া বৃন্দাবন নাম।

মথুরার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত ভূমিকে ব্রজমণ্ডল বলে। ব্রজমণ্ডলে প্রধান ১২টি বন আছে। যমুনার পূর্ব্বতীরে ভদ্র, ভাণ্ডীর, বেল, লৌহ ও মহাবন; এবং পশ্চিমতীরে মধু, তাল, কুমুদ, কাম্য, বহুলা, খদির ও বৃন্দাবন। এতদ্ভিন্ন কোকিলবন, লাঠাবন, ছত্রবন প্রভৃতি অনেক উপবনও আছে। বন বলিলে কেহ বিজন অরণ্য মনে করিবেন না। এগুলি গ্রাম মাত্র। এই সকল স্থান শ্রীকৃষ্ণের লীলা-ভূমি।

বৃন্দাবনের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব তিনদিকেই যমুনা। ব্রজবাসীরা বলেন—শ্রীকৃষ্ণের সুললিত নৃত্যকলা দেখিয়া, যমুনা সতত আনন্দিতা হইতেন। একদা বলদেবের মদিরোন্মত্ত বিকট তাণ্ডব দর্শনে তাঁহাকে পরিহাস করেন। বলদেব সেই অপরাধে রোষবশে হলচালন করিয়া যমুনার এইরূপ বিচিত্র বক্র গতি করিয়া দিয়াছেন। পশ্চিম দিকে কালীদহ ঘাট হইতে কেশীঘাট পর্য্যন্ত অনেকগুলি লাল পাথরে গাঁথা

সুন্দর সুন্দর বাঁধান ঘাট আছে, তাহার কতকগুলি অযত্নে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। যমুনায় চড়া পড়িয়া সে গুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। সেই প্রশস্ত চড়ার উপর এখন শস্যক্ষেত্র। তবে বর্ষাকালে যখন বন্যা আইসে, তখন 'কালীন্দীজলকল্লোলকোলাহলে' দিক্ মুখরিত হইয়া উঠে। ঘাটগুলি ডুবিয়া গিয়া তীরস্থ বাটীগুলির ভিতর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়। শীত বা গ্রীষ্ম কালে চড়ার উপর ধূ ধূ করে, সেখানে গরু মহিষাদি চরে,— এমন কি বন্য শূকর পর্য্যন্ত দেখা যায়। আমি ১৮৮০ সালে যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, তখন অনেকগুলি ঘাটেই জল দেখিয়াছিলাম। আবার কেশীঘাট হইতে উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। অনেক উদ্যান ও মন্দিরাদি যমুনা-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যমুনার শুষ্ক গর্ভে বহুসংখ্যক মোটা মোটা থামের মত ইঁট বা পাথরে গাঁথা ইন্দারাগুলি আজিও দণ্ডায়মান থাকিয়া, এখানে যে পূর্ব্বে উদ্যান ভবনাদি ছিল, তাহার পরিচয় দিতেছে।

পূর্ব্বে বৃন্দাবনের পরিধি ৫ ক্রোশ ছিল, এখন ভাঙ্গিয়া গিয়া ৩।৹ ক্রোশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। তাহাও থাকে কি না। বৃন্দাবন অনেকগুলি পল্লীতে বিভক্ত, তাহাদের সকলের নাম দিলে পুথি বাড়িয়া যায়।

দুই একটা ছাড়া বৃন্দাবনের অধিকাংশ পথই অপ্রশস্ত ও আঁকাবাঁকা; কিন্তু তাহাতে ইঁট বা পাথর বসান আছে বলিয়া বর্ষাকালেও কলিকাতার ন্যায় কাদা হয় না। অধিকাংশ বাটী একতালা। দোতালা বা তেতালা বাটীর সংখ্যা খুব কম। অধিকাংশ বাটীতেই কোন না কোন দেবমূর্ত্তি, অভাবে শালগ্রাম শিলা ও তুলসীমঞ্চ আছেই,—এইজন্য বৃন্দাবনের বাটীগুলিকে 'কুঞ্জ' বলে। বাটীর প্রবেশপথ বা ফটকগুলা কারুকার্য্য-খচিত পাথরের খিলানে শোভিত। সে কালের বাটীগুলি ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা হইত; বালির পলস্তারার বদলে অনেক বাটীর

দেয়ালে পাথরের (slab) ফলক আঁটা ; বাটীর কপাট ও জানালাগুলা কব্জার বদলে উপরে ও নীচে কীলক দিয়া আঁটা। আজি কালিকার বাটীতে কলিকাতার ন্যায় বড় বড় ইঁটের গাঁথুনী ও কল-কব্জার ব্যবহার চলিতেছে। অনেক বাটীর ছাদে পাথরের কড়ি লাগান। ছাদে টাঁলির বদলে বড় বড় পাথরের ফলক বসান। ভাল ভাল মন্দিরগুলি জয়পুরী লাল পাথরে নির্ম্মিত। তাহাতে লোণা ধরে বলিয়া আজ কাল ভরত-পুরের অন্তর্গত পাহাড়পুর হইতে ঈষৎ পীতবর্ণ পাথর আনাইয়া গাঁথনি চলিয়াছে। মুসলমান আমলে চোর-ডাকাইতের বড় ভয় ছিল বলিয়া, প্রতি-পল্লীর প্রবেশ পথে এক একটা ফটক লাগান থাকিত। প্রধান প্রধান মন্দিরে যেখানে অধিক ধন-রত্নাদি থাকিত, সে সকল মন্দিরগুলির চারি-দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ; তাহাতে দুই একটা বুরুজ অর্থাৎ তীর বা বন্দুক চালাইবার স্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে এত ঘন বসতি যে, সহর বলিয়া ভ্রম হয়।

খাস বৃন্দাবনে "খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ" প্রভৃতি প্রাকৃতিক শোভা এখন আর বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে যমুনার জলে কচ্ছপ, স্থলে বানর ও গৃহমধ্যে 'রেতে মশা দিনে মাছি'—যাত্রি-গণকে বিব্রত করিয়া তুলে।

বৃন্দাবনের বাহিরে গেলে আজিও ময়ূর-দলের অবাধ নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কখন দুই-একটা হরিণও যে না মেলে, এমন নহে। আমি সময়ে সময়ে শুক-জাতীয় (টিয়া, চন্দনা প্রভৃতি) পাখীর ঝাঁক উড়িতে দেখিয়াছি। শারিকা বা শালিক জাতীয় পাখীও বিস্তর। কিন্তু কাকের সংখ্যা অল্প। ভক্তেরা বলেন 'কেলি-ক্লান্তা-কমলিনীর প্রভাত-নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে এখানে কাক ডাকে না।' অবিশ্বাসীরা বলেন, 'বানরের উপদ্রবে কাকেরা এখানে বাসা বাঁধিতে পারে না, তাই গ্রামান্তর হইতে

তাহাদিগকে আসিতে হয়।' এখানে আরও একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, তেঁতুল সুপক্ক হয় না, কাঁচাফল শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। চরণে খোলা ফুটিয়াছিল বলিয়া এই ফলের উপর নাকি শ্রীরাধার অভিশাপ আছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীরাধার নামের মাহাত্ম্য অধিক; বৈষ্ণবেরা পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে রাধে রাধে বলিয়া অভিবাদন করে, রাত্রিতে কি হিন্দু কি মুসলমান প্রহরীরা রাধে রাধে বলিয়া হাঁক দেয়, মলবাহী মেথরেরা পর্য্যন্ত অসাবধান পথিককে রাধে রাধে বলিয়া পথ ছাড়িয়া দিতে বলে। কিন্তু কেহই রাধাকে মাতৃ-সম্বোধন করে না। ব্রজবাসীরা বলেন "আমরা রাধার সখী, সেইজন্য সখীকে মা বলি না।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে যে, গোলোকের রাধা, একটি সুবর্ণ অণ্ড প্রসব করিয়া তাহা বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অভিশাপ দেন যে, 'তোমাকে কেহ মা বলিবে না।' এখানে সকলেই বলে, 'প্রেমময়ি রাধে!'

সে সময় যে সকল গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, চরিতামৃতে তাঁহাদের এইরূপ একটি তালিকা আছে:—রূপ, সনাতন, রঘুনাথভট্ট, জীব, গোপালভট্ট ও রঘুনাথদাস—ইহাঁরা ছয় জন প্রধান গোস্বামী। তৎসঙ্গে ভূগর্ভ, যাদবাচার্য্য, গোবিন্দ গোঁসাই, উদ্ধবদাস, মাধব নামক দুইজন, লোকনাথ, গোপালদাস, নারায়ণ দাস, গোবিন্দভক্ত, বাণী কৃষ্ণদাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, জগদানন্দ এবং লঘু হরিদাসের নাম পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আরও কতকগুলি লোক বৃন্দাবনে যাইয়া দেবমূর্ত্তি স্থাপন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন, যথা:—বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার দুই পুত্র,—বিট্ঠলনাথ ও গোপীনাথ, হিত হরিবংশ, হরিদাস স্বামী, হরিরাম ব্যাসজী, থানেশ্বরী জগন্নাথ, অন্ধ সুরদাস এবং সুরদাস মদনমোহন। আরও হয়ত কেহ কেহ গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কেহ জানে না। ইহাঁদের পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের

শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ, জাহ্নবা ঠাকুরাণী প্রভৃতি অনেকে তথায় গিয়াছিলেন। তখন বৃন্দাবনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের বিশেষ প্রাধান্য ছিল।

আকবর বাদশাহ্ যখন বৃন্দাবন দেখিতে গিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালী-দিগের শিখা-শোভিত মুণ্ডিত মস্তক, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরি-নামাঙ্ক, এবং কৌপীন মাত্র পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি এ স্থানের নাম 'ফকীরাবাদ' রাখিয়া যান। তিনি বাঙ্গালীগণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহা-দের কি অভাব তিনি পূরণ করিতে পারেন? ঐহিক-কামনা-নিস্পৃহ সকল বাঙ্গালীই একবাক্যে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কিছুরই অভাব নাই। আকবর বিনীতভাবে বলিলেন, "আমার এখানে আগমন স্মরণার্থ আপ-নারা কিছু প্রার্থনা করিলে আমি কৃতার্থ ও ধন্য হই।" বাঙ্গালী গোস্বামীরা বলিলেন, "রাজ্যেশ্বর, এই পবিত্র ধামে আসিয়া অনেক নৃশংস লোকে মৃগয়া করিয়া জীবহত্যা করে; আপনি সকলের শাসনকর্ত্তা, এখানে যেন কোনরূপ জীবহিংসা আর না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিন।" আকবর ইহা শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে ব্রজমণ্ডলে জীবহিংসা নিবা-রণের ফর্ম্মান দিয়া যান। তাহাতে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ছেদনের নিষেধ আছে। এরূপ অপরাধীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। সেই ফর্ম্মান্ খানার ইংরাজী অনুবাদ ১৯১৩ সালের হিন্দু রিভিউ (Hindu Review) পত্রিকায় ৩৩৯—৩৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। ১০১৪ হিজরী সনে ফর্ম্মান দেওয়া হইয়াছিল। আকবরের এইরূপ আদেশ যে তাঁহার সময়েই প্রবল ছিল তাহা নহে, পরবর্ত্তী মোগল-সম্রাটেরা (কেবল আরঙ্গ-জেব ব্যতীত), জা'ট ও মহারাষ্ট্রীয় রাজারা, এমন কি ইংরাজ বাহাদুর পর্য্যন্ত সেই আদেশ বজায় রাখিয়াছেন।

আকবরের সময়ের আরও একটি গল্প শুনা যায় যে, তিনি আগ্রায়

ফিরিয়া গিয়া এই সকল মহানুভব ফকীরগণের চিত্র লইবার জন্য বাদশাহী চিত্রকরকে পাঠাইয়াছিলেন। গৌড়ীয়গণ দৈন্য ও বিনয় দেখাইয়া কেহই আপনাদের চিত্র দিতে সম্মত হইলেন না। চিত্রকরেরা কেবল বল্লভ ভট্ট ও তাঁহার বংশধরগণের এবং হিত হরিবংশ ও হরিদাস স্বামীর চিত্র লইয়া গিয়াছিল। সেগুলি অনেকদিন পর্য্যন্ত আকবরের গৃহপ্রাচীর শোভিত করিত। তাঁহার লোকান্তরের পর সে চিত্রগুলি জয়পুরের রাজাদিগের হস্তগত হয়। এই সকল মহোদয়গণের প্রসঙ্গকালে আমরা তাহার প্রতিলিপি দিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আমরা আজি কালি নানা-মন্দির-শোভিত যে স্থানকে বৃন্দাবন বলিয়া জানি, চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন সেখানে কোনরূপ মন্দিরাদি ছিল কি না সন্দেহ। লোকেরও বসতি অতি বিরল ছিল। সেইজন্যই চৈতন্যদেব মথুরার জনকোলাহল হইতে পলাইয়া আসিয়া বৃন্দাবনের পূর্ব্ব দিকে যমুনাতীরবর্ত্তী অক্রূরঘাটে অবস্থান করিতেন। এবং পশ্চিম দিকে নির্জ্জন একটি বৃহৎ তেঁতুল-তলায় বসিয়া পূজা অর্চ্চনাদি করিতেন। তাঁহারা তখন যমুনা-বেষ্টিত পঞ্চক্রোশ পরিমিত ভূমিকে রাসমণ্ডল বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের পশ্চিম দিকে যমুনাতীরে কালীদহ, প্রস্কন্দন, দ্বাদশাদিত্য, কেশী এবং চীর নামে পাঁচটি ঘাট মাত্র ছিল। কেহ যেন সেগুলিকে পাথরে গাঁথা ঘাট মনে করিবেন না। ঘাটগুলি পরবর্ত্তী

কালে বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দিকেই কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত, সেগুলির নাম এখন বংশীবট, শৃঙ্গার-বট ও অদ্বৈতবট। এতদ্ভিন্ন গোমাটীলা, আদিত্য-টীলা নামে কয়েকটি স্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইত। বোধ হয় মামুদ গজনি মথুরা-মণ্ডলে যে সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ধ্বংসাবশেষ কালে মৃত্তিকা ও বন জঙ্গলে আবৃত হইয়া এইরূপ স্তূপ বা টীলায় পরিণত হইয়া থাকিবে। (১)

চৈতন্যদেবের আদেশে রূপ ও সনাতন গোস্বামী লুপ্ততীর্থ সকল উদ্ধার করিতে আসিয়া যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধন ও কঠোর ব্রত-পালন করিতেন, তাহার এইরূপ বিবরণ 'চরিতামৃতে' আছে—

"অনিকেতন দুঁহে বনে যত বৃক্ষগণ।
এক এক বৃক্ষতলে এক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চাবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কন্থা ছিঁড়া বহির্ব্বাস।
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণকথা নর্ত্তন উল্লাস॥

---

(১) খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত মথুরামণ্ডলে বৌদ্ধ ও জৈনগণের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহারা মথুরা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী গ্রাম-সকলে অসংখ্য চৈত্য, স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তাহাদের অনেকগুলি স্তূপ এখন হিন্দুদেবতার টীলা নামে পরিচিত হইতেছে। অধিক কি, মথুরার প্রধান দেবতা কেশবদেবের পুরাতন মন্দির, যাহা ভাঙ্গিয়া আরংজেব মসজীদ করিয়া দিয়াছেন, তাহার নিম্নদেশ হইতে বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ বাহির হইয়াছে। বৃন্দাবনের টীলাগুলিও সেইরূপ বৌদ্ধস্তূপ ছিল কি না, তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই।

সার্দ্ধ সপ্ত প্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়ন।
নাম সংকীর্ত্তন প্রেমে সেহো নহে কোন দিন॥
কভু ভক্তিরস-শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥"

তাঁহারা অনেক বৎসর কোন দেব-বিগ্রহ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা এখানে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় কিশোর বয়সে বৃন্দাবনে গিয়া প্রায় ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধনের নিকট রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি স্বচক্ষে কখনও চৈতন্যদেবকে দেখেন নাই বটে, কিন্তু রূপ, রঘুনাথ দাস, লোকনাথ, গোপালভট্ট প্রভৃতি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ভক্তগণের মুখে শুনিয়া এবং বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত", স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির করচা গ্রন্থ পড়িয়া শেষ জীবনে "চরিতামৃত" গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আমরা এইজন্যই তাঁহার গ্রন্থের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছি। তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ হইতে কতকটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। নরহরি নিজ গুরুমুখে শুনিয়া ও গোস্বামীগণের পুঁথি পড়িয়া 'ভক্তি রত্নাকর' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিকে বৈষ্ণব-ইতিহাসের অফুরন্ত খনি বলিলেও চলে।

বৃন্দাবনে এখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাতটি দেবালয় প্রধান,—গোবিন্দদেব, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধাদামোদর, রাধারমণ, গোকুলানন্দ ও শ্যামসুন্দর। চরিতামৃতে কেবল প্রথম তিনটির নাম আছে।

শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দ চরণ॥
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন ঠাকুর হয় গৌড়ীয়গণ সাথ॥

ব্রজবাসীরা বলিয়া থাকেন, এই তিন বিগ্রহ, বৃন্দাদেবী ও গোপীশ্বর শিবলিঙ্গকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ, বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

"ভক্তি-রত্নাকরে" অপর চারিটিরও উল্লেখ আছে। সুতরাং এ গুলিকেও প্রাচীন বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন 'হিত হরিবংশে'র রাধাবল্লভ, হরিদাস স্বামীর বাঁকে বিহারী, হরিরাম ব্যাসজীর যুগলকিশোর, সুরদাসের মদনমোহন, থানেশ্বরী জগন্নাথের মনোমোহন প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণের ঠাকুরও আকবরের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের বড় একটা নাম করেন নাই। কেবল "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাঁহাদের কয়েকজনের বিবরণ আছে। গোবিন্দদেবের ভূতপূর্ব্ব কামদারের মুখে শুনিয়াছি যে, ইংরাজ-রাজত্বের শান্তিময় শাসনের পূর্ব্বে বৃন্দাবনে একশত, বড় জোর দেড়শত ঠাকুরবাড়ী ছিল। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে মথুরামণ্ডল বৃটিশাধিকারে আসিবার পর হইতেই দেবালয়ের সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে এবং তৎসঙ্গে বাসিন্দার সংখ্যাও বৃদ্ধি হইতেছে।

আমরা প্রথমে প্রাচীন দেবালয়গুলির বিবরণ দিয়া, পরে ইংরাজ আমলে নির্ম্মিতগুলির পরিচয় দিব।

গোবিন্দদেব

মদনগোপাল বিগ্রহ প্রথমে আবিষ্কৃত হইলেও গোবিন্দদেব বৃন্দাবনের প্রধান দেবতা। ভাগবত, স্কন্দ, পদ্ম, আদিবরাহ প্রভৃতি পুরাণে ও সম্মোহন, ঊর্দ্ধাম্নায়, গোপাল-তাপনী প্রভৃতি তন্ত্রে এই গোবিন্দের নাম পাওয়া যায়। সনাতন ও রূপ গোস্বামী মদনগোপাল ও গোবিন্দদেবকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশ-পরিচয় এইখানেই দিয়া রাখি।

কর্ণাট দেশের অধিপতি জগৎগুরু বিপ্ররাজ নামক ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কোন ব্রাহ্মণ, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিপ্ররাজের পুত্রের নাম অনিরুদ্ধ, অনিরুদ্ধের দুই পুত্র—রূপেশ্বর ও হরিহর। হরিহর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপেশ্বরকে তাঁহার রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিলে, তিনি সপরিবারে পৌরস্ত্যদেশের অন্তর্গত শেখর রাজ্যে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ 'সুরতরঙ্গিণী-তটনিবাস' কামনায়, বাঙ্গালা দেশে নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বাস করিলেন। বাকলা, চন্দ্রদ্বীপের 'চণ্ডীচরণ-পরায়ণ' দনুজমর্দ্দন রাজা (১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃঃ অঃ) পদ্মনাভকে মহা সমাদরে নৈহাটীতে থাকিবার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ-ভক্ত ছিলেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্রের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ, মুরারি ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্রের নাম কুমারদেব। ইনি অতি ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। জ্ঞাতিবিরোধভয়ে ইনি নৈহাটী ত্যাগ করিয়া প্রথমে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে, পরে যশোহর ফতেয়াবাদ নামক স্থানে আসিয়া বাস করিলেন। ইহাঁর পত্নীর নাম রেবতী।

কুমারদেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে সনাতন, রূপ ও বল্লভ নামক তিনজনের নাম আমরা জ্ঞাত আছি। বল্লভের পুত্র জীবগোস্বামী রচিত 'বৈষ্ণবতোষিণী' হইতে উপরোক্ত বিবরণ পাইয়াছি। এতদ্ভিন্ন ইঁহাদের বংশীয় রাজেন্দ্র নামে অপর একজন যুবকের নাম গোবর্দ্ধন-ধামে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি নাকি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল রাধাকুণ্ড-তীরে থাকিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ সকল পড়িয়াছিলেন। একদিন রাধাকুণ্ড হইতে মথুরা যাইবার পথে গোবর্দ্ধনের নিকট তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। রাজেন্দ্রের বিষয় আর কিছু জানা যায় না। গোবর্দ্ধনের নিকট তাঁহার সমাধি আছে। বল্লভের পুত্র জীবও বৃন্দাবনে গিয়াছি-

লেন। তাঁহার পর ইঁহাদের বংশীয় আর কাহারও নাম পাওয়া যায় নাই। এ প্রবন্ধে কেবল রূপগোস্বামীরই পরিচয় দিব। মদনমোহন প্রবন্ধে সনাতন ও রাধা-দামোদর প্রবন্ধে জীব গোস্বামীর জীবনী লিপিবদ্ধ করিব।

সন্নাস-গ্রহণের পর চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাইবার জন্য বহির্গত হইয়া ভ্রমক্রমে গৌড়সন্নিহিত রামকেলী নামক গ্রামে উপস্থিত হন। সেই সময় রূপ ও সনাতনের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। তাঁহারা তখন নবাব হুসেন সাগার কর্ম্মচারী। সেইজন্য গোপনে অর্দ্ধরাত্রে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই সময়ে কথা হইল যে, চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবনে যাইবেন, তখন ইহাঁরাও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। ইহার কিছুদিন পরে রূপ গোস্বামী, নিজ দবীরখাস-পদ (প্রধান উজীর) ত্যাগ করিয়া গৌড় হইতে আপনার টাকাকড়ি লইয়া নিজদেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান করিলেন। 'এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব ভরণে,' অবশিষ্ট এক চৌঠি ধন 'দণ্ড বন্ধলাগি' সঞ্চয় করিয়া ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলেন। সনাতনের জন্য দশ হাজার মুদ্রা গৌড়ে মুদিঘরে রাখিয়া গেলেন। দুই জন চরের মুখে শুনিলেন যে, চৈতন্যদেব বনপথে বৃন্দাবন গিয়াছেন। তিনিও নিজ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে চৈতন্যদেব বৃন্দাবন দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। প্রয়াগধামে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব ইঁহাকে নানা উপদেশ দিয়া বৃন্দাবন দর্শনে পাঠাইলেন। কিন্তু বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্য ভাগবতে আছে যে, চৈতন্য-দেব পুরীধামে থাকিয়াই রূপ ও সনাতনকে মথুরায় ভক্তিরস প্রচারের আদেশ করেন। রূপ মথুরায় যাইয়া সুবুদ্ধি রায়ের সহিত বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া একমাস কাটাইলেন। রূপের সঙ্গে তৎকনিষ্ঠ বল্লভও ছিল। পরে তাঁহারা

দেশে ফিরিয়া আসিলেন।—বাঙ্গালা দেশে গঙ্গাতীরে বল্লভের পরলোক প্রাপ্তি হইল। রূপ একাকী নিজ দেশে যাইয়া পারিবারিক সকল বিষয়ে যথোচিত বন্দোবস্ত সমাপ্ত করিলেন। তাহার পর পুরীধামে চৈতন্যদেবের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ইনি যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন। চৈতন্যদেব ইঁহাকে রায় রামানন্দ, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি নিজ পার্ষদগণের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। রূপ সুকবি ছিলেন। "বিদগ্ধ মাধব" ও "ললিত মাধব" নামে দুইখানি রাধা-কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাটক রচনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, চৈতন্য-দেব ও তাঁহার পার্ষদ্‌গণকে তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। তাঁহারা ইঁহার কবিত্বশক্তির অশেষ প্রশংসা করিলেন। রূপ প্রায় এক বৎসর পুরীধামে ছিলেন। ইহার পর ইনি বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ জীবন তথায় কাটাইয়া-ছিলেন। বিদায়কালে চৈতন্যদেব রূপকে আদেশ করেন—

ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপণ।
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ॥
কৃষ্ণ-সেবা রসভক্তি করিহ প্রচার।
আমিহ দেখিতে যাব তাহা একবার॥

(চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ২য় পরিচ্ছেদ)

এই আদেশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার সময়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা প্রচার ছিল না।

ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থ-রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী, ব্রজস্থ হরিদাস গোস্বামীর শিষ্য রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী-লিখিত 'সাধন দীপিকা' নামক পুথি হইতে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী, প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ বৃন্দাবনে গৃহে গৃহে, বনে বনে, কোথাও কিছু সন্ধান করিতে না পারিয়া, একদা অতি বিষণ্ণ

বদনে যমুনাতটে বৃক্ষতলে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিলেন। এমন সময় একজন পরম সুন্দর ব্রজবাসী আসিয়া তাঁহাকে স্নেহভরে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রূপ তাঁহাকে সকল কথাই বলিলেন। আগন্তুক তাঁহাকে গোমাটীলা সমীপে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, "এই স্থানে একটি গাভীশ্রেষ্ঠ আসিয়া পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধস্রাব করিয়া থাকে, তুমি, যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করিতে পার।" তাঁহার কথা শুনিয়া ও মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া রূপ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। যখন চেতনা পাইলেন, তখন আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তিনি ব্রজবাসিগণকে ডাকিয়া বলিলেন, শ্রীগোবিন্দদেব এইখানেই আছেন। তাহার পর বালক, বৃদ্ধ সকলে মিলিয়া সেইস্থান খনন করিয়া যোগপীঠ-মধ্যগত 'কোটী মন্মথমোহন' গোবিন্দদেবের বিগ্রহ প্রাপ্ত হইলেন। তৎপরে—

শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকট হইতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারিভিতে॥
গোবিন্দ প্রকট মাত্রে শ্রীরূপ গোঁসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঁঞি॥
(ভক্তিরত্নাকর, ২য় তরঙ্গ, ৯১ পৃঃ)

চৈতন্যদেবও পত্র পড়িয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তৎপরে কাশীশ্বর ব্রহ্মচারী নামক আপন পার্ষদ সমভিব্যাহারে গৌর-গোবিন্দ নামে একটি 'নিজ স্বরূপ বিগ্রহ' (নিজের প্রতিমূর্ত্তি) বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। রূপ গোস্বামীও চৈতন্যদেবের সেই মূর্ত্তিটি লইয়া মহা ভক্তিভরে গোবিন্দদেবের দক্ষিণ পার্শ্বে সংস্থাপিত করিলেন।

"ভক্তিরত্নাকরে"র এই বিবরণটি কত দূর সত্য বলিতে পারি না। কেন না, গোপালভট্টের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ-ঠাকুরের পূজারী-বংশীয় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট 'সেবা প্রাকট্য

ও ইষ্টলাভের দিননির্ণয়', নামক একখানি অতি-প্রাচীনত্ব-সূচক পুথি আছে। তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, সম্বৎ ১৫৯০ (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) মাঘ মাসে সনাতন গোস্বামী মহাবনের পরশুরাম চৌবের বাটী হইতে মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া আসেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৯২ সম্বতে (১৫৩৫ খৃঃ অঃ) মাঘ মাসে শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে গোবিন্দদেবের অভিষেক হয়। এই পুথিতেই আছে যে, চৈতন্য-দেব, ১৫৯০ সম্বৎ (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) (জয়ানন্দমতে আষাঢ়া শুক্লা সপ্তমী তিথিতে) অপ্রকট হন। কাজেই বলিতে হইবে যে, চৈতন্যদেব, গোবিন্দদেবের আবিষ্কার দেখিয়া যান নাই। মদনগোপাল দেবের আনয়নের সাত মাস পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোধান ঘটিয়াছিল। ইহার দুই বৎসর পরে যদি গোবিন্দদেবের আবিষ্কার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার দেখা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেই জন্যই বোধ হয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় গোবিন্দ, মদনগোপাল প্রভৃতি আবিষ্কারের কোন রূপ বিবরণ 'চরিতামৃতে' দেন নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, বৃন্দাবনে কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তিগুলিই পাওয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন রাধামূর্ত্তি আবিষ্কারের কথা শুনা যায় না। পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে চক্রবেড় নামক স্থানে লক্ষ্মী নামে একটি মূর্ত্তি পূজিত হইতেন। সেই মূর্ত্তিটিকে রাধা নাম দিয়া বৃন্দাবনে পাঠান হইল। গোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইলে পর যখন—

বৃন্দাবন গমনের সময় হইল।
তেঞি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল॥
স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম যতনে।
বহু লোক সঙ্গে পাঠাইল বৃন্দাবনে॥

শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হইতে বৃন্দাবনে গেলা।
গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা॥
যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল।
সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল॥
গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে॥
ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন।
এ সকল বর্ণিলেন পূর্ব্ব কবিগণ॥
সাধনদীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার।
এ সব যে শুনে প্রেম ভক্তি লভ্য তার॥
(ভক্তিরত্নাকর; ষষ্ঠ তরঙ্গ, ৪৬১ পৃঃ)

এইরূপ রাধিকা-মূর্ত্তি-প্রেরণ, শ্রীচৈতন্য-দেবের তিরোধানের ও গোবিন্দ-দেবের আবিষ্কারের অনেক বৎসর পরেই ঘটিয়া থাকিবে। কারণ, এই প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের নাম বা উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি না।* আমরা অনেক অনুসন্ধানেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত "সাধন দীপিকা" গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই। বৃন্দাবনের অনেকেই ইঁহার নামও শুনেন, নাই। সে সময়ে গোবিন্দ—গোপীনাথ—ও মদনমোহনের—

সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন।
একাদশী পূর্ণিমামাবস্থায় নিয়ম॥
যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে।
সে সময়ে যে শোভা উপমা নাই দিতে॥
(ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪০৮ পৃঃ)

* কেবল পুরীধামের রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র পুরুষোত্তম জানার নাম আছে।

তখন এই নিয়ম ছিল—কিন্তু এখন প্রতিদিন যুগলদর্শন হয়। আমরা বৃন্দাবনে শুনিয়া আসিয়াছি যে, এই রাধিকা-আগমন উপলক্ষে রূপ গোস্বামী "চাটু পুষ্পাঞ্জলি" নামক রাধিকা-স্তোত্র রচনা করেন।

এবার আমরা মন্দিরের কথা বলিব। মথুরা হইতে যে প্রশস্ত রাজপথ বৃন্দাবনে আসিয়াছে, তাহার পশ্চিম পার্শ্বেই গোমাটিলা নামক আন্দাজ ২০।২৫ ফুট উচ্চ স্তূপের উপর গোবিন্দদেবের মন্দিরাদি স্থাপিত। গড়ানিয়া পথ দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সম্মুখেই মানসিংহ-নির্ম্মিত পুরাতন মন্দির, বড় বড় লাল জয়পুরী পাথরে নির্ম্মিত, অতি সুচারু কারুকার্য্যে শোভিত। কোথাও এক খানিও কাঠের কড়ি বা বরগা নাই, সমস্তটাই পাথরে রচিত। মন্দিরটা পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দীর্ঘ। এখন কেবল জগমোহন ও নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। আরঙ্গজেব ইহার মূল মন্দির ও উপরের পাঁচটি চূড়া একেবারেই ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। জগমোহনের উত্তর ও দক্ষিণদিকে তুইটা ছোট মন্দির আছে। পূর্ব্বে যেখানে মূল মন্দির ছিল, তাহার কিয়দংশে একটা ইটে-গাঁথা ঘর তৈয়ারী হইয়াছে; তাহার ভিতর চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের মূর্ত্তি এবং তৎসঙ্গে গিরিধারী কৃষ্ণমূর্ত্তি ও 'পওয়া মণ শালগ্রাম' রহিয়াছেন। ম্লেচ্ছে মন্দির অপবিত্র করিয়াছিল বলিয়া—এখানে আর গোবিন্দ-দেবের স্থাপনা হয় নাই। আরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙ্গিবার কারণ এই যে, তিনি আগ্রার কোন সুদূর প্রাসাদ হইতে এই মন্দিরের চূড়ার উপর আলোক-শোভা দেখিতে পান। জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিলেন যে, আলোকটা কোন হিন্দু-মন্দিরের উপর হইতে আসিতেছে, তখন তাঁহার প্রাণে হিন্দুধর্ম্মের এই উন্নতির লক্ষণ সহ্য হইল না। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার জনৈক ফৌজদার বা সেনাপতিকে মথুরা ও বৃন্দাবন ধ্বংস করিতে পাঠাইলেন। সেনা আসিবার পূর্ব্বেই কয়েকজন হিন্দুরাজ-প্রেরিত চর আসিয়া এই দুঃসংবাদ

বৃন্দাবনের পুরোহিত ও গোস্বামীদিগকে জানাইল। তখন তাঁহারা ভয়-ব্যাকুলিত প্রাণে স্ব স্ব অভীষ্টদেবকে লইয়া বন-পথে পলায়ন করিলেন। পরে সেনারা আসিয়া সুন্দর মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া গেল। ব্রজবাসীরা এইরূপ বিবরণ দিয়া থাকেন। আরঙ্গজেবের এইরূপ উপদ্রবটা মথুরাতেই অধিকতর রূপে হইয়াছিল। ইহার নিগূঢ় কারণ ও বিপ্লব বৃত্তান্ত আমরা পরে বলিব। গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, প্রভৃতি দেববিগ্রহগুলি জয়পুরের রাজাশ্রয়ে নীত হইয়াছেন।—সেখানে তাঁহাদের রাজসেবা চলিতেছে।

দেবদ্বেষী আরঙ্গজেব মূল-মন্দির ও ইহার পঞ্চচূড়া ভাঙ্গিয়া ক্ষান্ত হন নাই ; নাট-মন্দিরের ছাদের উপর দরগার আকারে প্রাচীর গাঁথিয়া ইহাকে মস্‌জিদে পরিণত করিয়া, স্বয়ং আসিয়া এখানে নমাজ করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রাউস সাহেব মন্দির-সংস্কার কালে সে প্রাচীরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

জগমোহনের দ্বারের তিন দিকে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার নানামূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। নাটমন্দিরের বারান্দার উপরও স্থানে স্থানে ঘাগরা-শোভিত নারী-মূর্ত্তিগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। সে সকলগুলি আরঙ্গজেবের আদেশে মুণ্ডহীন করা হইয়াছে।

এই নাটমন্দিরে বসিয়া রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী—

রূপ গোসাঞির সভায় করে ভাগবত পঠন।
ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তাঁর মন ॥
অশ্রু কম্প গদ গদ প্রভুর কৃপাতে।
নেত্র রোধ করে বাষ্প, না পারে পড়িতে ॥
পিকস্বর কণ্ঠ, তাতে রাগের বিভাগ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ ॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য যবে পড়ে মনে।
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥

(চৈঃ, চঃ, অন্ত্যলীলা ১৩ পঃ)

এই নাটমন্দিরটি দোতলা। ইহার উপরে তিন দিকে, থিয়েটারের ড্রেস-সার্কেলের মত, মহিলাগণের বসিবার জন্য বারান্দা বাহির করা। কত রাজপুতমহিলা, সম্ভবতঃ জয়পুরের রাজমহিষীরা পর্য্যন্ত, এই বারান্দায় বসিয়া কবি জয়দেবের "মধুর-কোমল 'কান্তপদাবলী'," অথবা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও অপরাপর বৈষ্ণব কবিগণের ভাষা-ভাব-মধুরা অমৃতনিস্যন্দিনী, রাধা-শ্যাম-লীলা-কাহিনী, ভক্তি-গদ্-গদ প্রাণে শ্রবণ করিতেন।

গোবিন্দদেবের যখন আরতি হইত, তখন মানসিংহ-প্রমুখ বীরবৃন্দ করযোড়ে মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া প্রেম-পুলকিত প্রাণে একাগ্রমনে তাহা দর্শন করিতেন, ও তদবসানে ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে এই নাট-মন্দির-তলে লুণ্ঠিত হইতেন। হায়রে, সেদিন কোথায় গিয়াছে!

প্রাচীরের ভিতর দিয়া, বারান্দা ও ছাদের উপর পর্য্যন্ত যাইবার সিঁড়ি আছে। নাটমন্দিরের বাহির দিকেও সুন্দর কারুকার্য্য-করা বারান্দা আছে, তথা হইতে বৃন্দাবনের বিমুক্ত শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের চারিদিকে বিস্তৃত ভূমি বেষ্টন করিয়া ছোট ইটে-গাঁথা ১৫।১৬ ফুট উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানকে গোবিন্দদেবের ঘেরা বলে। স্থানে স্থানে কয়েকটা ফটক ছিল। এখনও দক্ষিণ দিকে, লাল-পাথরে গাঁথা দুইটা পুরাতন ছত্রী-মণ্ডিত নহবৎখানা অতীত কালের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বকালে প্রাচীরান্তর্গত প্রশস্ত ভূমিখণ্ডে হয়ত পুষ্পোদ্যান ছিল। এখন তথায় অনেক বাড়ীঘর তৈয়ারি হইয়াছে। জগ-মোহনের দুই দিকে যে দুইটা ছোট ছোট মন্দির আছে, তাহার দক্ষিণ দিকের মন্দিরটির ভিতর 'যোগপীঠ'। * সিঁড়ি দিয়া ১২।১৩ ধাপ নামিয়া

* এই যোগপীঠেই নাকি গোবিন্দদেব আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তাহার গর্ত্ত আজিও আছে।

গেলে একটা সংকীর্ণ,অন্ধকারময় স্থানে যাওয়া যায়। সেখানে দীপালোকে একখানি পাথরের উপর একটি অষ্টভুজা সিংহবাহিনী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি নন্দ-দুহিতা যোগমায়া দেবী। এখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ-চিহ্নও আছে। উত্তর দিকে যে ছোট মন্দিরটা আছে, সেটিতে বৃন্দাদেবী স্থাপিতা ছিলেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতে রূপ গোস্বামী দেবীকে পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। এখন বৃন্দাদেবী কাম্যবনে স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। শূন্য মন্দিরের ভিতরে আজ-কাল ঘুঁটিয়া, কাঠ, কয়লা প্রভৃতি রাখিবার গুদাম হইয়াছে। কি চমৎকার পরিবর্ত্তন!

এই ছোট মন্দিরটার উত্তর দিকের ভিত্তিগাত্রে হিন্দী বা নাগরী অক্ষরে নিম্নলিখিত কথাগুলি খোদিত আছে।

"সংবৎ ৩৪ শ্রীশকবন্ধ আকবর সাহ। রাজশ্রী কর্ম্মকুল শ্রীপৃথ্বীরাজাধিরাজবংশ মহারাজ শ্রীভগবন্তদাসসুত শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমানসিংহদেব শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠ স্থান মন্দির বনাও শ্রীগোবিন্দদেব কো কাম উপরি শ্রীকল্যাণ দাস আজ্ঞাকারী মাণিকচংদ চোঁপাড় শিল্পকারি গোবিন্দ দাস দিলবলী কারিগর। দঃ গণেশ দাস বিমবল।"

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, আকবর বাদশাহের ৩৪ রাজ্যাব্দে (১৫৯০ খৃঃ অঃ) পৃথ্বীরাজাধিরাজ-বংশীয় শ্রীভগবন্তদাস-পুত্র শ্রীমানসিংহদেব কর্তৃক এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হয়। এবং নির্ম্মাণ-কার্য্যে কল্যাণদাস আজ্ঞাকারী, সর্দ্দার মিস্ত্রী, মাণিকচাঁদ চোঁপাও শিল্পকারী বা ভাস্কর ছিলেন। দিল্লীবাসী গোবিন্দদাস কারিকর বা রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত ছিল। গণেশ দাস বিমবল, বোধ হয় মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক রাজকর্ম্মচারী হইবেন। তাই বোধ হয় তাঁহার দঃ অর্থাৎ দস্তখতের উল্লেখ দেখিতে পাইতেছি।

সুতরাং গোবিন্দদেবের আবিষ্কারের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে এই মন্দির নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া বুঝা যাইতেছে। এই মন্দির-নির্ম্মাণ-সময়ের বিষয়ে আমার একটু খট্‌কা লাগে। যদি এই মন্দির ১৫৯০ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে "শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ" (১৫৩৭ শকে বা ১৬১৫ খৃঃ অঃ) লিখিত চরিতামৃতে তাহার উল্লেখ নাই কেন? কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের গ্রন্থে গোবিন্দদেবের মন্দির সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিত আছে যে, রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী—

নিজ শিষ্যে কহি গোবিন্দ মন্দির করাইল।
বংশী মকর কুণ্ডল আদি ভূষণ করি দিল॥
(চৈঃ চ, অঃ লীঃ, ১৩ পঃ)

রঘুনাথ ভট্টের এই শিষ্য কে? তিনিই কি মানসিংহ? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবিরাজ মহাশয় কোথাও একটিবারও মহারাজ মানসিংহের নাম করেন নাই। পরবর্ত্তী কোন বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরাও কেহ তাঁহার নাম মুখে আনেন নাই। মানসিংহ বহুলক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ দেব-সেবারও যথোচিত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া থাকিবেন। তথাপি গৌড়ীয় কোন লেখকই তাঁহার নাম করিলেন না কেন? আমরা এ প্রহেলিকার অর্থ বুঝিতে সক্ষম নহি!

আকবর বাদসাহের সমদর্শিতা, পর-ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা (Religious toleration) ও হিন্দুপ্রীতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তিনি জিজিয়া ও তীর্থযাত্রীদের দেয় কঠোর করগুলি উঠাইয়া দেন। হিন্দু, মুসলমান, পারসী, খৃষ্টান, ইহুদী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের দার্শনিক, পণ্ডিত ও সাধুগণকে আপন সভায় সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের তর্কবিতর্ক শুনিতে ভাল

বাসিতেন। মুসলমান-শাসন-কালে রাজাজ্ঞা ভিন্ন কাহারও মন্দিরাদি বা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা ছিল না। আকবর সামন্ত-রাজগণে পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবন স্বয়ং দেখিতে আইসেন; এবং তাঁহারই অনুমতি-ক্রমে মানসিংহ, রায়সিংহ, বীরবল, নোন্‌করণ, টোডরমল ও সুন্দরলাল প্রভৃতি হিন্দু নরপালেরা এই তীর্থে সুরম্য মন্দিরাদি করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই সকল গুণের জন্যই বোধ হয়, তৎকালীন হিন্দুরা তাঁহাকে হিন্দুবেশে চিত্রিত করিয়াছেন।

সম্রাট, রাজা মানসিংহকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে 'ফরজন্দ' বা পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন, এবং তাঁহাকে, সাহজাদাগণের সমকক্ষ ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের মন্‌সবদার পদে উন্নীত করিয়াছিলেন।

মানসিংহ যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সে কথা ইহাঁর সমসাময়িক বাঙ্গালী কবি মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীকাব্যে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু-পদাম্বুজ-ভৃঙ্গ,
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধিপ।"

তিনি কেবল গোবিন্দজীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, পাঠানগণেরা, পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির লুণ্ঠন ও সম্পত্তি অপহরণ করিলে, তাহাদিগকে সমুচিত শাসন করিয়া, দেবোত্তর-সম্পত্তি-রক্ষার সুদৃঢ় বন্দোবস্ত করিয়া যান। কিন্তু স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি অপর সম্প্রদায়ের উপর বিদ্বেষ করিতেন না। তিনি বাঙ্গালাদেশ হইতে শিলাদেবী নামক শক্তিপ্রতিমা লইয়া গিয়া নিজ রাজধানী অম্বরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আর তৎসঙ্গে কয়েক ঘর বাঙ্গালী তান্ত্রিক পূজারীকেও নিজ রাজ্যে স্থাপিত করেন। কাবুলে যুদ্ধযাত্রা কালে যখন তাঁহার রাজপুত-সৈন্যেরা জাতি ও ধর্ম্মনাশ ভয়ে আটক নদী পার



হিন্দু বেশে সম্রাট আকবর

হইতে ইতস্ততঃ করিতেছিল, তখন তিনি তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সারা দুনিয়া গোপাল জীকা,
ঝুটা ভেদ বিচার।
জিন্‌কা মন্‌মে আটক রহে
আটক ন হো পার॥"

এই উক্তি হইতে তাঁহার উদার মতের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি আকবরের আমলে ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবেদাররূপে, বিদ্রোহী পাঠানগণকে শাসন করিয়া এ দেশে শান্তি-স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময়েও বাঙ্গালায় আসিয়া যশোরপতি প্রতাপাদিত্যকে দমন করেন। তাঁহার সৈন্যগণকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ভবানন্দ, ইঁহার অনুরোধে দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে ১৪খানি পরগণার আধিপত্য ও মজুমদার উপাধি লাভ করেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

রাজা-প্রতাপসিংহ-রচিত, লক্ষ্ণৌনগরে মুদ্রিত "ভক্তকল্পদ্রুম" নামক একখানি হিন্দীগ্রন্থে লিখিত আছে যে, আকবর বাদসাহ যখন আগরায় কেল্লা নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন, তখন জয়পুরী লাল-পাথর আর কাহারও পাইবার হুকুম ছিল না। মানসিংহের অনুরোধে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য বাদসাহ বিনামূল্যে তাঁহাকে লাল-পাথর দিয়াছিলেন। কেবল মসলা ও কারিকরদিগের বেতন জন্য মানসিংহের তের লক্ষ টাকা ব্যয় পড়ে, পাথরের দাম কিছুই লাগে নাই।

আরঙ্গজেবের উপদ্রবের পর বহুকাল পর্য্যন্ত এ মন্দিরটী ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। এদেশের অনেক রাজারা বৃন্দাবনে নিজ নিজ নাম জাহির করিবার জন্য বিপুল বিত্তব্যয়ে অনেকগুলি মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু কেহই অতুল ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ এই সুন্দর মন্দিরটি সংস্কার করিবার উদ্‌যোগ করেন নাই। দুঃখের কথা বলিতে কি, অবশেষে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী মথুরার কলেক্টার গ্রাউস সাহেব এই মন্দিরটির জীর্ণসংস্কার করিয়া দিলেন। এ মন্দিরটি মেরামত করিতে প্রায় ৩৮ আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয়। জয়পুরের রাজারা কেবল পাঁচহাজার টাকা দিয়াছিলেন, বাকী গবর্ণমেণ্ট সরবরাহ করিয়াছেন।

মুসলমান রাজগণ মন্দির চূর্ণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইতেন। সুসভ্য বৃটিশরাজ, ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও গয়া, কাশী, বৃন্দাবন কত স্থানেই না প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্ত্তির সংস্কার করিয়া দিতেছেন। এরূপ মহানুভাবতা অন্য কোন রাজার আমলে দেখা দূরে থাক, শুনাও যায় না। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকে, সংবৎ ১৬৯৩ (১৬৩৬ খৃঃ অঃ) সাজাহান বাদশাহের রাজত্বকালে, রাণা অমর সিংহের পুত্র রাণা ভীমসিংহের রাণী, রম্ভাবতী দেবী একটি চারিস্তম্ভ-শোভিত সুন্দর ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। গ্রাউস সাহেব সেটীকে সরাইয়া পশ্চিম দিকে যে স্থানে মূল মন্দির ছিল, সেই স্থানে বসাইয়া দিয়াছেন। স্তম্ভগাত্রে রাণীর নাম লেখা রহিয়াছে। ইহার ভিতর যুগল-চরণচিহ্ন স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি কথঞ্চিৎ রক্ষা করা হইয়াছে। আর তাহাতে ভাঙ্গাস্থানের বৈসাদৃশ্য কতকটা ঢাকা পড়িয়াছে। এ মন্দিরটির কারুকার্য্য ও গঠনের এত সামঞ্জস্য যে, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দূর-দেশ হইতে পর্য্যটকেরা ইহা দেখিতে আইসেন। গ্রাউস সাহেব বলেন—"এই মন্দিরের তুল্য নয়নরঞ্জন দেবালয় উত্তর-ভারতে আর দ্বিতীয় নাই

বলিলেই হয়।" ইউরোপীয় শিল্পকলাবিদ্‌গণের মতে ইহার উপরিভাগ মোগল ও নিম্নভাগ হিন্দু ধরণের; সুতরাং এটিকে মোগল ও হিন্দু মিশ্র ভাস্কর্য্যের আদর্শ বলা চলে। ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি দেশের মুদ্রিত গ্রন্থে, ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আদর্শরূপে এই মন্দিরের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। ভিত্তি-বিন্যাসটি (Ground plan) ক্রসের (Cross) আকারে দেখিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, আকবর বাদসাহের সভায় যে সকল খৃষ্টীয়ান জেসুইট্ পাদরীরা আসিত, তাহাদের পরামর্শে বুঝি এই মন্দিরটা নির্ম্মিত হইয়াছে। কেন না, ইউরোপীয় কতকগুলি গির্জ্জার ভিত্তিবিন্যাস এই ধরণের। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র। পুরাতন মন্দিরের দক্ষিণে একটু নিম্নভূমিতে, লাল পাথরের গাঁথা একটি ছোট ঘর আছে; পরবর্ত্তীকালে তাহার সহিত আরও ২।১টা ইঁটে-গাঁথা ছোট কুটুরী যোজিত হইয়াছিল। আমাদের ব্রজবাসী, পেয়ারী লাল টেঁটীওয়ালা মহাশয় (এই মন্দিরের সম্মুখে ঘেরার মধ্যে তাঁহার বাটী) সেটিকে রূপ গোস্বামীর বৈঠক বলিয়া পরিচয় দিলেন। সেগুলা এত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে যে, কবে ভূমিসাৎ হয়, স্থিরতা নাই!

মানসিংহ-নির্ম্মিত গোবিন্দদেবের মন্দিরের ভিত্তি-বিন্যাস

ক—মূল মন্দির এখানে ছিল, এখন রম্ভাবতী রাণীর ছত্রী মধ্যে চরণ-চিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে।

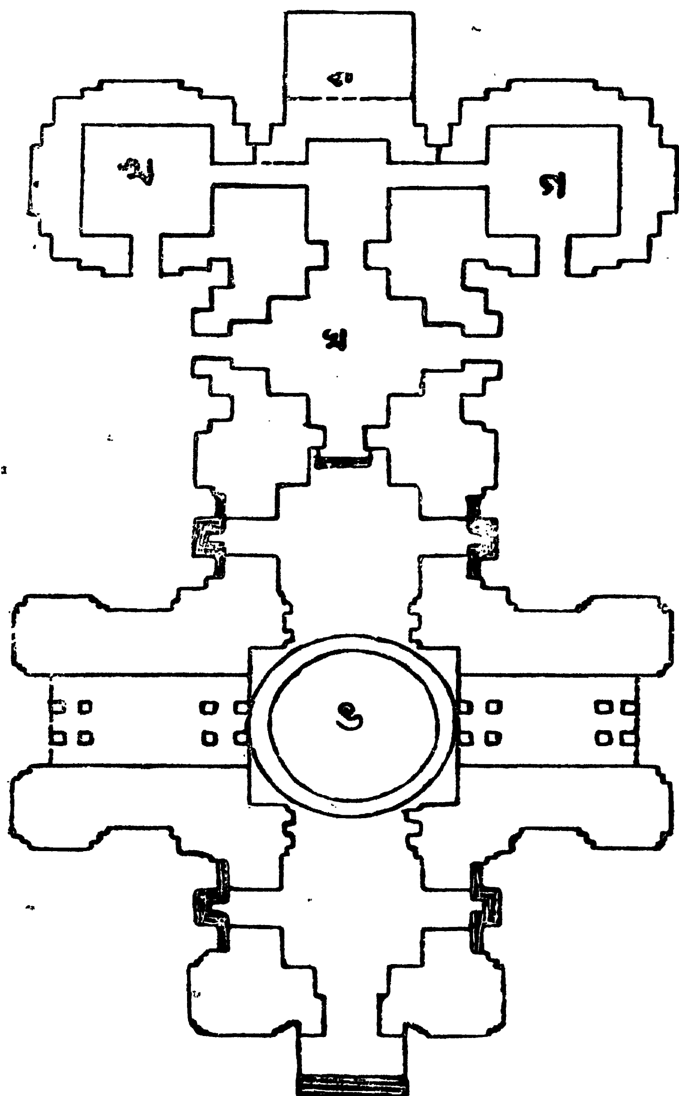
খ—যোগ-পীঠ।

গ—বৃন্দাদেবীর মন্দির।

ঘ—জগমোহন।

ঙ—নাট-মন্দির।

পূর্ব্বে এই পাঁচ স্থানে পাঁচটি চূড়া ছিল।



গ
ঘ
ঙ

গোবিন্দজীর নূতন মন্দির।

আরঙ্গজেবের উপদ্রবে গোবিন্দজী প্রভৃতি বিগ্রহগুলি জয়পুরাদি স্থানে প্রেরিত হইলে পর, পুনরায় কোন্ সময় এবং কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক নূতন প্রতিনিধি ঠাকুর গড়াইয়া বৃন্দাবনে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বহু অনুসন্ধান করিয়াও প্রথমে জানিতে পারি নাই। অবশেষে পূর্ব্বোক্ত 'ভক্তকল্পদ্রুম' গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিলাম যে, দিল্লীপতি মহম্মদ সাহের সময়ে (১৭১৯ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ অঃ মধ্যে) দ্বিতীয়বার প্রতিভূ-গোবিন্দ-মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। পুরাতন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে, যে নূতন মন্দিরে গোবিন্দজী অধুনা বিরাজ করিতেছেন, সে মন্দিরটি ২৪ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর-মজিলপুর গ্রামের সন্নিহিত বহড়ু বা বড়ু গ্রামের জমিদার ৺নন্দকুমার বসু মহাশয় ১৮১৯ খৃঃ অঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। নন্দকুমার বাবুর বংশধরগণের মুখে শুনিতে পাই যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে, হিজলীতে নিমকীর দেওয়ান ছিলেন। রাজকার্য্য ও তৎসঙ্গে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাকে জয়পুর, মথুরা প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইয়াছিল। তিনি জয়পুরের কোন রাণীর নিকট হইতে প্রত্যুপকার স্বরূপ কয়েক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। নন্দবাবু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সেই টাকা পাইয়া তিনি বৃন্দাবনধামে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনজীর তিনটি ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। অধুনা সেই সকল মন্দিরে উক্ত দেবতাগণের সেবা চলিতেছে।

এ মন্দিরগুলি দেখিতে বাঙ্গালা দেশের চণ্ডীমণ্ডপ বা ঠাকুর-দালানের মত। উপরে চূড়া প্রভৃতি কিছুই নাই। দালানের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। উঠানের উত্তর-পূর্ব্বদিকের দরজা দিয়া একটি মহলে যাওয়া যায়।

সেটি মানসিংহের সময়ের রসুই ও ভাণ্ডার মহল ছিল। লম্বা লম্বা ঘরগুলির ছাদে কড়ি নাই, খিলান-গাঁথা। যতদিন নন্দকুমার বাবুর মন্দির হয় নাই, প্রায় ১০০ শত বৎসর এই মহলেই প্রতিভূ-গোবিন্দদেব স্থাপিত ছিলেন। এখন এ সকল গৃহে ভাণ্ডার ও কর্ম্মচারিগণের আবাস হইয়াছে। ইহার পশ্চিমেই নূতন রন্ধনশালা। এ সকল মহলে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ইহারও পশ্চিম দিকে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি থাকিবার 'নাহার বাড়ী' নামক স্থানটাও প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। বাহির দিকের স্বতন্ত্র পথ দিয়া এ মহলে যাইতে হয়।

নন্দকুমার বাবু যে নূতন মন্দির করিয়া দিয়াছেন, আজকাল নানা দেশীয় ভক্তগণের ব্যয়ে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়িয়া গিয়াছে। দালান ও উঠান মার্ব্বেল পাথরে মণ্ডিত হইতেছে। কিছু টাকা দিলেই যাত্রীগণ তাহার উপর নিজ নাম, ঠিকানা প্রভৃতি লিখাইয়া দিতে পারেন। মন্দিরের দ্বারগুলি তাঁহাদের অর্থে রূপার পাতে শোভিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে বেদী বা সিংহাসনের উপর প্রায় ১॥ হাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত ত্রিভঙ্গ মুরলীধর গোবিন্দদেবের মূর্ত্তিটি নানালঙ্কারে ভূষিত। বামে অষ্ট-ধাতু-নির্ম্মিতা রাধিকা দেবী ও শালগ্রাম-শিলা। এই বেদীর উপরেই একটু দক্ষিণ দিকে সুন্দরানন্দ গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি, নাম 'চিকনিয়া'। তৎপার্শ্বে স্বতন্ত্র আসনে নিতাই-চৈতন্য-বিগ্রহও স্থাপিত রহিয়াছেন। এখানে অহোরাত্রে পাঁচবার ভোগ ও সাতবার আরতি হয়। যে মূর্ত্তিটি গোস্বামী প্রভুরা গোবিন্দদেবের প্রতিভূস্বরূপে স্থাপন করিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, সেটি ইংরাজী ১৯১১ সালে চৈত্র মাসে ভাঙ্গিয়া যায়। পরবর্ত্তী বৈশাখ মাসে অপর একটি নূতন বিগ্রহ প্রস্তুত হইয়াছে, এখন তাঁহারই পূজা চলিতেছে।

বৃন্দাবনে যে সাতটি প্রধান গৌড়ীয় দেবালয় আছে, তাহার সেবাইত

বা পূজারীগণ সকলেই বাঙ্গালী। গোবিন্দজীর পুজারীরা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ওকড়সা গ্রামের ভট্টাচার্য্য-বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ। জয়পুরে যে ঠাকুরটি আছেন, সেখানেও ইঁহারা সেবাইত। করৌলী ও বৃন্দাবনে গোপীনাথ ও মদনমোহনের সেবাইতগণ বাঁকুড়া জেলার গজা গ্রামের ভট্টাচার্য্য-বংশীয় সন্তান। ইঁহাদের এখন গোস্বামী পদবী। যাঁহারা জয়পুর ও করৌলিতে সেবায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদের ভাষা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সহজে বাঙ্গালী বলিয়া বুঝা যায় না।

গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি দেবতাগণকে প্রথম দর্শন করিতে গেলে ভেট বা প্রণামী দিতে হয়। যাঁহারা ৫৲ পাঁচ টাকা বা তদূর্দ্ধ ভেট দেন, তাঁহাদের মস্তকে জড়ির পাড়-বসান প্রসাদী লাল-বস্ত্রের শিরোপা বাঁধিয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৷৷০ আড়াই টাকা বা অধিক যাঁহারা ভেট দেন, তাঁহাদের মাথায়ও লাল বস্ত্র দেওয়া হয়, তবে তাহাতে জরি থাকে না। ইঁহাদের নাম 'লাল যাত্রী।' ২৷৷০ আড়াই টাকার কম যাঁহারা ভেট দেন, তাঁহাদের শিরোপা নাই, কেবল লাড়ু প্রসাদ পাইয়া থাকেন। ভেটের টাকাতেই দেবসেবা ও মন্দিরের অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। গোবিন্দজী বৃন্দাবনে প্রধান বিগ্রহ। ভেট ছাড়া ভূসম্পত্তি হইতে আরও অনেক টাকা আয় আছে। আমরা পরিশিষ্টে উৎসব ও পর্ব্বাদির বিবরণ দিব।

বৃন্দাবনে ফাল্গুন মাসে 'হোলি', শ্রাবণ মাসে 'ঝুলন', কার্ত্তিক মাসে শরতের 'রাস' ও 'অন্নকূট' পর্ব্বোপলক্ষে মহোৎসব হয়। সে সময়ে ভারতের নানা দেশ হইতে অসংখ্য যাত্রীদল আইসেন। তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা প্রায় বার আনা।

রূপ গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে মাঝে মাঝে রাধাকুণ্ড তীরে আসিয়া রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির সহিত একত্র থাকিয়া

কাব্যামোদে কাল কাটাইতেন। বৃন্দাবনে অবস্থান-কালে গোবিন্দজীর সেবা করিতেন। তিনি ১৬খানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।*

তিনি যখন কবিতা রচনা করিতে বসিতেন, তখন একেবারেই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। একবার একজন 'বিশিষ্ট বৈষ্ণব' আসিয়া তাঁহাকে শূন্য দৃষ্টিতে হাসিতে দেখিয়া আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া ফিরিয়া চলিয়া যান। পরে এই বিবরণ রূপ-গোস্বামী জানিতে পারিয়া করযোড়ে তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। রূপ গোস্বামী একাধারে বিচক্ষণ রাজ-কর্ম্মচারী, সুপণ্ডিত, স্বভাব-কবি ও প্রেমিক ভক্ত ছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থে আছে "শ্রীরূপের হস্তাক্ষর মুকুতার পাঁতি।" তিনি রন্ধন বিষয়ে দক্ষতা দেখাইয়া সনাতন ও অপরাপর বৈষ্ণবগণকে পায়স সেবন করাইয়াছিলেন। 'ভক্তি-রত্নাকর' গ্রন্থে ৪র্থ তরঙ্গে ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে,তিনি রাধা-দামোদর বিগ্রহটিকে 'স্বহস্তে নির্ম্মাণ' করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীকে পূজা করিবার জন্য দিয়াছিলেন। এত গুণ না থাকিলে কি তিনি অম্বরপতি মানসিংহকে দিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লইতে পারিতেন?

"বিশ্বকোষ" অভিধান গ্রন্থে দেখিতে পাই, ইঁহার পূর্ব্বনাম 'সন্তোষ' ছিল। ইঁহার জন্ম ১৪৮৯ খৃঃ অঃ, মৃত্যু ১৫৬৩ খৃঃ অঃ। রাধা-দামোদরের মন্দিরের উত্তর দিকে একটি সুবৃহৎ তিন্তিড়ী-বৃক্ষ-তলে ইঁহার সমাধি আছে। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তাঁহার তিরোধান-মহোৎসব হইয়া থাকে।

* 'হংস দূত', (গণ্ড কাব্য) 'কৃষ্ণজন্মতিথি', 'গণোদ্দেশ-দীপিকা', 'উদ্ধব সন্দেশ', 'স্তবমালা', 'বিদগ্ধমাধব' ও 'ললিত মাধব' (নাটক), 'দানকেলি-কৌমুদী', 'দানলীলা-কৌমুদী', 'ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু', 'উজ্জ্বল নীলমণি' 'আখ্যানচন্দ্রিকা', 'মথুরামহিমা', 'পদ্যাবলী', 'নাটক চন্দ্রিকা' ও 'গোবিন্দবিরুধাবলী'।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মদনমোহনজী

চরিতামৃতে মদনমোহন-প্রতিষ্ঠাতা সনাতন গোস্বামীর এই... জীবনী দেওয়া আছে। ইহার মধ্যম ভ্রাতা রূপ গোস্বামী, হুসেন সাহা নবাবের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে পর, ইনি কতকটা উদাসীন ভাবে গৃহে ছিলেন। তখন তিনি প্রায় রাজকার্য্যে ও সাকর-মল্লিক বা কোষাধ্যক্ষের পদ অবহেলা করিয়া, নিজ গৃহে পণ্ডিতগণকে লইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিতেন। নবাব-সরকারে নিজ অসুস্থতা জানাইয়া কর্ম্মে অনুপস্থিত থাকিতেন। নবাব নিজ হাকিমকে ইঁহার রোগ-চিকিৎসার জন্য পাঠাইলেন। হাকিম দেখিয়া গিয়া নবাবকে জানাইলেন যে, সনাতনের দেহে তিনি কোন রোগ খুঁজিয়া পান নাই। নবাব স্বয়ং দেখিতে আসিলেন। তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি তোমার রোগ শুনিয়া বৈদ্য পাঠাইয়াছিলাম। সে আমাকে সংবাদ দিয়াছে যে, তোমার শরীরে কোন ব্যাধি নাই। তবে কেন তুমি অলসের ন্যায় গৃহে বসিয়া আছ? তোমার মনোগত অভিপ্রায়টা কি?" সনাতন বিনীতভাবে জানাইলেন "আপনি অন্যলোক দেখুন, আমি আর আপনার কার্য্য করিতে সক্ষম নহি।" নবাব নিজ কর্ম্মচারীর মুখে বারবার এইরূপ প্রত্যাখ্যান শুনিয়া তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইলেন। কিয়দ্দিন পরে উড়িষ্যার রাজার সহিত নবাবের গোলযোগ বাধিল। তিনি পুনরায় সনাতনকে আনাইয়া বলিলেন, "আমি উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে যাইতেছি। তুমি আমার বড় বিশ্বাসী ও কর্ম্মদক্ষ,—চল আমার সঙ্গে চল।" ইহা শুনিয়া—

"তেঁহ কহে তুমি যাবে দেবে দুঃখ দিতে।
মোর শক্তি নাই তোমার সঙ্গে যাইতে।"
(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, ২০ পরিচ্ছেদ)

হুসেন সাহা এইরূপ উত্তর শুনিয়া, তাঁহাকে কঠোরতর কারাগারে পাঠাইয়া, উড়িষ্যাবিজয় জন্য গৌড় হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রূপের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, প্রভু নীলাদ্রি হইতে বৃন্দাবনে যাত্রা করিয়াছেন, এবং তাঁহার মুক্তির জন্য দশ সহস্র মুদ্রা মুদিঘরে জমা আছে। যেরূপে পারেন, তিনি যেন পলাইয়া আইসেন। অনন্যগতি সনাতন এই শেষ উপায় অবলম্বন করিলেন।

কারারক্ষীকে সাত হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া, ছদ্ম-দরবেশ-বেশে সনাতন রাত্রিকালে ভেলায় চড়িয়া নদী পার হইলেন। সাধারণ পথ পরিত্যাগ করিয়া, গুপ্তপথে পাতড়া পর্ব্বত পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনুগত একমাত্র ভৃত্য ঈশান ছিল। একদিন রাত্রিতে এক ভুঁঞার বাটীতে তাঁহারা অতিথি হইলেন। ভুঁঞার 'অতিভক্তি' দেখিয়া লক্ষণটা ভাল নয় বুঝিলেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিকট কি কিছু সুবর্ণ মুদ্রাদি আছে?" ঈশান বলিলেন, "সাতটি মোহর গুপ্তভাবে আনিয়াছি।" সনাতন ভৃত্যকে ভর্ৎসনা করিয়া ভুঁঞাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু হে, এই সাতটি মোহর আমাদের নিকট ছিল, তুমি ইহা লইয়া আমাদিগকে পর্ব্বত পার করিয়া দাও।" ভুঁঞা হাসিয়া বলিল, "আমার গণৎকার জানাইয়া দিয়াছে যে, তোমার চাকরের নিকট আটটি মোহর আছে। যদি তুমি আপন ইচ্ছায় এই মোহরগুলি না দিতে, তবে আজ রাত্রিতে তোমাদিগকে মারিয়া তাহা আত্মসাৎ করিতাম।" ভুঁঞা তাঁহার অকপট ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া চারিজন পাইক সঙ্গে দিয়া পর্ব্বতপথ উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন।

এখান হইতে সনাতন ঈশানকে বিদায় করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন পথ হাঁটিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে হাজীপুরে পৌঁছিয়া এক বৃক্ষতলে আসিয়া বসিলেন। এদিকে তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, নবাবের নিকট হইতে তিন লক্ষ টাকা লইয়া ঘোড়া কিনিবার জন্য হাজিপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সনাতনের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। তিনি ইঁহাকে বাটী ফিরিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন। শেষে যখন কিছুতেই নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন শ্রীকান্ত তাঁহার শীত-নিবারণের জন্য একখানা ভোট কম্বল তাঁহার গায়ে জড়াইয়া দিলেন ও নৌকা করিয়া গঙ্গা পার করিয়া দিলেন।

সনাতন ক্রমে বারাণসীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। অনুসন্ধান করিয়া চন্দ্রশেখরের বাটীর দ্বারে আসিয়া বসিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সেই বাটীর ভিতরে থাকিতেন।

চৈতন্যদেব চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, "দ্বারে একজন বৈষ্ণব আসিয়াছে, তাহাকে ডাকিয়া আন।"

চন্দ্রশেখর দেখিয়া গিয়া বলিলেন, "দ্বারে ত কোন বৈষ্ণব দেখিতেছি না; একজন দরবেশ বসিয়া আছে।" প্রভু বলিলেন, "তাহাকেই লইয়া আইস।" সনাতনের তখন দাড়ি গোঁফ বাহির হইয়া ছদ্মবেশটা এত অবিকল হইয়াছিল যে, বাঙ্গালী হইয়াও চন্দ্রশেখর তাঁহাকে হিন্দু বলিয়া চিনিতে পারেন নাই।

তিনি ভিতরে গেলে প্রভু উঠানে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভু মুসলমান দরবেশকে আলিঙ্গন করিতেছেন দেখিয়া চন্দ্রশেখর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব তাঁহার হাত ধরিয়া পিঁড়ার উপর লইয়া গিয়া নিজ পার্শ্বে বসাইলেন। সনাতন কাতরভাবে

জানাইলেন, "আমি যবন-সংস্পর্শে অপবিত্র দেহ, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।"

"প্রভু কহে তোমায় স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, ২০ পরিচ্ছেদ)

ইহা বলিয়া তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কয়েকটি জাতি-গৌরব-বিরোধী শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। তাহার একটি এই ঃ—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পদারিবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনো বচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি সকুলং নতু ভূরিমানঃ॥

ইহার অনুবাদ এই, যথা—

নৃসিংহদেবকে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, যাহার মন, বাক্য, চেষ্টা, ধন সকলই ভগবানে অর্পিত, তাদৃশ চণ্ডালও, ভগচ্চরণারবিন্দ-বিমুখ দ্বাদশ-গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কেন না, সেই চণ্ডাল নিজবংশ পবিত্র করে। কিন্তু ভূরিগর্ব্বান্বিত উক্তরূপ বিপ্র আত্মাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

এই সকল উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, চৈতন্য-দেব জাতি, জ্ঞান ও বিদ্যার গৌরব অপেক্ষা ভক্তিরই অধিক সমাদর করিতেন। সে যাহা হউক, প্রভু বলিলেন "পতিতপাবন শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে বিষয়রূপ মহারৌরব হইতে উদ্ধার করিলেন।"

সনাতন কহে কৃষ্ণে আমি নাহি জানি।
আমার উদ্ধার হেতু তোমার কৃপা মানি॥

(চৈঃ চঃ, মঃ লীঃ, ২০ পরিচ্ছেদ)

তাহার পর সনাতন গঙ্গাস্নান করিয়া নিজ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। চৈতন্যদেব তাঁহার গাত্রে বহুমূল্যের ভোট-কম্বলখানি দেখিয়া একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা বুঝিয়া তিনি একজন দরিদ্র বৈষ্ণবকে কম্বলখানি দিয়া তাহার নিকট হইতে একখানি ছেঁড়া কাঁথা লইয়া গায়ে দিয়া আসিলেন। এইরূপ দৈন্য দেখিয়া প্রভু আরও সন্তুষ্ট হইলেন।* কাশীতে দুই মাস থাকিয়া চৈতন্যদেবের নিকট হইতে, তাঁহার প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যগুলি শিক্ষা করিলেন। এই সময়েই চৈতন্যদেব তথাকার বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রবোধানন্দ স্বামী নাম দিয়াছিলেন।

তাহার পর সনাতন চৈতন্যদেবের আদেশক্রমে বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন। বিভিন্ন পথে গিয়াছিলেন বলিয়া অনুজ রূপ ও বল্লভের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি এক বৎসরের উপর বৃন্দাবনে বাস করিলেন। তাহার পর ঝাড়ীখণ্ড পথে আসিয়া পুরীধামে চৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রূপ তখন বৃন্দাবনে প্রস্থান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত সনাতনের পুরীধামেও সাক্ষাৎ হয় নাই।

* প্রয়াগ হইতে মথুরা যাইবার পথে, যমুনাতীরে জালন পরগণার অন্তর্গত ইটোজা নামক গ্রামে একটি মন্দিরে একখানা কম্বলের পূজা হয়। পূজারীরা বলেন, সে কম্বলখানা চৈতন্যদেব কোন দরিদ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু কোনগ্রন্থে চৈতন্যদেবের কম্বল-দানের কথা পাই নাই। অনেকে অনুমান করেন, এখানা চৈতন্যদেবের অভিপ্রায়মত সনাতন কর্ত্তৃক প্রদত্ত সেই কম্বল। শুনা যায়, এ মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, জাহাঙ্গীর বাদশাহ দুই খানা গ্রাম জায়গীর দিয়াছেন। আরও একটা কথা এই যে, দরবেশ বলিলে মুসলমান সন্ন্যাসীর এক সম্প্রদায় বুঝায়, হিন্দু বৈষ্ণবগণের মধ্যেও দরবেশ নামে সম্প্রদায় আছে। তাঁহারা বলেন, সনাতন গোস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। একথা কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে পাই নাই, তবে সনাতন দায়ে পড়িয়া একবার ছদ্ম দরবেশ সাজিয়াছিলেন এইমাত্র।

তাঁহার গাত্রে বড়ই ক্ষত কণ্ডু হইয়াছিল। তিনি মনোদুঃখে স্থির করিয়াছিলেন, এ অধম অক্ষম দেহ আর রাখিবেন না। দূর হইতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া, জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিনে, 'রথ চাকায় ছাড়িব শরীর', মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিলেন। পুরীধামে সনাতনও যবন হরিদাসের বাসায় থাকিতেন। আপনাকে অপবিত্র দেহ মনে করিয়া, পাছে জগন্নাথ দেবের সেবকগণের সহিত স্পর্শ হয়, এই ভয়ে সতত দূরে অবস্থান করিতেন। তিনি, রূপ ও যবন হরিদাস—ইহাঁরা কেহই জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতেন না। দূর হইতেই মন্দিরকে প্রণাম করিতেন।

যখন সনাতনের সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। গায়ে রসাকণ্ডু ছিল বলিয়া তিনি দূরে পলাইতে চাহিলেন, প্রভু তাঁহাকে বলপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কৃষ্ণ আমাকে পরীক্ষার জন্যই তোমার গায়ে রসাকণ্ডু দিয়াছেন। আমি যদি তোমাকে ঘৃণা করিয়া স্পর্শ না করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখনই আমাকে কৃপা করিবেন না।" তিনি আরও বলিলেন, "তোমার এই রসাকণ্ডুভরা দেহ ত্যাগ করিবে বলিয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ ; এটা তোমার মহা ভ্রম।" আমরা এখানে চৈতন্যচরিতামৃত হইতে নিম্নের উদ্ধৃত অংশটুকু দিতেছি। ইহা হইতে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সনাতনের দেহ চৈতন্যদেবের কত প্রিয়, ও তদ্দ্বারা তিনি কি কি কর্ম্ম সাধন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রভু কহে তোমার দেহ মোর নিজ ধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ ॥
পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ॥

তোমার শরীর আমার প্রধান-সাধন।
এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন॥
ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার।
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার॥
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপ্রেম সেবা প্রবর্ত্তন।
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ॥
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন।
তাহা এত ধর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ॥
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে।
তাহা ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে॥
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব।
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমতে সহিব॥

(চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ৪র্থ পরিঃ)

উপরি উদ্ধৃত কবিতা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, চৈতন্যদেবই 'কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম সেবা' বঙ্গদেশে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে এ দেশে যে কৃষ্ণপূজা বিরল ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।*

সনাতন ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন। তিনি ত তাঁহাকে দেহত্যাগের কথা জানান নাই। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু, তাই বুঝি জানিতে পারিয়া

---

* রূপ ও সনাতন গোস্বামীরাই যে বৃন্দাবনে প্রথম কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে কথাটাও চরিতামৃতে এইরূপ পাওয়া যায়,—

দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল॥
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিল।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা প্রকাশ করিল॥

(অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।)

তাঁহাকে এরূপ বলিতেছেন। যাহা হউক, সনাতনও এক বৎসর পুরী-ধামে অবস্থান করিয়া,সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে কিরূপে গুপ্ত বিগ্রহগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সে কথা চৈতন্য-চরিতামৃতে নাই। 'ভক্তমাল' ও 'ভক্তিরত্নাকরে' দেখিতে পাই, তিনি মহাবনে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি চৌবের বালককে মদনগোপাল বিগ্রহ লইয়া সখাভাবে ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন এবং চৌবের পত্নীর নিকট হইতে ঐ মদনগোপাল বিগ্রহটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিলেন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের সেবা-প্রাকট্য ও ইষ্ট-লাভের দিন-নির্ণয় নামক সূচক গ্রন্থে লিখিত আছে, সনাতন গোস্বামী ১৫৯০ সম্বতে (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) মহাবনের পরশুরাম চৌবের নিকট হইতে মদনগোপাল আনিয়া, সেই বৎসর মাঘ মাসে শুক্লাদ্বিতীয়া-দিনে বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামক একজন পূজারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সনাতন আদিত্যটীলা নামে বৃন্দাবনের যমুনাতীরবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ স্তূপের উপর কুটীর বাঁধিয়া তাহাতেই ঠাকুর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ভিক্ষালব্ধ আটা জলে গুলিয়া, গোলা পাকাইয়া, আগুনে পোড়াইয়া, 'আঙাকড়ি' নামক রুটী তৈয়ারী করিতেন। তাহার সহিত বন্য শাক জলে সিদ্ধ করিয়া মদনগোপালকে ভোগ দিয়া প্রসাদ পাইতেন। তাহাতে একটু লবণও থাকিত না। ঠাকুর একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে জানাইলেন যে, এইরূপ অলবণ দ্রব্য তিনি খাইতে পারেন না। তাহার জন্য শাকাদিতে যেন একটু লবণ দেওয়া হয়। প্রভাতে উঠিয়া সনাতন প্রভুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, আমি ভিক্ষায় যাহা পাই, তাহা দিয়াই আপনার সেবা করি। আমি ভিখারী, লবণাদি কোথায়"



বৃন্দাবনের মদনমোহনজী।

পাইব? আপনি ত স্বয়ং ইচ্ছাময়, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া লউন।”

ইহার কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস কর্পূর নামক একজন মূলতান দেশীয় বণিক, নৌকা করিয়া নানা পণ্য সম্ভার লইয়া, আগ্রায় বিক্রয় করিতে যাইতেছিলেন।

যমুনার চড়ায় তাহার নৌকা বাধিয়া গেল। কিছুতেই যখন নৌকা ভাসাইতে পারিলেন না, তখন বণিক সনাতন গোস্বামীর নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন। গোস্বামী বলিলেন, “আমি অধম মানুষ, কি করিতে পারি? আমার ঠাকুরটির শরণাপন্ন হও, তিনি তোমায় ইহলোকে ও পরলোকে উদ্ধার করিয়া দিবেন।” তখন বণিক ঠাকুরের নিকট আসিয়া ভক্তিভরে প্রণাম পূর্ব্বক মানত করিল যে, যদি তাহার নৌকা দেবতার কৃপায় গন্তব্যস্থানে নিরাপদে পৌছে, তাহা হইলে তিনি এবার যাহা কিছু লাভ করিবেন, তাহা দিয়া মদনগোপালের মন্দির ও ভোগাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন।

পরদিন দৈবপ্রসাদে নৌকা ভাসিয়া গেল। কৃষ্ণদাস কর্পূরও সেই-বার আশাতিরিক্ত বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞামত বৃন্দাবনে আসিয়া মদনগোপালজীউর একটি সুন্দর মন্দির এবং ভোগাদির উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ‘ভক্তিরত্নাকরে’ ও ‘ভক্তমাল’ গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কর্পূরের নাম ও পুরাতন মন্দিরের বিবরণ আছে।

যে সময়ে সনাতন গোস্বামী ঠাকুটিকে লইয়া আসেন, তখন তাঁহার সহিত রাধিকা ছিল না। ইহাঁর রাধিকাও পুরীধাম হইতে আইসেন। ‘ভক্তি-রত্নাকরে’ ৬ষ্ঠ তরঙ্গে এইরূপ রাধিকা-প্রাপ্তি বিবরণ আছে—

শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা।
সে সময়ে শ্রীমতি রাধিকা নাহি ছিলা॥

ছিলেন শ্রীমদনমোহন প্রভু ঐছে।
সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা যৈছে॥
মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার।
পুরুষোত্তম জানা নাম সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
তেঁহে দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া।
যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া॥
বৃন্দাবন নিকট আইলা কতো দিনে।
শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে॥
সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন।
স্বপ্নচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন॥
পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভানে।
রাধিকা ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে॥
আশুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট শ্রীরাধিকা মোর বামেতে রাখহ॥
দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে॥

(ভক্তিরত্নাকর, ৬ষ্ঠ তরঙ্গ, ৪০৮ পৃঃ।)

পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না যে, এইরূপে দুইটি মূর্ত্তি মদন-গোপালদেবের উভয় পার্শ্ব ভূষিত করিলেন। এবং তখন হইতেই ইঁহার নাম মদনমোহন হইল। গোবিন্দজীর জন্য যে স্বতন্ত্র একটি মূর্ত্তি প্রেরিত হইয়াছিল, সে বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৫৯০ সম্বতে আষাঢ়ী শুক্লাসপ্তমী তিথিতে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে। ইহার আট মাস পরে মদনগোপাল বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি এ ঠাকুর-টুির প্রকট-বিবরণ জানিতেন না বলিয়াই মনে হয়।

এবার মন্দিরের কথা বলিব। যমুনাগর্ভ হইতে প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ 'আদিত্য টিলা' স্তূপটির উপর মদনমোহন দেবের পুরাতন মন্দির সং-



গুণানন্দ নির্ম্মিত মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির।

স্থাপিত আছে। দুইটী মন্দির পাশাপাশি সংলগ্ন, দক্ষিণ দিকের মন্দির-টীর গাত্রে বিচিত্র কারুকার্য্য করা এবং তাহা প্রস্তরফলকে আগাগোড়া আবৃত। উত্তরদিকের মন্দিরটিরও বোধ হয় সেইরূপ কারুকার্য্য ছিল,কাল-বশে পাথরগুলি খসিয়া পড়িয়া এখন ইঁট বাহির হইয়াছে। উভয়ের ভিতর দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। উত্তর মন্দিরের সম্মুখে জগমোহন ও নাট-মন্দির আছে। এইটি কৃষ্ণদাস কর্পূর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণ দিকের কারুকার্য্য-খচিত মন্দিরটি যশোরপতি প্রতাপা-দিত্যের খুড়া বসন্ত রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহার সম্মুখে জগমোহন বা নাটমন্দির নাই, হয়ত যবন-দৌরাত্ম্যে সেগুলি অদৃশ্য হইয়াছে। দুইটি মন্দির হইবার কারণ এই যে, চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতনকে তাঁহার জন্য একটি গোপনস্থান রাখিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। অপরটি মদনমোহনের জন্য। এই মন্দিরের বাম দিকে অপর একটি লাল পাথরে গাঁথা তোরণ বা ফটকের ঘর আছে। সেটি এখনও বেশ মজবুত রহি-য়াছে। পূর্ব্বে সিঁড়ি বাহিয়া ফাটকের ভিতর দিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে যাইতে হইত। এখন দক্ষিণ দিকের মন্দিরের সম্মুখ ভাগে গড়ানিয়া স্থান দিয়া লোকে উপরে আইসে। সম্মুখের মন্দিরে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের মূর্ত্তি। উত্তর দিকের মন্দিরটি খালি পড়িয়া আছে। তাহার ভিতর এখন রন্ধনাদি হয়।

এ সকল অসংলগ্ন ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরগুলি দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বে এখানে আরও কোন কোন ভবনাদি ছিল। এখন কাল-প্রভাবে বা যবন-দৌরাত্ম্যে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

নাটমন্দিরের উত্তর দিকে একটি সুগভীর ইন্দারা বা কূপ আছে। তাহার নিকটেই একটি ৫।৬ ফুট উচ্চ ইটে-গাঁথা ক্ষুদ্র ঘর। এখানকার লোকেরা বলেন, কৃষ্ণদাস কর্পূরের মন্দির-নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই এই স্থানে

ঝোপড়া বাঁধিয়া, তাহার ভিতর সনাতন গোস্বামী মদনগোপালের সেবা করিতেন। যমুনার তীর হইতে এই মন্দিরের পোস্তাটি দেখিলে অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে সেটি কেল্লার আকারে গঠিত হইয়াছিল। আজকাল কিন্তু তাহা কাল-দন্তে চর্ব্বিত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। একটা মাত্র বুরুজ এখনও অবশিষ্ট আছে। মেরামত না হইলে অচিরাৎ পোস্তাটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। 'চরিতামৃতে' এ মন্দির-নির্ম্মাণেরও কোন কথা নাই। দক্ষিণ দিকের যে মন্দিরে নিতাই চৈতন্য বিগ্রহ আছে, তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া হিন্দী ও বাঙ্গালা উভয়বিধ অক্ষরে এই শ্লোকটি খোদিত আছে।—

"হর ইব গুরুবংশ্যো যৎ পিতা রামচন্দ্রো
গুণী মনিরিব পুত্রো যস্য রাধাবসন্তঃ।
স্বকৃত সুকৃত রাশিঃ শ্রীগুণানন্দ নামা
বিদধে বিধিবদেতন্মন্দিরং নন্দসূনোঃ॥"

অর্থ—শিবতুল্য গুরুবংশীয় রামচন্দ্র যাঁহার পিতা, মণির ন্যায় গুণী রাধাবসন্ত যাহার পুত্র, যিনি নিজে অনেক পুণ্য করিয়াছেন, সেই শ্রীগুণানন্দ, নন্দনন্দনের এই মন্দির যথাবিধি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

এই গুণানন্দ কে? ইহা কৃষ্ণদাস কর্পূরের নামান্তর কি না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে এই রাধাবসন্ত নাম দেখিয়া অজ্ঞলোকে ভ্রম-ক্রমে বসন্ত রায় বলিয়া থাকে। নতুবা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের বৃন্দাবন-ধামে কোন মন্দির-নির্ম্মাণের কথা, আমরা কোথাও পাই নাই।

মন্দিরটি উচ্চে প্রায় ৬০ ফুট হইবে। উত্তর দিকের নাটমন্দিরের দ্বারে লেখা আছে "সম্বৎ ১৬৮৪ বর্ষ শ্রাবণ" (১৬২৭ খৃঃ অঃ)। আরও দুই এক স্থানে যাহা লেখা আছে, তাহা এত অস্পষ্ট, যে পড়া যায় না।

এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে একটি ছোট লাল-পাথরে-গাঁথা বাংলা-ঘরের ভিতর সনাতন গোস্বামীর সমাধি; সমীপেই সুমিষ্ট জলপূর্ণ 'সনাতন কূপ'। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সনাতন গোস্বামীর তিরোধান দিবসে, এখানে মহোৎসব হইয়া থাকে। আওরংজেবের উপদ্রবে বৃন্দাবন হইতে মদনমোহনজী প্রথমে জয়পুরে স্থানান্তরিত হন। তাহার পর জয়পুরপতি, আপন শ্যালক করৌলির রাজা গোপাল সিংহকে, সনাতন-প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্ত্তি প্রদান করেন। করৌলির রাজনির্ম্মিত মন্দিরে এখন তাঁহার সেবা চলিতেছে। করৌলির রাজারা আপনাদিগকে যদুবংশের শূরসেন-শাখার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বংশ-পরিচয় কানিং-হাম-সাহেব লিখিত Archaeological Survey of India, Vol xx, গ্রন্থে আছে।

গোস্বামীগণ কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী কালে প্রতিষ্ঠিত প্রতিভূ মদনমোহন-দেবের নূতন মন্দিরটি ৺নন্দকুমার বসু মহাশয়, ১৮২৩ খৃঃ অঃ, পুরাতন মন্দির অপেক্ষা কতকটা নিম্নভূমিতে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এ মন্দিরটি দেখিতে গোবিন্দজীর নূতন মন্দিরের মত, দালান ও সম্মুখে উঠান। দালানে রত্নসিংহাসনে, মধ্যে মদনমোহন, দক্ষিণে ললিতা, ও বামে রাধা এবং শালগ্রাম শিলা। স্বতন্ত্র আসনে অল্পদিন-প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন। পূজা ও আরতির বন্দোবস্ত এবং ভেট দিবার নিয়ম গোবিন্দদেবের ন্যায় সমভাব। এ মন্দিরেরও চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা। এ পাড়াটাকে 'পুরাণ সহর' বলে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় মদনমোহনের মালা প্রসাদ পাইয়া চরিতামৃত রচনা আরম্ভ করেন।

সনাতন গোস্বামী কখনও বৃন্দাবনে, কখনও গোবর্দ্ধনে, কখনও মহা-

বনে, কখনও রাধাকুণ্ডে থাকিতেন। এই সকল স্থানে তাঁহার কুটীর ছিল। তিনি প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রম করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন সাত ক্রোশ পরিক্রমা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তখন একজন সুন্দরকায় শিশু আসিয়া তাঁহাকে একখানি শ্রীকৃষ্ণ-পদাঙ্কিত পাথর দিয়া, এবং তাঁহাকে তাহার চতুর্দ্দিক পরিক্রম করিবার উপদেশ দিয়া, অদর্শন হইলেন। সনাতন সেই পাথরখানির চারিদিকেই শেষ জীবনে পরিক্রমা করিতেন।

ইনি বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন। এ প্রদেশের গ্রাম্য লোকদিগের সহিত বেশ মিশিতে পারিতেন। তাঁহারাও ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। একবার যে গ্রামে যাইতেন, সেখানকার লোকেরা ইঁহাকে সহজে ছাড়িতে চাহিত না। ব্রজমণ্ডলের অনেক গ্রামেই ইঁহার বৈঠক বা আবাসস্থান আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর বাল্যজীবনের কথা, ও কি সূত্রে ইহাঁরা হুসেন সাহা নবাবের কর্ম্মচারী হইয়াছিলেন, সে কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থে পাই নাই। তবে ইহাঁদের প্রথম বৈরাগ্য-সঞ্চারের এই দুইটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়।

১ম—এক বর্ষা-রজনীতে নবাবের আদেশে রূপ পাল্কি চড়িয়া জলপ্লাবিত পথ দিয়া রাজভবনে যাইতেছিলেন। পথিপার্শ্বস্থ কুটীরে একজন রজক জলের ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দ শুনিয়া, অপরগৃহে অবস্থিতা তাহার পত্নীকে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "দেখ ত আমাদের কুকুরটা বুঝি জলে পড়িয়াছে।" ধোবানী জবাব দিল "কুকুরটার কি গরজ যে, এত বাদলায় জলে নামিবে। সে ত উনান গোড়ায় গরমে শুইয়া আছে। ও কোন্ বেটা নফর (চাকুরে) মনিব বাড়ী হাজিরা দিতে যাইতেছে।" নিস্তব্ধ রজনীতে এ কথাগুলা রূপের কাণে গেল, ও মর্ম্মে আঘাত

করিল। তবে কি চাকুরে কুকুর অপেক্ষাও অধম। তিনি কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন।

২য়—সনাতন গোস্বামীর এই আখ্যানটুকু 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থে পাওয়া যায়—

একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণের বসতবাটী ইঁহাদের নিকট বন্ধক ছিল। তিনি ঋণ পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া বৃন্দাবনে রূপগোস্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। রূপ একখানা বটপত্রের গায়ে কয়টি অক্ষর মাত্র লিখিয়া গৌড়ে সনাতনের নিকট তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বটপত্রে "যরী-রলা-ইরং—নয়" এই আটটি অক্ষর মাত্র লিখিত ছিল। সনাতন এই সাঙ্কেতিক পত্র পড়িয়া একটী শ্লোক বুঝিলেন—

যদুপতেঃ ক্ক গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ক গতোত্তর-কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনস্থিরং
নসদিদং জগদিত্যবধারয় ॥

অর্থ—যদুপতির (শ্রীকৃষ্ণের) মথুরাপুরী আজি কোথায় গিয়াছে? রঘুপতি (শ্রীরামের) উত্তর-কোশলা (অযোধ্যা) আজি কোথায় গিয়াছে? ইহা ভাবিয়া মনটাকে স্থির করিও। এ জগৎ চিরস্থায়ী নহে, তাহা বুঝিও। এই শ্লোকের প্রতিচরণের আদি ও অন্ত অক্ষর লইয়া সাঙ্কেতিক পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল। এই শ্লোকটি পড়িয়া সনাতনের মনে বিষয়-বিতৃষ্ণা উদয় হইল। তিনি ব্রাহ্মণের বাটী ছাড়িয়া দিলেন। তদবধি তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল।

ঈশান-নাগর-রচিত অদ্বৈত-প্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন-গমনের বহুবৎসর পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভু তীর্থ-পর্য্যটনকালে

বৃন্দাবনে যাইয়া আদিত্যটিলার নিকটস্থ যমুনাগর্ভ হইতে মদনগোপাল বিগ্রহটীকে পাইয়া কিছুদিন একটি কুটীর মধ্যে স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। পরে ম্লেচ্ছগণের (পাঠান) উপদ্রব দেখিয়া একজন চৌবের হস্তে ঠাকুরটিকে সমর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া আইসেন। এ কথা কিন্তু ব্রজবাসীরা স্বীকার করেন না। সে যাহা হউক, মদন-গোপালজী বৃন্দাবনের প্রথম-স্থাপিত বিগ্রহ; তাহার প্রমাণ পূজনীয় বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের সেবা-প্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন-নির্ণয় গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। এই পুথিতে আরও লিখিত আছে যে, সনাতন গোস্বামী সম্বৎ ১৫৯৫ (১৫৩৮ খৃঃ) নন্দ, যশোদা, বলভদ্র ও কৃষ্ণ নামে আরও চারিটি মূর্ত্তি নন্দগ্রামে প্রকাশ করেন। মাঘী শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে তাঁহাদের অভিষেক হয়। হরিদাস নামে এক ব্যক্তি তাঁহাদের পূজারীরূপে নিযুক্ত হন।

ইনিও অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলির নাম।—১। ভাগবতামৃত, ২। সিদ্ধান্তসার, ৩। বৈষ্ণবতোষিণী ৪। লীলাস্তব। ইহা ছাড়া তিনি গোপাল ভট্টের নাম দিয়া, 'হরিভক্তি-বিলাস' নামে একখানি বৈষ্ণবগণের স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা 'হরিভক্তি-বিলাসের' মতেই দেবার্চ্চনা ও ক্রিয়া-কলাপ সমাধা করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত আরও দুই একখানি টীকা গ্রন্থ আছে। কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে তাঁহার রচিত পদাবলীও শুনিতে পাওয়া যায়। 'ভক্তকল্পদ্রুম' নামক হিন্দীগ্রন্থে দেখিতে পাই, সনাতন গোস্বামী 'সুকুমার দেহ', রূপ গোস্বামী 'স্থূলকায়'ছিলেন। বিশ্বকোষ নামক অভিধানের গ্রন্থকার বলেন, তাঁহার পূর্ব্ব নাম অমর ছিল। সেবা-প্রাকট্য গ্রন্থ মতে ইঁহার জন্ম সংবৎ ১৫৪৫ (১৪৮৮ খৃঃ অঃ)। মৃত্যু সংবৎ ১৬১৫ (১৫৫৮ খৃঃ অঃ)। গৃহস্থালীতে ২৭ বৎসর ও বৃন্দাবনে ৪৩ বৎসর বাসের

কথা লিখিত আছে। সুতরাং ইঁহার ৭০ বৎসর বয়সে আকবরের রাজত্বের ২য় বৎসরে মৃত্যু হয়। ইনি (১৫৩৩ খৃঃ অঃ) ৪৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মদনগোপাল বিগ্রহ মহাবন হইতে বৃন্দাবনে আনিয়া, সেই বৎসর মাঘমাসে শুক্লা দ্বিতীয়া দিনে আদিত্য-টিলায় বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীকে পূজারী নিযুক্ত করেন। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার তিরোধান-মহোৎসব হয়। আদিত্য-টীলায় সর্ব্বোচ্চস্থানে চৈতন্যদেবের বসিবার বৈঠক বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতর চরণচিহ্ন দিয়া, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আজিও জাগরিত রাখা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোপীনাথজী।

আমি যখন বৃন্দাবন দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন সকলেই বলিল, "মধু-পণ্ডিত গোপীনাথজীকে স্থাপনা করিয়াছেন।" কিন্তু মধুপণ্ডিত কে? তাঁহার পিতামাতার নাম কি? তিনি কোন্ দেশে বা কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তাহা গোপীনাথজীর পূজারীরা পর্য্যন্ত বলিতে পারিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া অনেক গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন সদুত্তর পাই নাই। অবশেষে ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে, ২য় তরঙ্গে, ৯৪ পৃষ্ঠায় দেখিলাম লিখিত আছে—

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিত অতি গুণের আলয়॥
দুহু প্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-কুমার।
পরম দুর্গম চেষ্টা কহে সাধ্য কার॥

বংশীবট নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয়॥
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি।
শ্রীমধু পণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী॥
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়।
শ্রীমধু পণ্ডিতে তাঁর স্নেহ অতিশয়॥

ভাগবতের ১০ম টিপ্পনীর গোড়ায় সনাতন গোস্বামী লিখিয়া গিয়াছেন যে, পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বংশীবটের নিকটস্থ যমুনা-তট হইতে গোপীনাথ বিগ্রহকে আবিষ্কার করিয়া, মধু পণ্ডিতকে ঠাকুর-সেবার অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। গোপীনাথ বিগ্রহটীকে বংশীবটের নিকটস্থ যমুনা-তীরে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি তাৎকালীন বৈষ্ণবেরা এই মূর্ত্তিটিকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মূর্ত্তি মনে করিতেন। চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণের এই শ্লোকটি হইতে তাঁহার পরিচয় পাই ঃ—

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপী গোপীনাথ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

অর্থ—শ্রীমান্, রাসলীলাপ্রবর্ত্তক, বংশীবট-তটস্থিত, বেণুনাদে গোপীগণকে আকর্ষণকারী, গোপীনাথ আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন।

প্রথমে বংশীবটের নিকটেই গোপীনাথ স্থাপিত ছিলেন; পরে রায়সিংহ মন্দির করিয়া দিলে তথায় পূজা চলিত। এখন বংশীবটে বংশীবট-বিহারী নামে স্বতন্ত্র ঠাকুর আছেন, সে কথা পরে বলিব।

ইঁহার রাধিকার প্রাপ্তি বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন বৃন্দাবন দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন—

একদিন গোপীনাথের আগে গিয়া।
রাধা গোপীনাথে দেখি রহে দাঁড়াইয়া॥
পরম কৌতুকে মনে মনে বিচারয়।
শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হৈলে ভাল হয়॥
ইহা মনে করি কারে কিছু না কহিলা।
শয়ন আরতি দেখি বাসায় আইলা॥
স্বপ্নচ্ছলে গোপীনাথ দিয়া দরশন।
শ্রীজাহ্নবা প্রতি কহে মধুর বচন॥
আমি যৈছে উচ্চ তৈছে নহে মোর প্রিয়া।
হইয়াছে কৌতুক অসদৃশ্য নিরখিয়া॥
গৌড়ে গিয়া শীঘ্র প্রিয়া-প্রকাশি পাঠাবে।
বামে বসিবেন তেঁহো ইহাও দেখিবে॥
শ্রীরাধিকা হাসিয়া জাহ্নবা প্রতি কয়।
না কর সঙ্কোচ এ ইচ্ছাও মোর হয়॥
ঐছে কত কহি দোঁহে অদর্শন হৈতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে হর্ষে চাহে চারিভিতে॥
দেখিয়া প্রকাশ নিশি উল্লাস অন্তরে।
অনুগ্রহ করি কহে নয়ন ভাস্করে॥
নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান।
করিতে হইবে একা প্রেয়সী নির্ম্মাণ॥

ঈশ্বরীর মনোবৃত্তি নয়ন জানিলা।
যৈছে নির্ম্মাণিব তাহা চিত্তে স্থির কৈলা ॥
ঈশ্বরী এ সব কথা গোপনে রাখিলা।
গোপীনাথ ইহা অন্য দ্বারে প্রকাশিল ॥

(ভক্তিরত্নাকর—১১ তরঙ্গ, ৬৭৩ পৃষ্ঠা)

এদিকেও আবার ভক্তমাল গ্রন্থে ৩য় মালায় লেখা আছে যে—

সাক্ষাতে দেখহ শ্রীল গোপীনাথ পার্শ্বে।
শ্রীজাহ্নবাজী অদ্যাপি বিরাজ করে হর্ষে ॥
তাহার বৃত্তান্ত কিছু সঙ্ক্ষেপে কহিব।
ইহা শুনি ভক্তগণে আনন্দ হইব ॥
অপ্রকট কালেতে জাহ্নবা ঠাকুরাণী।
আপনা প্রতিমা এক প্রকাশি আপনি ॥
তাহে আবির্ভাব করি কহে বৃন্দাবনে।
বসাও লইয়া গোপীনাথের আসনে ॥
আজ্ঞার প্রমাণে বৃন্দাবন লঞা গেলা।
পূজারী প্রভৃতি সবে বৃত্তান্ত শুনিলা ॥
সঙ্কোচ করিয়া পার্শ্বে বসাইতে নারে।
গোপীনাথ আদেশ করিলা সবাকারে ॥
অনঙ্গমঞ্জরী ইহ আমার প্রেয়সী।
বামেতে বসাও মনে সঙ্কোচ না বাসি ॥
প্যারীজীকে ডাইনে বসাও তাঁরে বামে।
বসাইলা সবে গোপীনাথ আজ্ঞাক্রমে ॥

আরংজেবের উপদ্রবে আদি গোপীনাথ ও তাঁহার সঙ্গিনী দুইটিকে



গোপীনাথজী

দক্ষিণে ললিতা ও রাধা, বামে জাহ্নবা (অনঙ্গমুঞ্জরী)
ও সহচরী বিশ্বেশ্বরী

জয়পুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এখন তাঁহাদের প্রতিনিধিগুলি বৃন্দাবনে স্থাপিত রহিয়াছেন। পূজারী গোস্বামীরা তাই, ৺নন্দকুমার বসু-নির্ম্মিত নূতন মন্দিরে গোপীনাথের বামপার্শ্ববর্ত্তিনী মূর্ত্তিটিকে, জাহ্নবা ঠাকুরাণী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহার পাশে সহচরী বিশ্বেশ্বরী। ঠাকুরের দক্ষিণে ছোট নারীমূর্ত্তি রাধিকা ও সখী ললিতা। স্বতন্ত্র আসনে চৈতন্যদেবের বিগ্রহও আছেন। গোপীনাথজী নিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ বলিয়া এ মন্দিরে আর তাঁহার পৃথক্ মূর্ত্তি নাই।

নূতন মন্দিরের প্রাঙ্গণটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ইঁহার পুরাতন মন্দিরটি আকবর বাদশাহের একজন মন্‌সবদার, রায় রায়সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। আইন-ই-আকবরীতে রায় রায়সিংহের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়;—রায় রায়সিংহ, রাঠোর বংশোদ্ভূত বিকানীরের অধিপতি কল্যাণমলের পুত্র। ইনি আকবরের রাজত্বের পঞ্চদশ বর্ষে, মোগল সেনাদলে প্রবিষ্ট হন। গুজরাট, সিরোহী, পঞ্জাব, বেলুচিস্থান, নাসিক প্রভৃতি নানাস্থানে যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া গুণগ্রাহী বাদশাহের অধীনে, চারি-হাজারী মন্‌সবদার হইয়াছিলেন। ইনি কিছুকাল সুরাটের শাসনকর্ত্তার কাযও করিয়াছিলেন। যখন জাহাঙ্গীর বিদ্রোহী পুত্র খস্‌রুকে দমন করিতে পঞ্জাবে গিয়াছিলেন, তখন রায় রায়সিংহের উপর বেগমগণের শিবিরের রক্ষার ভার ছিল। জাহাঙ্গীর ইঁহাকে পাঁচ-হাজারী মন্‌সবদার পদে উন্নীত করেন। ১০২১ হিজরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্রের নাম দুলপত বা কর্ণ। রায়সিংহের রাজ্যকাল ১৫৭৩—১৬৩২ খৃঃ অঃ।

রায় রায়সিংহ অম্বরপতি মানসিংহের সহকারী ও বন্ধু বলিয়া জানা গিয়াছে। একই সময়ে উভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন। গোপীনাথজীর লাল-পাথরে-গাঁথা পুরাণ মন্দিরটি, দেখিতে

বারাণসীধামের মন্দিরের ন্যায়। প্রধান শিখরের গায়ে ছোট ছোট শিখর বা চূড়ার মত গাঁথা। এখন কেবল মূল মন্দির ও জগমোহন আছে। নাট-মন্দির প্রভৃতি অপরাপর অংশ সকল যবন-দৌরাত্ম্যে ভূমিসাৎ হইয়াছে। পুরাতন ফটকটি এখনও গোপীনাথ-বাজারের রাস্তার উপর ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মন্দিরের ভিতর নিতাই-চৈতন্য-বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। এই মন্দিরগুলিও একটি ছোট-খাট স্তূপের উপর স্থাপিত। উহার চারিদিকই উচ্চ প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা, তাহার ভিতর ঘরবাড়ীও আছে। দক্ষিণদিকের নূতন ফটকটি নানা শিল্পকার্য্যে শোভিত। গোপীনাথজীর ভেট ও সেবাদি গোবিন্দজীর সেবার মত হইয়া থাকে।

আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মধু পণ্ডিতের জীবনী এ পর্য্যন্ত পাই নাই। তাঁহার সমাধিটি পুরাতন ফটকের নিকট একটি অষ্টকোণবিশিষ্ট গৃহমধ্যে স্থাপিত। সেবা-প্রাকট্য পুথিতে গোপীনাথের বা মধুপণ্ডিতের কোন বিবরণ নাই। সাধারণ বৈষ্ণব ও ব্রজবাসিগণের বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ গোবিন্দজী, মদনমোহনজী ও গোপীনাথজী এই তিনটি মূর্ত্তিকে দ্বাপর যুগের শেষে বৃন্দাবনে স্থাপন করিয়াছিলেন। পরে কাল-বশে তাঁহারা মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিলেন।

যোগ-পীঠ।—অতি অল্প দিন হইল, গোপীনাথের যোগ পীঠ নামে একটি ভূগর্ভস্থ গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৃহের সমস্তটাই মাটির ভিতরে লুক্কায়িত। ছাদটা খিলান করা, ভিতরটা উচ্চে ৮।৯ ফুট হইবে। ১৫।১৬ ইঞ্চি মাপের ১২ ধাপ সিঁড়ি নামিয়া ভিতরে যাওয়া যায়। তথায় প্রায় এক হাত উচ্চ একটি শ্বেত পাথরে অষ্টভুজা নূতন সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কুলঙ্গীর ভিতর স্থাপিত রহিয়াছেন। অপর ২।৩টা কুলঙ্গীর ভিতর গুপ্তধন রক্ষার স্থান আছে। একদিকে একটা ১॥০ দেড় হাত প্রশস্ত সুড়ঙ্গপথ

গোপীনাথজীর মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। সেটা এখন মৃত্তিকাদি পড়িয়া বন্ধ রহিয়াছে। এ গৃহটি যে অতি পুরাতন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এটি বৌদ্ধযুগের, বা রায়সিংহের সময়ে নির্ম্মিত, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নির্ণয় করিবেন। কেশীঘাটের রাস্তা দিয়া এ স্থানটায় আসা যায়। গোপী-নাথের মন্দিরের সহিত ইহার কোন সংশ্রব আছে কি না, তাহা বলিতে পারিলাম না। স্বর্গীয় বাবু যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের "তীর্থ-ভ্রমণ" নামক পুস্তকে, এই ভূগর্ভনিহিত ঘরটিকে শ্রীকৃষ্ণের লতাসাধনের গুপ্ত-গৃহ বলিয়া লিখিত আছে। বাস্তবিক এ ঘরটি রূপ ও সনাতনের সময়ের বহু পূর্ব্বে যে নির্ম্মিত, তাহা ইহার গঠন ও অবস্থান দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। মথুরায় ভূতেশ্বরের মন্দিরসংলগ্ন পাতাল-দেবীর মন্দিরটিও এইরূপ ভূগর্ভে প্রোথিত, এবং তাহাতে সুড়ঙ্গও আছে।

তাৎকালীন রূপ-সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে কে কোথায় থাকিতেন, এবার আমরা তাহার পরিচয় দিব। এই গোপীনাথের ঘেরার নিকট মধুপণ্ডিত, লোকনাথ, ভূগর্ভ, কাশীশ্বর, গোপালভট্ট ও হরিদাস-স্বামী কাছাকাছি থাকিতেন। রাধাদামোদরের মন্দিরে, রূপ ও জীব গোস্বামীর আবাস ছিল। পুরাণসহরে মদনমোহনের মন্দিরের নিকট সনাতন গোস্বামী, রঘুনাথ ভট্ট, হিত হরিবংশ,প্রবোধানন্দ, সুরদাস মদনমোহন ও থানেশ্বরী জগন্নাথ এক পাড়ায় থাকিতেন। চৈতন্যদেব বারাণসীর প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামীকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া প্রবোধানন্দ নাম দিয়াছিলেন। ইনি গোপালভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য। প্রবোধানন্দ বৃন্দাবনে আসিয়া 'চৈতন্য-চন্দ্রামৃত' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। 'বৃন্দাবন-শতক' নামে অপর এক-খানি সংস্কৃত খণ্ডকাব্য, ইঁহার রচিত বলিয়া শুনা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাধা-দামোদরজী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রূপ গোস্বামী রাধাদামোদর বিগ্রহটীকে 'স্বহস্তে নির্ম্মাণ' করিয়া, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর উপর ঠাকুর-সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধাদামোদরে।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে॥
(৪র্থ তরঙ্গ, ১৩৮ পৃঃ)

সেবা-প্রাকট্য পুথির মতে, সংবৎ ১৫৯৯ (১৫৪২ খৃঃ) মাঘী শুক্লা দশমী তিথিতে রাধা-দামোদর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। সে ঠাকুর এখন জয়পুরে গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভূ এখন বৃন্দাবনে আছেন। ইহাঁদের সহিত একাসনে বৃন্দাবনচন্দ্র নামে আর একটি যুগল বিগ্রহও স্থাপিত আছেন। ইহাঁর মন্দিরটী শৃঙ্গার-বটের নিকট ও যমুনার সন্নিকটে।

আমরা জীব গোস্বামীর পিতা বল্লভের কিছু আখ্যায়িকা দিব। চৈতন্য-দেব বল্লভকে আদর করিয়া 'অনুপম' নাম দিয়াছিলেন। ইনি রামচন্দ্রের উপাসক; রঘুনাথের প্রতি ইহাঁর এত প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে, কৃষ্ণ-উপাসক রূপ ও সনাতন গোস্বামী ইহাঁকে নানা প্ররোচনা দিয়াও কিছুতেই আপনাদের দলে আনিতে পারেন নাই। ইহাঁর একনিষ্ঠ-ভক্তির জন্যই বোধ হয় ইহাঁর নাম 'অনুপম' হইয়া থাকিবে। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" অন্ত্যলীলায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদে ইহাঁর বিবরণ আছে। রূপের

সহিত বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পথে, গঙ্গাতীরে ইহাঁর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। জীব গোস্বামী তখন অতি শিশু ; রামকেলী গ্রামে নিজ পৈত্রিক ভবনে থাকিতেন, ও তথায় প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর যৌবনারম্ভে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীবাসের ভবনে নিত্যানন্দ দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

জীব গোসাঞি গৌড় হইতে মথুরা চলিলা।
নিত্যানন্দ প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিলা॥
প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ।
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন।
আজ্ঞা দিলা শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবনে।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে॥

(চৈঃ চঃ, অঃ লীঃ, ৪র্থ পঃ)

তখন বোধ হয় চৈতন্যদেবের তিরোধান হইয়াছিল, জীব তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখেন নাই। "ভক্তিরত্নাকরে" দেখিতে পাই, জীব বারাণসীতে আসিয়া পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছু দিন বেদান্তাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পরে বৃন্দাবনধামে আসিয়া জ্যেঠতাতগণের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র-সকল পাঠ করেন। তখন ইহাঁর বয়স বোধ হয় ২৪।২৫ বৎসর হইবে। যৌবনে স্বভাবটা কিছু উদ্ধত ছিল। "ভক্তিরত্নাকরে" দেখিতে পাই, একদিন বল্লভভট্ট, রূপ গোস্বামীর সহিত, সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। জীব গোস্বামীর পিতা বাঙ্গালী বল্লভ, এবং এই দ্রাবিড় দেশীয় বল্লভভট্ট যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহা পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন। বল্লভভট্ট বা বল্লভাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমকালেই গোকুল ও মহাবনে আসিয়া বালগোপাল-সেবা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর

জীবনী আমরা পরে দিব। সে যাহা হউক, বল্লভভট্ট যখন রূপ গোস্বামীর কুটীরে আইসেন, তখন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া "ভক্তিরসামৃত" গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন। জীব তাঁহার নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতেছিল। বল্লভভট্ট আসিলে রূপ গোস্বামী তাঁহাকে সমাদরে বসাইয়া "ভক্তিরসামৃত" গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি দেখাইলেন, এবং ঐ শ্লোকগুলিতে যদি কিছু ভুল থাকে, তাহা তাঁহাকে সংশোধন করিতে অনুরোধ করিয়া, যমুনাস্নানে উঠিয়া গেলেন। জীব গোস্বামী তখন বল্লভভট্টকে চিনিতেন না; মঙ্গলাচরণ শ্লোকে কি কি দোষ আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বল্লভভট্ট যে সকল দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বলিলেন। জীব তৎক্ষণাৎ নিজ জ্যেষ্ঠতাতের রচনা সমর্থন করিয়া নানাশাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিলেন। এইরূপ কিয়ৎক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর, বল্লভভট্ট বাটী প্রত্যাগমন কালে, রূপ গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

অল্প বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে।
তাঁর পরিচয় হেতু আইলাম উল্লাসে॥
শ্রীরূপ কহেন কিবা দিব পরিচয়।
জীব নাম শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়॥

(ব্রজপরিক্রমা।—১৯০ পৃঃ)

রূপ গোস্বামী অনুভবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার যুবা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাচীন ও বিজ্ঞ বল্লভভট্টের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। জীবের ঔদ্ধত্য সহিতে না পারিয়া তিনি তাঁহাকে কুটীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

"ভক্তমাল" গ্রন্থে এই আখ্যানটুকু অন্যরূপে বর্ণিত আছে; যথা—একজন

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত রূপ গোস্বামীর সহিত তর্ক করিতে বৃন্দাবনে আইসেন। রূপ গোস্বামী কোন তর্ক, বা বাক্যব্যয় না করিয়া তাঁহাকে জয়পত্রী লিখিয়া দিলেন। জীব গোস্বামী ইহা সহিতে না পারিয়া, পথিমধ্যে দিগ্বিজয়ীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া জয়পত্রখানি ফিরাইয়া আনিলেন। রূপ গোস্বামী তাহা জানিতে পারিয়া, জীবকে কুটীর হইতে বাহির করিয়া দেন। কিছুদিন পরে সনাতনের অনুরোধে উভয়ের মিলন হয়।

এইরূপ বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, যৌবনে জীব গোস্বামীর প্রকৃতিটা কিছু উগ্র ছিল, তাই এই প্রবাদটা রটিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, জীব গোস্বামী তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতগণের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। "ভক্তকল্পদ্রুম" নামক হিন্দী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক সময়ে আকবর বাদশাহের অধীনস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ও রাজপুতানাবাসী সামন্ত রাজগণের মধ্যে বিতর্ক উঠে, গঙ্গা ও যমুনা উভয় নদীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠা? গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাজারা গঙ্গাকেই প্রধান বলিতেন, রাজপুতেরা যমুনাকেই শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। অবশেষে এ বিরোধ মীমাংসা করিবার জন্য জীব গোস্বামীকে ডাক পড়িল। ইনি বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও রাত্রি যাপন করিব না। যদি তোমরা এক দিনের মধ্যেই আগ্রা হইতে বৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করিয়া দাও, তবেই যাইতে পারি।" রাজগণ ঘোড়ার ডাক বসাইয়া এক দিনের মধ্যেই তাঁহার যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আকবরের সভায় উপস্থিত হইয়া জীব গোস্বামী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিলেন যে, "গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণামৃত, যমুনা তাঁহার প্রিয়া, সুতরাং যমুনাই শ্রেষ্ঠা।" পরিশেষে বলিলেন, এই সামান্য কথাটার জন্য তাঁহার পূজার্চ্চনাদির বিঘ্ন করিয়া তাঁহাকে আগ্রায় আনয়ন করাটা ভাল হয় নাই।—বাদশাহ ও রাজগণ ইঁহার উত্তরে প্রীত হইয়া,তিনি কিরূপ উপঢৌকন চাহেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ইনি প্রথমে পারিতোষিক লইতে অস্বীকার করিলেন।

পরে বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আমি একরকম বনমধ্যেই থাকি, এখানে শাস্ত্রগ্রন্থ সকল মেলা ভার, আপনারা যদি বারাণসীধাম হইতে শাস্ত্র ও পুরাণাদি পুথি সকল আনাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার কিছু উপকার হয়। আমি আর কিছুই চাহি না।" বলা বাহুল্য যে, রাজারা অনতিবিলম্বেই তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া দিলেন। *

জীবগোস্বামী আকুমার ব্রহ্মচারী। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ২৫ খানি গ্রন্থের নাম এই। ১। হরিনামামৃত ব্যাকরণ, ২। সূত্রমালিকা, ৩। ধাতুসংগ্রহ, ৪। কৃষ্ণার্চ্চন-দীপিকা, ৫। গোপাল-বিরুধাবলী, ৬। রসামৃত, ৭। শ্রীমাধব-মহোৎসব, ৮। শ্রীসঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষ, ৯। ভাষার্থসূচক চম্পূ, ১০। গোপাল-তাপনী টীকা, ১১। ভক্তিরসামৃত টীকা ও শ্রীউজ্জ্বল টীকা, ১৩। যোগসার স্তবকের টীকা, ১৪। অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রিভাষ্যরশ্মি, ১৫। পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন, ১৬। শ্রীরাধা-করপদস্থিত চিহ্ন, ১৭। গোপালচম্পূ, এতদ্ভিন্ন ৭ খানি সন্দর্ভ ও "অলঙ্কার-কৌস্তভ"। ভক্তিরত্নাকরে ৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সনাতন গোস্বামী ১৪৭৬ শকে (১৫৫৪ খৃঃ অঃ) "বৈষ্ণবতোষিণী" নামক টীকা রচনা করিয়া যান এবং জীবগোস্বামী ১৫০৪ শকে (১৫৮২ খৃঃ অঃ) "লঘুতোষিণী টীকা" লিখিয়াছিলেন।

রাধা-দামোদরজীর মন্দিরটী আধুনিক, বাঙ্গালা দেশের ঠাকুর-দালানের মত ; তাহাতে নয়নাভিরাম কোনরূপ শিল্পকার্য্য নাই। তবে

---

* শুনা যায় যে, সে সময়ে বৃন্দাবনে বটপত্র, তালপত্র ও ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি বৃক্ষাদির পত্রেই গ্রন্থ সকল লিখিত হইত, জীব গোস্বামী প্রথমে আগ্রা হইতে কাগজ আনাইয়া তাহাতে পুঁথি লিখিবার প্রথা আরম্ভ করেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর সুরম্য পুরাতন মন্দির নির্ম্মাণ, রূপগোস্বামীর সময় আরম্ভ হইয়া, ইঁহার তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিকভাবে দেখিবার ২।১টী দ্রব্য আছে।, মন্দিরের উত্তরদিকের প্রাঙ্গণে রূপ গোস্বামী বৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে বাংলা গৃহের ভিতর চিরনিদ্রায় শয়ান। তাঁহার ভজন-কুটীরও ইহার অপরদিকে রহিয়াছে। * মন্দির-সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের প্রাঙ্গণে, একটি গৃহের ভিতর জীবগোস্বামীর "সমাজ", তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র গৃহে "চরিতামৃত"-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ভূগর্ভ পণ্ডিতের "সমাজ" আছে। কবিরাজ মহাশয়ের জীবনী রাধাকুণ্ড প্রবন্ধে দিব।

সনাতন গোস্বামী প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে সাত ক্রোশ পরিক্রমা করিতে অশক্ত হইলে, একজন ব্রজবাসী বালক আসিয়া তাঁহাকে একখানি প্রায় ১॥০ হস্ত লম্বা বটপত্রাকৃতি কৃষ্ণ-বর্ণের পাথর দিয়া যান। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ও গোক্ষুরের চিহ্ন এবং পতাকা বসাইবার একটি ছিদ্র ছিল। ব্রজবালক সনাতনকে বলিয়া গেলেন যে, এই শিলার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমা করিলেই তাঁহার গোবর্দ্ধন-পরিক্রমার ফল হইবে। সেই পাথরখানি জীব গোস্বামী, সনাতনের তিরোধানের পর, এই মন্দিরে রাখিয়া পূজা করিতেন। সে পাথরখানি অদ্যাপি এখানে আছে। কেহ দেখিতে চাহিলে ১।০ একটাকা চারি আনা পৃথক্ দর্শনী দিতে হয়।

দীর্ঘকালব্যাপী গৃহ-কলহে এই দেবালয়টীর আয় অনেক কমিয়া গিয়াছে। নানা স্থান সংস্কারাভাবে পতনোন্মুখ। আমি শুনিয়াছিলাম, এই দেবালয়ের একখানি গৃহে, শেষ গোস্বামী জীবের তত্ত্বাবধানে রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, কৃষ্ণদাস প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের স্বহস্ত-লিখিত পুথিগুলি থাকিত।

* বনমালী গোস্বামী মহাশয়ের "সেবাপ্রাকট্য" পুথিতে লিখিত আছে যে, রূপ-গোস্বামীর সংবৎ ১৫৫০ (খৃ ১৪৯৩) জন্ম, গৃহস্থাশ্রম বাস ২২ বৎসর, বৃন্দাবনবাস ৫৩ বৎসর, ইষ্টলাভ সংবৎ ১৬২৫ (খৃ ১৫৬৮)। সুতরাং তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল।



দক্ষিণ দিকের গৃহে জীবগোস্বামী ও বামদিকে কৃষ্ণদাস ও ভূগর্ভ সমাহিত আছেন ; সম্মুখে অন্যান্য মোহান্তের সমাধি।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের জন্য, আমি ঐ সকল মহাত্মার হস্তাক্ষর সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম। পূর্ব্বে শুনিতাম, গ্রন্থগুলি মোকর্দ্দমার সময় একখানি গৃহমধ্যে তালা বন্ধ ছিল। এবার, ১৯১৬ খৃঃ অঃ চৈত্র মাসে বৃন্দাবনে গিয়া তথাকার অধুনাতন গোস্বামী প্রভুর নিকট শুনিলাম যে, দীর্ঘকালব্যাপী মোকর্দ্দমার সময়ে অপরাপর অস্থাবর সম্পত্তির সহিত সে গ্রন্থগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। আমার বহুদিনের আশা নিষ্ফল হইল।

এই মন্দিরে অবস্থিত বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুরটি, কে এবং কতদিন হইল স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাও কেহ জানেন না। পণ্ডিত বনমালী লাল গোস্বামীর নিকট 'সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন নির্ণয়' নামক সূচক পুথিতে লিখিত আছে যে, জীব গোস্বামীর জন্ম সম্বৎ ১৫৮০ (১৫২৩ খৃঃ অঃ), গৃহস্থাশ্রমবাস ২৪ বৎসর, বৃন্দাবনবাস ৬১ বৎসর, সিদ্ধিলাভ (মৃত্যু) সম্বৎ ১৬৬৫ (১৬০৮ খৃঃ অঃ)—সুতরাং তাঁহার বয়স ৮৪ বৎসর হইয়াছিল।*

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাধারমণজী।

এই মূর্ত্তিটি অতি ক্ষুদ্রকায়, দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গোদাবরীতীরস্থ শ্রীরঙ্গপত্তনে, বেঙ্কটভট্ট নামে একজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। ইহাঁরা তিন সহোদর—বেঙ্কটভট্ট, ত্রিমল্লভট্ট ও প্রকাশানন্দ। চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ দেশে তীর্থ ভ্রমণ করিতে

* প্রতি বৎসর পৌষমাসে শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে জীব গোস্বামীর তিরোধান মহোৎসব হইয়া থাকে।

গিয়াছিলেন, তখন ইহাঁর বাটীতে চারিমাস কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বেঙ্কটভট্ট শ্রীবৈষ্ণব অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণজীর উপাসক। তাঁহার ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া চৈতন্যদেব সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত লক্ষ্মীদেবীর ও রাধাঠাকুরাণীর প্রসঙ্গ লইয়া অনেক আলোচনা এবং আমোদ হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার একাদশ বর্ষীয় বালক গোপালভট্ট, চৈতন্যদেবের নিকট গোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেব এই বালককে অতিশয় স্নেহ ও আদর করিতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর গোপাল পুরীধামে চৈতন্যদেবের নিকট আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। গোপাল ভট্ট আজীবন বিবাহ করেন নাই। চৈতন্যদেব তাঁহাকে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিবার আদেশ দিলেন।

তথায় আসিবার পূর্ব্বে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া গণ্ডকী নদী হইতে একটি শালগ্রাম শিলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে সেইটিকে পূজা করিতেন।

এক সময়ে তাঁহার একজন ধনীভক্ত আসিয়া দেবতার উদ্দেশে কতক-গুলি অলঙ্কার উপহার দিয়া যান। ভট্টজী এইগুলি পাইয়া মনে মনে খেদ করিলেন, "যদি আমার শালগ্রাম ঠাকুরটির হস্তপদ থাকিত, তাহা হইলে আমি এই অলঙ্কারগুলি তাঁহাকে পরাইয়া সুশোভিত করিতে পারিতাম।" ভক্তবৎসল ঠাকুরটি তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার জন্য পরদিন বর্ত্তমান ত্রিভঙ্গ মুরলীধর মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন। ভট্টজীও আনন্দিত মনে অলঙ্কারগুলি শ্রীঅঙ্গে পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এখানকার পূজারীরা বলেন, ইহাঁর অঙ্গে আজিও পূর্ব্বশালগ্রামের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। পূজারী ভিন্ন অপর কাহারও তাহা দেখিবার অধিকার নাই।

চৈতন্যদেব তিরোধান কালে, গোপাল ভট্টকে একখানি প্রসাদী বস্ত্র বা কৌপীন এবং তাঁহার নিজের বসিবার পট্টা (পিঁড়া) পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এ মন্দিরের পূজারীরা বলেন, চৈতন্যদেব তাঁহার পুত্রতুল্য শিষ্য গোপালভট্টকে, ইঙ্গিতে তাঁহার গদ্দির (গাদি বা সম্প্রদায়ের) অধিকার দিয়া গিয়াছিলেন। প্রায় একহস্ত পরিমিত কৃষ্ণকাষ্ঠের সেই পিঁড়াখানির আজিও এই মন্দিরে অতি ভক্তি সহকারে পূজা হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্য্য এই গোপাল ভট্টেরই শিষ্য। শ্রীনিবাস আচার্য্য, বৃন্দাবন হইতে প্রথমে বঙ্গদেশে গোস্বামিগণের রচিত ভক্তিগ্রন্থ সকল আনয়ন করেন, ও এদেশে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তিপূজা বহুলরূপে প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহার পিতা গঙ্গাধর চক্রবর্ত্তী, ইনি চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া চৈতন্যদাস নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর নাম লক্ষীপ্রিয়া। ইনি ইঁহাদের পৈত্রিক ভবন চাখন্দী হইতে উঠিয়া আসিয়া গঙ্গাতীরে জাজীগ্রামে মাতুলালয়ে বাস করেন। কাটোয়া-বর্দ্ধমান লাইট-রেলওয়ের পার্শ্বেই জাজীগ্রাম অবস্থিত। কাটোয়া ষ্টেশন হইতে ১॥ মাইল দূরে শ্রীনিবাস আচার্য্যের পাটবাড়ী এখন ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে।

শ্রীনিবাস কিশোর বয়সে পিতার মুখে চৈতন্যদেবেব মাহাত্ম্য শুনিতেন। ইনি যৌবনারম্ভে পুরীধামে চৈতন্যদেবকে দেখিতে যাইতেছিলেন, পরে তাঁহার অপ্রকটবার্ত্তা শুনিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার কিছুদিন পরে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোধান হয়। শ্রীনিবাস যখন নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন তথায় চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া, এবং তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণের মধ্যে গদাধর পণ্ডিত, মুরারি গুপ্ত, শ্রীবাস, দামোদর, সঞ্জয়, বিজয়, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী এই কয়েকজন মাত্র

জীবিত ছিলেন। অপর সকলেই তিরোহিত হইয়াছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আধ সের চাউল দিয়াছিলেন। ইনি তদ্দ্বারা দশজন বৈষ্ণব ও নিজে খাইয়া শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া খানাকুলে অভিরাম ঠাকুরের নিকট আইসেন। অভিরাম ঠাকুরের পত্নীর নাম মালিনী। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই খানাকুলের গোপীনাথ-বিগ্রহ বঙ্গদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষ-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ-মূর্ত্তিটিকেও কেহ কেহ বাঙ্গালার প্রথম কৃষ্ণমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। প্রবাদ এইরূপ যে, এ দুইটি চৈতন্যদেবের সমকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক "প্রেমবিলাস" লেখক নিত্যানন্দ দাস বলেন, অভিরাম স্বামী তিন চাবুক মারিয়া শ্রীনিবাসকে প্রেমদান করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

ইনি অগ্রহায়ণ মাসে যাত্রা করিয়া এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতিথিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। সেদিন গোপাল ভট্টের বাড়ীতে রাধারমণের সিংহাসনযাত্রা বা বাৎসরিক প্রতিষ্ঠা মহোৎসব হইতেছিল। দ্বিতীয়ার দিন গোপালভট্ট, শ্রীনিবাসকে দীক্ষাদান করিলেন। সে সময়ে তথায় রঘুনাথ ভট্ট, সনাতন ও রূপ লোকান্তরিত। রঘুনাথ দাস বৃদ্ধবয়সে শয্যাশায়ী। জীবগোস্বামী, লোকনাথ, ভূগর্ভ পণ্ডিত এবং রাঘব গোস্বামী তখনও জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সহিতও ইঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই বৃন্দাবনেই শ্রীনিবাসের সহিত নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দের প্রথম পরিচয় ও সখ্য হয়।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুরা, বঙ্গদেশে চৈতন্য-দেব-প্রবর্ত্তিত নবীন মতে, প্রেমভক্তিভাবে (মধুর বা সখী ভাবে) রাধাকৃষ্ণের

পূজা প্রবর্ত্তন করিয়া আসিতেছিলেন। চৈতন্যদেব স্বয়ং, তাঁহার প্রিয় পার্ষদগণকে লইয়া পুরীধামে থাকিয়া, রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পুত্র পুরুষোত্তম জানাকে এবং রাজসভাসদ্ ও প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে নিজ মতে দীক্ষা দিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের তিনজনের তিরোধান হওয়াতে বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায়, বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকের অভাব হইল। অধিকন্তু রূপ, সনাতন ও জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণ ভাগবতের ভক্তিপথানুগামিনী ও কান্তরসপোষিণী যে সকল টীকা করিয়াছিলেন এবং রাধাকৃষ্ণ-লীলার বর্ণনাত্মক যে সকল নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন, সেগুলি বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেইজন্য গোস্বামীপাদেরা শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ গোস্বামীকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া, তাঁহাদিগকে নবীন প্রেমভক্তির মত ও রাধাকৃষ্ণ পূজা পদ্ধতি কয়েক বৎসর ধরিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আজকাল যেমন বৃটিশরাজের সুশাসন ও শান্তিময় সময়ে, Archæological Society এবং বহু অনুসন্ধান-সমিতির প্রযত্নে, কত শত প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনা সকল আবিষ্কৃত হইতেছে; সেইরূপ পাঠানগণের উপদ্রবময় রাজত্বের অবসানে ও মহামনা উদারচরিত আকবর বাদশাহের সুদীর্ঘ শান্তিময় শাসনকালে, রূপ, সনাতন, লোকনাথ, গোপাল ভট্ট-প্রমুখ গোস্বামিপাদেরা, ভাগবত ও পুরাণাদি গ্রন্থসকলের সহিত মিলাইয়া এবং স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমণ্ডলের কোন্ কোন্ বনে (গ্রামে বা স্থানে) কি কি লীলা করিয়াছিলেন, তাহা যথাসম্ভব নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। সে সময় রাঘব গোস্বামী নামে একজন দ্রাবিড় বৈষ্ণব গোবর্দ্ধনের গুহায় বাস করিতেন, তিনিও ইঁহাদের সহকারী ছিলেন। জীবগোস্বামীর আদেশে

রাঘব গোস্বামী, শ্রীনিবাস ও নরোত্তমকে লইয়া, তাঁহাদের আবিষ্কৃত সেই সকল লীলাস্থানগুলি দেখাইয়া আনিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীনিবাসের শিষ্য—নরহরি চক্রবর্ত্তী, গুরুমুখে তাঁহাদের সেই ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া 'ব্রজপরিক্রমা' নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে গ্রন্থখানি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে মুদ্রিত হইয়াছে। সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু বলেন, "ম্যান্ডিভাইলের অঙ্কিত জেরুজেলেম এবং হিউএন্ সঙ্গ্ এর অঙ্কিত কুশীনগর অপেক্ষাও নরহরির হস্তে অঙ্কিত নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছে।"

গোপালভট্ট নিজে বিশ্বমঙ্গল-বিরচিত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামী উভয়ে মিলিয়া হরিভক্তিবিলাস নামে একখানি স্মৃতিগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহাতে নবীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের রাধাকৃষ্ণের পূজাপদ্ধতি, ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী বিবৃত আছে। বৃন্দাবনস্থ গোস্বামিগণ শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসকল বঙ্গদেশে ও উড়িষ্যায় পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। জীবগোস্বামী মথুরার একজন মহাজনের নিকট হইতে দুইখানি শকট, দুইজন গাড়োয়ান ও চারিটি বলদ আনাইলেন। গ্রন্থগুলি শকটে রাখিয়া তাহার উপর উত্তমরূপে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া ১০ জন অস্ত্রধারী রক্ষীকে সঙ্গে দিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে রাজপত্র বা ছাড় পত্র (Passport) আনিতে হইয়াছিল। এ সময়ে সেরশাহা-নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ রাজপথ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

তাঁহারা গ্রন্থ লইয়া সেই পথ অবলম্বন করিয়া, বিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌঁছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের অনুচরেরা, রাত্রিকালে শকটে ধনরত্নাদি আছে বিবেচনা করিয়া শকট-দুইখানি অপহরণ করিয়া লইল। শ্রীনিবাস উন্মত্তের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া

জানিতে পারিলেন যে,রাজার ইঙ্গিতেই এই বিষম কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে। রাজা যখন ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন, তিনি তখন তথায় অপরিচিত বেশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে নূতন ভাবে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনাইয়া প্রীত করিয়া গ্রন্থগুলি ফিরিয়া পাইলেন। রাজাও তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও প্রেম-ভক্তির মাধুর্য্য বুঝিয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। শ্রীনিবাসের অধ্যক্ষতায় বিষ্ণুপুরে কালাচাঁদ নামে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপিত হইল। পদ্মাবতী-তীরে খেতরী গ্রামে, নরোত্তম ঠাকুরের বাটীতে, একদিনে পাঁচটি রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ও একটি চৈতন্য-বিগ্রহ, শ্রীনিবাসের তত্ত্বাবধানে স্থাপিত হইয়াছিল। এই খেতরী-মহোৎসবে সমগ্র বঙ্গীয় বৈষ্ণবমণ্ডলী সমবেত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতে 'গড়ের হাটে নরোত্তম, রাঢ়ে শ্রীনিবাস' ও উড়িষ্যায় শ্যামানন্দ, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। জীবগোস্বামী শ্রীনিবাসকে আচার্য্য, নরোত্তমকে ঠাকুর ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্যামানন্দ উপাধি দিয়াছিলেন। এখন হইতে বৈষ্ণবেরা বঙ্গদেশের নানা স্থানে, রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কঠোর নিয়মাবলী শিথিল হইয়া বিলাসিতায় পরিণত হইতে লাগিল। গোপালভট্ট শ্রীনিবাস আচার্য্যকে আদৌ বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি ইনি, গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া, দুইবার বিবাহ করেন। ইঁহার দুই পত্নীর নাম দ্রৌপদী ও গৌরাঙ্গপ্রিয়া। শ্রীনিবাস বিষ্ণুপুরের রাজার নিকট, বিপুল বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া কিছু ভোগ-বিলাসী হইয়া পড়িলেন। প্রথমা স্ত্রী বর্ত্তমানেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন। 'প্রেমবিলাসে' দেখিতে পাই, যখন এই বিবরণটি তাঁহার গুরু গোপাল ভট্টের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি 'স্খলৎ' 'স্খলৎ' বলিয়া বারবার আক্ষেপ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস-আচার্য্য-বংশীয়গণের গৃহে রক্ষিত জীর্ণ পুথিতে লিখিত আছে যে, ১৪৪১

শকে (১৫১৯ খৃঃ অঃ) বৈশাখীপূর্ণিমাতিথিতে, চাখুন্দীগ্রামে, শ্রীনিবাসের জন্ম, ১৬ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন-গমন ও ১৬০৩ খৃঃ অঃ ৮৪ বৎসর বয়সে তিরোধান হইয়াছিল। কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমীতে মহোৎসব হয়। বৃন্দাবনে পাথরপুরা মহল্লায় ঈশ্বরীকুঞ্জে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমাধি আছে এবং তাঁহার কন্যা হেমলতা দেবীর সমাধি, ধীরসমীরের নিকটে অবস্থিত। শ্রীনিবাস গীতামৃত নামে একখানি পদগ্রন্থ লিখিয়াছেন।

এখন আবার রাধারমণের মন্দিরের কথা বলিব। মন্দিরটি তত বড় নয়, বাঙ্গালা দেশের দালানের মত। এই মন্দিরের ফটক ও অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু শিল্পকার্য্যের সমাবেশ আছে। কোথাও ভাঙ্গাচুরা নাই। এ নূতন মন্দিরটি লক্ষ্মৌ-নিবাসী সাহ্-কুন্দন ও তাঁহার ভ্রাতার ব্যয়ে নির্ম্মিত।

পণ্ডিতবর বনমালীলাল গোস্বামীর নিকট "সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্ট-লাভের দিন নির্ণয়" নামক যে সূচক গ্রন্থ আছে * তাহা হইতে জানিতে পারি যে, সম্বৎ ১৫৯৯ অব্দে (১৫৪২ খৃঃ অঃ) গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শালগ্রাম শিলা হইতে রাধারমণ বিগ্রহ প্রকট হইলে সেই বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পণ্ডিতবর মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বিরচিত 'রাধারমণ প্রাকট্য' নামক হিন্দী-মুদ্রিত পুস্তকে দেখিলাম, ১৫৫৭ সম্বতে (১৫০০ খৃঃ অঃ)

* আমি বৃন্দাবন-কথার অনেক বিবরণ পূজনীয় বনমালীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চির-কৃতজ্ঞ। এই সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিন-নির্ণয় নামক পুথি দেখিয়া ব্রজবাসীরা সিংহাসন যাত্রা (প্রতিষ্ঠা) এবং আবির্ভাব ও তিরোভাব মহোৎসব করিয়া থাকেন। প্রায় চারিশত বৎসর যাবৎ এই তিন পাতা মাত্র পুথিখানি অতি যত্নের সহিত ইঁহাদের গৃহে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক সময় নির্ণয়ে অনেকটা আলোকপাত হয়।

গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। ১৫৬৮ সম্বতে (১৫১১ খৃঃ অঃ) একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চৈতন্য দেবের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ, ১৫৮৮ সম্বতে (১৫৩১ খৃঃ অঃ) ৩১ বৎসর বয়স কালে বৃন্দাবনে আগমন এবং ১৬৪২ সম্বতে (১৫৮৫ খৃঃ অঃ) ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার ইষ্টলাভ বা মৃত্যু হয়।

গোপাল ভট্ট তীর্থ-ভ্রমণকালে, হরিদ্বারের নিকটস্থ দেববননিবাসী গোপীনাথ দাস নামক একজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকে, মন্ত্রদীক্ষা দিয়া সঙ্গে লইয়া আইসেন। অন্তিমকালে তাঁহারই হস্তে রাধারমণ-ঠাকুরের সেবার ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। গোপীনাথ দাস বিবাহ করেন নাই, তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। তিনি মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর-দাসকে পূজার ভার দিয়া গেলেন। দামোদর লোকান্তর গমনকালে, তাঁহার তিন পুত্রকে ডাকিয়া, তাঁহাদের নিজ বংশাবলীর দ্বারা স্বহস্তে ঠাকুর পূজা করিবার প্রতিজ্ঞা করাইয়া, পরলোকে গমন করেন। সেই প্রতিজ্ঞামত আজিও তাঁহাদের বংশীয় গোস্বামী ভিন্ন, অপর কোন বেতনভোগী পূজারীর, রাধারমণের সেবার অধিকার নাই। এখানে অতি বিশুদ্ধভাবে দামোদর-বংশীয়েরাই স্বহস্তে সেবা, এমন কি ভোগ রন্ধন পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

বৃন্দাবনে ইঁহাদের বংশের জ্ঞান ও বিদ্যার সবিশেষ খ্যাতি আছে। পণ্ডিতবর মধুসূদন সার্ব্বভৌম, বনমালীলাল গোস্বামী ও দার্শনিক পণ্ডিত দামোদর গোস্বামীর নাম অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ইঁহাদের গৃহে অনেক পাঠার্থী আসিয়া বিদ্যালাভ করিয়া থাকেন। প্রাচীন গোস্বামীগণের রচিত, অধুনা-দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসকল ইঁহাদের গৃহে আছে। গোপাল ভট্ট, চৈতন্যদেবের নিকট, গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। রাধারমণ ঠাকুরটী বালগোপাল-মূর্ত্তি কি না, বলিতে পারিলাম না। কিন্তু ইঁহার সহিত কোন রাধামূর্ত্তি নাই। ইঁহার বামদিকে সিংহাসনোপরি



শ্রীরাধারমণজী

একটি রজত-মুকুট স্থাপন করিয়া শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে সেবা চলে। এইরূপ হইবার কারণ কি, ঠিক বলিতে পারিলাম না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সকলেরই বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার রূপে আবৃত হইয়া, চৈতন্যদেবরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পার্ষদ ও ভক্তগণেরা দ্বাপর যুগের ব্রজলীলার সখা ও সখী। অদ্বৈত প্রভু শঙ্কর বা মহাদেব, নিত্যানন্দ প্রভু বলদেব, বৃন্দাবনের ছয়জন প্রধান গোস্বামী, ছয়জন সখী, যথা—রূপগোস্বামী—রূপমুঞ্জরী, সনাতনগোস্বামী—লবঙ্গমুঞ্জরী, জীবগোস্বামী—বিলাসমুঞ্জরী, রঘুনাথ-ভট্ট—রতিমুঞ্জরী, রঘুনাথ দাস—রসমুঞ্জরী ও গোপালভট্ট—গুণমুঞ্জরী। ইহাঁদের সকলেই আপনাকে রাধার সখীভাবে ভাবিত করিয়া তাম্বুল, চামর, মাল্যাদি দ্বারা সেবা করিতেন। ইঁহাদের সাধন-প্রণালীর একটা উদাহরণ দিব,—শ্রীনিবাসতনয়া হেমলতা দেবীর শিষ্য যদুনন্দন দাস-বিরচিত 'কর্ণানন্দ' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, এক-দিন শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়, বঙ্গদেশে নিজ গৃহে পূজা করিতে বসিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়েন। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে চেতনা লাভ করিলে, তিনি বলেন যে, তাঁহার আত্মা বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিল, তথায় জলক্রীড়া-কালে যমুনা-লহরী মধ্যে, শ্রীরাধার কর্ণের মণিময় কুণ্ডল পড়িয়া গিয়াছিল। শ্রীরাধা তাঁহার প্রিয়সখী গুণমঞ্জরীকে (গোপাল ভট্টকে) খুঁজিয়া আনিবার ইঙ্গিত করেন। গুণমঞ্জরী তাঁহার প্রিয় শিষ্যা মণিমঞ্জরীকে (শ্রীনিবাস আচার্য্যকে) সেই কুণ্ডল তুলিয়া আনিতে আদেশ করিলে, শ্রীনিবাস আচার্য্য বহুক্ষণ জল মধ্যে অন্বেষণ করিয়া, সেই কুণ্ডলটি লইয়া গোপাল ভট্টের হস্তে দিয়া, শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছেন। এই জলমধ্যে কুণ্ডল-অন্বেষণ-কালেই তিনি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাঁহারা এ বিষয় জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়-প্রণীত

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায় নামক পুস্তকে ‘সখী-ভাবক’ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন।

আমি একদিন, মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, পুরুষ হইয়া এইরূপ নারী ভাবে সেবা করিবার তাৎপর্য্য কি? তিনি উত্তর দিলেন, “হিন্দু-রমণীরা বাল্যকালে পিতৃগৃহে অবস্থান করে; বিবাহের পর যখন স্বামীগৃহে আইসেন, তখন পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন, সকলকে, এমন কি জন্মভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া শ্বশুর-কুলের, বিশেষতঃ স্বামীর সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এরূপ ত্যাগস্বীকার ও ভক্তিনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা নারী ভিন্ন পুরুষে সম্ভবে না। সেইজন্যই আমাদের সম্প্রদায়ে ভগবানের সেবা রমণীহৃদয় লইয়া করিতে হয়। এরূপ সতী-রমণীগণের ন্যায় মাখামাখি অথচ আত্মহারা ভাব জগতে অন্য কোন জীবে সম্ভবে কি?” ইহার পর তিনি তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব সাধনার পার্থক্য বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার অবিকল কথাগুলি আমি লিখিয়া আনিয়াছিলাম; তাহা এই—“তান্ত্রিক সাধকেরা পরতত্ত্বকে (পরম-পুরুষকে) স্ত্রী বা প্রকৃতি ভাবিয়া আপনাকে পুরুষ ভাবনা করেন। ইহাতে তাঁহারা নিজেকে ভোক্তা ও পরতত্ত্বকে ভোগ্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ নিজেকে প্রকৃতি ভাবনা করিয়া পরতত্ত্বকে (পরম-পুরুষকে) পুরুষ বিবেচনা করিয়া সাধনা করেন, ইহাতে জীব ভোগ্য, এবং পরতত্ত্ব ভোক্তা হইয়া যান। ইহাতেই গীতায় ‘অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ’ বচনের সহিত ঐক্য হয়। সুতরাং ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত মত। পূর্ব্ব তান্ত্রিক মতে, ভোক্তাকে ভোগ্য করিয়া ফেলা হয় বলিয়া, ‘ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাত্মং চ্যবন্তি তে’ সুতরাং তত্ত্ববিরুদ্ধ সাধন হেতু তাঁহারা পতিত হইয়া যান।” আমরা আর অধিক বলিব না। এইখানেই প্রবন্ধ শেষ করিলাম। তাঁহার

মুখেই শুনিয়াছি, রাসপঞ্চাধ্যায়ের "হা নাথ রমণপ্রেষ্ঠ" শ্লোকাংশ হইতে 'রাধারমণ' নামের উৎপত্তি। দেবমন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে গোপালভট্টের সমাধি আছে। শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে মহোৎসব হয়।

ব্রজবাসীরা বলেন, কেবল রাধারমণ, রাধাবল্লভ ও হরিদাস স্বামীর বাঁকেবিহারী ঠাকুর ভিন্ন, অপর সকল ঠাকুরই বৃন্দাবন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। ম্লেচ্ছগণের উপদ্রবকালে, পূজারীরা অতি গুপ্তভাবে এই তিনটী ঠাকুরকে রক্ষা করিয়া পূজা করিতেন। সেই জন্য ইহাঁরা অন্যত্র যান নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাধাবিনোদ ও গোকুলানন্দ।

রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস গোস্বামী।

যশোহর তালগড়ি-নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর একমাত্র পুত্রের নাম লোকনাথ। পদ্মনাভ, অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন, ইহাঁর পত্নীর নাম সীতা। লোকনাথ ইহাঁদের বৃদ্ধ বয়সের সন্তান। তিনি শৈশবকাল হইতেই বিষয়-কর্ম্মে নিস্পৃহ ও উদাসীন ছিলেন। ইনি অদ্বৈতপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছুকাল চৈতন্যদেবের সঙ্গে একত্রে, বেদ-বেদান্তাদি দার্শনিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। ইনি ওমরাও গ্রামের নিকট ছত্রবনে থাকিতেন। তথাকার কিশোরী কুণ্ড হইতে রাধাবিনোদ-ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "ব্রজপরিক্রমায়" লেখা আছে :—

দেখি এ অপূর্ব্ব বন মহা হর্ষ মনে।
লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে ॥
যে বৈরাগ্য তাঁর তা কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধাবিনোদ কৃপা কৈলা এই ঠাঁই ॥
ফল মূল শাক অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥
বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতি জীর্ণ বহির্ব্বাস ॥
আপনি হইয়া সিক্ত অতিবৃষ্টি নীরে।
ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে ॥
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বৃক্ষে অতি উল্লাসিত হিয়া ॥
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ।
হইয়া ব্যাকুল হেথা করিত ক্রন্দন ॥

(ব্রজপরিক্রমা, ১৫১ পৃষ্ঠা)

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই, লোকনাথ ১৪৩২ শকে বা ইংরাজী ১৫১০ সালে বৃন্দাবনে আইসেন। ব্রজপরিক্রমাতেও আছে যে, তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি কিছুদিন গোবিন্দজীর পূজারীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ভূগর্ভ পণ্ডিতের সহিত ইঁহার বড় সৌহার্দ্দ হইয়াছিল। উভয়েই একত্র থাকিতেন। রূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট প্রভৃতি গোস্বামীগণের অনুরোধে, ইনি রাধাবিনোদ ঠাকুরটিকে লইয়া আসিয়া, বৃন্দাবনে রাধারমণের বাটীর সন্নিকটে একটি মন্দিরে স্থাপন করেন। ইনি অতি কঠোর ব্রত-পরায়ণ ছিলেন।

বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণলীলার মঞ্জুলালি সখী বলিয়া বর্ণন করেন। নরোত্তম ঠাকুরের অনেক গীতে এই নামের উল্লেখ আছে। গোপাল ভট্ট ও লোকনাথ উভয়েই দৈন্য দেখাইয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজকে, "চৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে, তাঁহাদের জীবনী লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাই ইঁহাদের কোনরূপ জীবনী চরিতামৃতে নাই। কেবল নাম মাত্র আছে।

ধনী-সন্তান নরোত্তম ঠাকুর যখন বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তখন ইনি তাঁহাকে রাজপুত্র জানিয়া দীক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। "প্রেমবিলাসে" লিখিত আছে, নরোত্তম লোক নাথের মলমূত্র পর্য্যন্ত পরিষ্কার করিয়া নিজ দৈন্য দেখাইয়া, ইঁহার নিকট শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের রচিত প্রার্থনা-সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার বিষয়ে দুই একটা কথা বলিল।

পদ্মাবতী-তীরে রামপুর বোয়ালিয়ার হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থবংশীয় জমিদার, পুরুষোত্তম দত্ত ও কৃষ্ণানন্দ দত্ত নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। পুরুষোত্তম দত্তের পুত্রের নাম সন্তোষ দত্ত। কৃষ্ণানন্দের পুত্র নরোত্তম দত্ত, মাতার নাম নারায়ণী। অনুমান ১৪৫৪ শকে (১৫৩২ খৃঃ অঃ) ইঁহার জন্ম। নরোত্তম বাল্যকাল হইতে সংসার-ত্যাগী; ইনি বিবাহ পর্য্যন্ত করেন নাই। রাজপুত্র হইয়াও ভোগবিলাসে বিমুখ ছিলেন। ইনি বাল্যকালে গৌরাঙ্গপ্রভুর মহাত্ম্য শুনিয়া,তাঁহার চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। একদিন প্রাতে পদ্মানদীতে স্নানান্তর উঠিয়া গৌর-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তদবধি কখন হাসিতেন, কখন রোদন করিতেন। কখন বা বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িতেন। পিতামাতা ইঁহাকে গৃহে

রাখিতে অশেষ যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহাদের অগোচরে পলাইয়া বৃন্দাবন গমন করেন। নানা তীর্থ দর্শন করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে আসিয়া লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্য হইলেন। বৃন্দাবনে তাঁহার সহিত শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দ ঠাকুরের অতিশয় বন্ধুত্ব হয়। বৃন্দাবন হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্যামানন্দের সহিত একত্রে বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ চুরি যাইলে ইনি ও শ্যামানন্দ, দুঃখিত চিত্তে স্বদেশে চলিয়া যান। শ্রীনিবাস কেবল একাই অনুসন্ধান করিয়া সে গ্রন্থগুলি উদ্ধার করেন।

নরোত্তমের অনুরোধে "সঙ্গীতমাধব নাটক" রচয়িতা রাজা সন্তোষ দত্ত খেতরী গ্রামে মহাসমারোহে পাঁচটি রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি ও একটি চৈতন্য বিগ্রহ স্থাপিত করেন। সেগুলির নাম—

গৌরাঙ্গ, বল্লবী-কান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন।
রাধারমণ, হে রাধে, রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

সে সময়কার সমগ্র বাঙ্গালী বৈষ্ণবমণ্ডলী এই খেতরী মহোৎসবে আহূত হইয়া আইসেন। তাঁহাদের সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী ও তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র, এবং অদ্বৈত প্রভুর দুই পুত্র অচ্যুতানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণদাস আসিয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরগুলির অভিষেক করেন। সঙ্গীতপটু নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ দাস প্রভৃতি গায়কগণ, স্বগণসহ সমাগত ভক্তবৃন্দকে, সুমধুর কীর্ত্তন শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন। সে দিন ফাল্গুনী-পূর্ণিমা, চৈতন্যদেবের জন্মদিন এবং হোলিপর্ব্ব উপলক্ষে ফাগ খেলাও হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেই সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। নরোত্তম ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভক্তি ও

সাধনা দেখিয়া অনেকেই, এমন কি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত, তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। বাস্তবিক নরোত্তম ঠাকুরের রচিত প্রার্থনাপদগুলি এতই মধুর ও ভক্তিব্যঞ্জক যে, একবার শুনিলে শীঘ্র ভোলা যায় না। আমরা একটি মাত্র প্রার্থনাপদ উদ্ধৃত করিতেছি ;—

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥
কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥
শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস ॥

চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা সাযুজ্য মুক্তি বা ঈশ্বরে লীন হইবার অভিলাষ করেন না। তাঁহারা শ্রীরাধকৃষ্ণের সমীপে থাকিয়া সেবা করিবারই কামনা করেন। উপরি-উদ্ধৃত গীতে তাহারই আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহাই সখীভাব। আত্মসুখেচ্ছা কাম, শ্রীকৃষ্ণের সুখেচ্ছা প্রেম। সাদা কথায় নিষ্কামভাবে (আত্মসুখ বিসর্জ্জন দিয়া) প্রেম ভক্তি সহকারে (ভগবৎ-প্রীতিকাম হইয়া) ধর্ম্মাচরণ, এবং ইহ ও পরজীবন যাপন করাই, ইঁহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা।

এই খেতরী মহোৎসবের পর হইতেই—বঙ্গদেশে সমধিক ভাবে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়। তখন অনুমান ১৬১৫ খৃঃ অঃ। জাহাঙ্গীর বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন; এবং চৈতন্যদেবের বৃন্দাবন গমনের পর প্রায় শত বৎসর অতীত হইয়াছিল।*

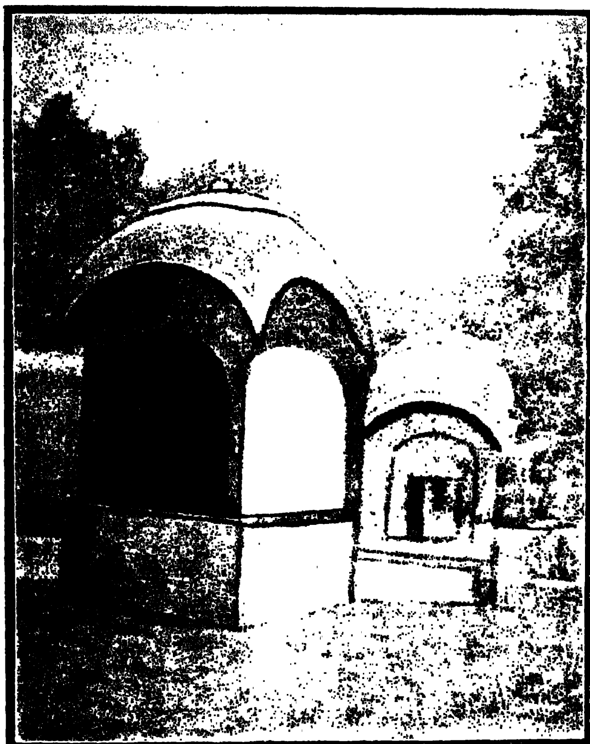
লোকনাথ গোস্বামীর আবিষ্কৃত রাধাবিনোদ ঠাকুর এক্ষণে জয়পুরে গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভূ এখন রাধারমণের পার্শ্ববর্ত্তী একটি মন্দিরে আছেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাধাকুণ্ড তীরে গোকুলানন্দ নামে যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন, সেই মূর্ত্তিও এখানে আনীত হইয়াছেন। চৈতন্যদেব রঘুনাথ দাসকে যে গোবর্দ্ধন শিলাটি পূজা করিতে দিয়াছিলেন, রঘুনাথের লোকান্তরের পর বিশ্বনাথ সেই গোবর্দ্ধন শিলাটির পূজা করিতেন। সেই শিলাটিও এক্ষণে এই মন্দিরে আনীত ও রক্ষিত হইয়াছেন।

বৃন্দাবন ধামে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। সনাতন, রূপ ও জীব প্রভৃতি গোস্বামীরা শ্রীরাধাকে স্বকীয়া নায়িকা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী রূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লোকান্তরের পর বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার শিষ্য (ভাগবতের অপর টীকাকার) বলদেব বিদ্যাভূষণ, উভয়েই

* এই খেতরী মহোৎসবের দিন সম্বন্ধে নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে দীনেশ বাবু বলেন, ১৫০৪ শক (১৫৮২ খৃঃ অঃ) "নিত্যানন্দবংশ-কল্পী"-রচয়িতা বলেন, ১৫১০ শক (১৫৮৮ খৃঃ অঃ)। ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে নগেন্দ্রবাবু (৪॥/ পৃঃ) বলেন, ধীরহাম্বীরের রাজ্যারম্ভ ১৫১৯ শক (১৫৯৭ খৃঃ)। তিনি কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলে পর বৃন্দাবন হইতে ভক্তিগ্রন্থ আনীত হয়; তাহারও পরে খেতুরী মহোৎষব হইয়াছিল; সুতরাং আকবরের রাজত্বের শেষাশেষি ধরিয়া লইতে হইবে।

শ্রীরাধাকে পরকীয়া (পরপত্নী) বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। এই মতভেদ জন্য জীব গোস্বামীর শিষ্যগণের সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মনোমালিন্য ও বিরোধ ঘটে। অবশেষে এই বিরোধটা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে, একদিন প্রত্যূষে যখন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাধাকুণ্ডের সমীপস্থ মাঠে একাকী শৌচে গিয়াছিলেন, তখন জীব গোস্বামীর স্বকীয়াবাদী শিষ্যেরা তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইলেন। তখন নিরুপায় বিশ্বনাথ (কেহ কেহ বলেন, যোগবলে নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া) তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিলেন, "ভাল, আমায় মারিতে চাও মার; কিন্তু তৎপূর্ব্বে বল দেখি, শ্রীকৃষ্ণের আবাস স্থান নন্দীশ্বর গ্রামের ও শ্রীরাধার আবাস স্থান বর্ষাণা গ্রামের মধ্যে কোন্ গ্রাম আছে?" স্বকীয়াবাদীরা বলিলেন, "সঙ্কেত গ্রাম, তাহা কে না জানে?" বিশ্বনাথ বলিলেন, "বেশ কথা, যদি শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা স্বকীয়া-বনিতা হইতেন, তাহা হইলে নন্দীশ্বর গ্রামে আসিয়া শ্বশুর-গৃহে থাকিতে পারিতেন, গোপনে সঙ্কেত-বটে মিলিত হইবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন থাকিত না। এই উভয় গ্রামের মধ্যে সঙ্কেত-বট থাকাতেই রাধার পরকীয়াত্ব প্রমাণিত হইতেছে। ইহাতে যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, মারিতে চাহ, মার।" বিপক্ষেরা লজ্জিত হইয়া নিরুত্তরে চলিয়া গেল।*

* মহারাজ সওয়াই জয়সিংহের আমলে এই স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া জয়পুর বৃন্দাবন প্রভৃতি অঞ্চলে তুমুল আন্দোলন ও ঘোরতর বিরোধ উঠে। মহারাজ সংশয় নিবারণ জন্য স্বকীয়াবাদী নিজ সভাপণ্ডিত কৃষ্ণদেব ভট্টাচার্য্যকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদেব প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানের বৈষ্ণবগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া, স্বকীয়াবাদ পোষক জয়পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। তিনি বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলে, নবদ্বীপ, শ্রীখণ্ড, কাজিগ্রাম প্রভৃতি স্থানের খ্যাতনামা পণ্ডিত বৈষ্ণবগণেরা, তদানীন্তন নবাব জাফর খাঁর নিকট



সম্মুখে নরোত্তম ঠাকুরের ও পশ্চাতে লোকনাথ গোস্বামীর সমাধি

গোকুলানন্দের মন্দিরে দর্শনোপযোগী শিল্পকার্য্যাদির বিশেষ সমাবেশ নাই। ইহা সাদসিধা ধরণের। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে লোকনাথ গোস্বামী ও নরোত্তম ঠাকুরের 'সমাজ' আছে। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে লোকনাথ গোস্বামীজীর এবং কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে নরোত্তম ঠাকুরের তিরোধান মহোৎসব হইয়া থাকে। লালা বাবুর গুরু উৎকল-দেশীয় সাধক সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর সমাধিটীও এই স্থানে আছে। কোন্ তিথিতে তাঁহার মহোৎসব হয় বলিতে পারি না।

আমরা রূপ, সনাতন, জীব ও গোপালভট্ট এই চারিজন প্রধান গোস্বামীর জীবনচরিত যথাস্থানে দিয়াছি। কেবল রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস অবশিষ্ট আছেন। এই দুই জনের জীবনচরিত এই খানেই দিব। ইঁহারা উভয়ে বৃন্দাবনে কোন দেবতা প্রকাশ বা মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া যান নাই। কেবল অপরাপর গোস্বামীদের ন্যায় ভজন-সাধনে দিবারাত্রি রত থাকিতেন।

রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী

"চরিতামৃতে" লিখিত আছে যে, চৈতন্যদেব যখন বারাণসীধামে অবস্থান করিতেন, তখন তপন মিশ্র নামক একজন ভক্তের বাটীতে ভিক্ষা নির্ব্বাহন (ভোজন) করিতেন। "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে লিখিত আছে

আবেদন করিয়া এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। তথায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের নিকট, কৃষ্ণদেব বিচারে পরাজিত হইয়া, গৌড়ীয়গণের অভিমত পরকীয়াবাদ-পোষক পত্রে, স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বিবরণ বাবু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়।

যে, চৈতন্যদেব পূর্ব্বদেশে ভ্রমণকালে, পদ্মাবতীতীরে রামপুর নামক গ্রামে যাইয়া তপন মিশ্রকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তপন চৈতন্যদেবের সহচর হইতে চাহিলে, তিনি ইঁহাকে বারাণসীতে আসিয়া বাস করিবার আদেশ দেন। রঘুনাথ ভট্ট তপন মিশ্রের পুত্র, ইঁহার বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র। সেই বয়সেই ইনি ভক্তিভরে চৈতন্যদেবের পাদসম্বাহন করিতেন। যৌবনারম্ভে রঘুনাথ, রামদাস বিশ্বাস নামক জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত, নীলাচলে চৈতন্যদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁহার পার্ষদগণের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। তিনি পুরীধামে আট মাস ছিলেন। মধ্যে মধ্যে চৈতন্যদেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া, বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন। "চরিতামৃতে" দেখি—

"রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ।
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম॥

চৈতন্যদেব ইঁহাকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "এখন গৃহে যাইয়া তোমার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা কর, এবং কোন বিশিষ্ট বৈষ্ণবের নিকট ভাল করিয়া ভাগবত অধ্যয়ন কর।" রঘুনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে তাঁহার পিতামাতার কাশীলাভ ঘটিলে, রঘুনাথ পুনরায় নীলাচলে উদাসীন বেশে প্রভুর নিকট আসিয়া পূর্ব্ববৎ আট মাস অবস্থান করিলেন। পরে চৈতন্যদেবের আদেশে বৃন্দাবনে যাইয়া, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর আশ্রয়ে বাস করিলেন। সেখানে তিনি অতি সুললিত কণ্ঠে ভাগবত পাঠ করিতেন। গোবিন্দজী প্রসঙ্গে আমরা সে পরিচয় দিয়াছি। বৃন্দাবনে ইঁহার অনেকগুলি ধনী ও সম্ভ্রান্ত ভক্ত হইয়াছিল। ইঁহার আদেশেই একজন ধনী ভক্ত

গোবিন্দদেবের মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছি। পুরীধাম হইতে বিদায়কালে চৈতন্যদেব, জগন্নাথদেবের প্রসাদী চৌদ্দ হাত তুলসীর মালা ও "ছুটা পাণ বিড়া", উপহার দিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে সেই পবিত্র মালা গাছটি গলায় বাঁধিয়া ইনি অন্তিম নিশ্বাসপাত করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত কোন গ্রন্থাদির সংবাদ পাই নাই। শেঠেদের মন্দিরের পার্শ্বে "চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ" নামক স্থানে ইহাঁর সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সেবা-প্রাকট্য পুঁথিতে ইহাঁর কোন কথাই নাই। তবে ১৫১০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্ম বলিয়া অনুমান হয়। অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তিরোধান-মহোৎসব হইয়া থাকে।

রঘুনাথ দাস বা দাস-গোস্বামী

চৈতন্যদেবের যতগুলি শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন, প্রহ্লাদের ন্যায় এই অহৈতুকী ভক্তের সহিত, তাহাদের কাহারও তুলনা হয় না। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধন দাস কায়স্থ জমিদার ও অতুল ধনের অধিপতি ছিলেন। ইঁহাদের বার্ষিক আয় নয় দশ লক্ষ টাকা। রঘুনাথ তাঁহাদের একমাত্র বংশধর। তাৎকালীন বাঙ্গালার রাজধানী ও বন্দর, সপ্তগ্রামে ইঁহাদের বাটী ছিল। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথ হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন। শৈশবে যবন হরিদাস বাবাজীর মুখে হরিনাম সংকীর্ত্তন শুনিয়া, ইঁহার প্রাণে ভক্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। বাল্যকাল হইতেই ইনি ধনী-জন-ভোগ্য আহার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে নিস্পৃহ ছিলেন। শান্তিপুরে ইঁহার সহিত চৈতন্যদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চৈতন্যদেব 'মর্কট বৈরাগ্য' পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং যথাকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে

বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। ইনি সেই উপদেশ মত লিলিপ্তভাবেই গৃহে রহিলেন। কোন কারণে ইঁহাদের সহিত নবাবের কর্ম্মচারিদিগের বিরোধ ঘটে। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন ভয়ে লুকাইল। বালক রঘুনাথ নির্ভীক হৃদয়ে চৌধুরী ও উজীরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিষ্ট কথায় সকল গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন। পিতার আজ্ঞা লইয়া পানিহাটী গ্রামে গিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তথায় একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে চিঁড়ার মহোৎসব দিবার সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করিয়াছিলেন। (পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ভগ্নপ্রায় পাটবাড়ী আছে। গঙ্গাতীরে সেই চারিশত বৎসরের প্রাচীন বটবৃক্ষতলে, প্রতি বৎসর চিঁড়ার মহোৎসব হইয়া থাকে।) ইনি একদিন পলাইয়া পুরীধামে চৈতন্যদেবের নিকট যাইতেছিলেন, পিতা লোক দিয়া ধরিয়া আনিলেন। জননী ইঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ করিলে, গোবর্দ্ধন খেদের সহিত বলিলেন—

"ইন্দ্র সম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এ সব বান্ধিতে যার নারিলেক মন॥
দড়ির বাঁধনে তাঁরে বাঁধিবে কিমতে।
চৈতন্যচন্দ্রের বাতুল কে পারে রাখিতে॥"
(চরিতামৃত)

ইহার কিছুদিন পরে একদিন প্রত্যূষে কিশোর-বয়স্ক রঘুনাথ, বুদ্ধদেবের ন্যায় জনক জননী, আত্মীয় স্বজন, যুবতী ভার্য্যা ও বিপুল বিভব সকলই ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণ উদ্দেশে পুরীধামে ছুটিলেন। পাছে আবার ধরা পড়েন, সেই ভয়ে সাধারণ রাজপথ ছাড়িয়া বনপথ ধরিলেন। প্রতিদিন ১৫।১৬ ক্রোশ হাঁটিয়া, কোন দিন উপবাস, 'কভু

চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান' করিয়া দ্বাদশ দিনে পুরুষোত্তম ধামে পৌঁছিলেন। চৈতন্যদেব সস্নেহে ইঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাঁহার প্রিয় পার্ষদ স্বরূপ দামোদরের হস্তে ইঁহাকে 'পুত্র-ভৃত্য'রূপে সমর্পণ করিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল শিখাইতে বলিলেন। রঘুনাথ দুই এক দিন মাত্র চৈতন্যদেবের পাত্রাবশেষ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া, সন্ধ্যার সময়ে জগন্নাথদেবের সিংহদ্বারে যাইয়া অযাচিত ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া কয়েক দিন কাটাইলেন। একদিন রঘুনাথ চৈতন্যদেবের নিকট উপদেশ ভিক্ষা করিয়া এই সদুপদেশপূর্ণ শ্লোকটী তাঁহার নিকট পাইয়াছিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

রঘুনাথ আজীবন কখনও এ উপদেশের ব্যতিক্রম করেন নাই। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, বিনীত, প্রশান্ত ও দীনভাবে জীবন যাপন করিতেন। ইহাঁর পিতা, দৈন্যের কথা শুনিয়া ইঁহাকে কয়েক শত টাকা পাঠাইয়া দেন। রঘুনাথ সে টাকা নিজে না লইয়া চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণবগণের সেবায় খরচ করিয়া ফেলেন। অযাচিত ভিক্ষাও তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি সত্রে গিয়া দরিদ্র ভিক্ষুকগণের সঙ্গে একত্র বসিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তাহাও ত্যাগ করিয়া যে সকল সড়া (পচা) প্রসাদ, গাভীতেও খাইতে পারিত না, তাহাই আনিয়া সমুদ্রের লোণা জলে ধৌত করিয়া খাইতেন। এ কথা চৈতন্যদেবের কর্ণগোচর হইলে, তিনি একদিন ইঁহার কুটীরে আসিয়া স্বয়ং কিছু খাইলেন এবং ইঁহার দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। তিনি অর্চ্চনার জন্য, তাঁহাকে বৃন্দাবন হইতে আনীত একটি গোবর্দ্ধন

শিলা ও গুঞ্জামালা দিয়াছিলেন। রঘুনাথ আজীবন জল ও তুলসী দিয়া তাহারই পূজা করিতেন।

রঘুনাথ অন্য কোন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই। চৈতন্য-দেবের আদেশে শেষ-জীবন বৃন্দাবনের নিকটস্থ রাধাকুণ্ডে অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবনে অধিক লোকের সংঘট্ট হইত বলিয়া, নিজ ভজন-পূজনের ব্যাঘাত-শূন্য রাধাকুণ্ডের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে থাকিতেন। একদিন সনাতন গোস্বামী দেখিলেন, রঘুনাথ ধ্যানমগ্ন আছেন, পার্শ্ব দিয়া একটী ব্যাঘ্র আসিয়া রাধাকুণ্ডে জলপান করিয়া চলিয়া গেল। প্রাণের আশঙ্কা বুঝিয়া সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা, বহু অনুরোধ করিয়া ইঁহাকে কুটীরবাসী করিলেন। ইনি যত দন জীবিত ছিলেন, প্রতিদিন কেবলমাত্র একদোনা তক্র বা ঘোল পান করিতেন। অন্য কোন সুখাদ্য দ্রব্যাদি কখনও খাইতেন না। ইনি অতিবৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর যে সময় ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন ইনি দেহ-সঞ্চালনে প্রায় অসমর্থ। বহু কষ্টে উঠিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য এবং ইঁহারই মুখে শুনিয়া চৈতন্য-চরিতামৃত রচনায় সমর্থ হইয়া-ছিলেন।

ইঁহার রচিত কোন বৃহৎ গ্রন্থ নাই। তবে ইঁহার রচিত উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, স্তবরাজ, চৈতন্যস্তব-কল্পবৃক্ষ, বিলাসকুসুমাঞ্জলি, দান চরিত ও ও মুক্তা-চরিত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। রাধাকুণ্ডের মানস-পাবন ঘাটে ইঁহার সমাধি আছে। প্রতি বৎসর আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তথায় উৎসব হইয়া থাকে। "সেবাপ্রাকট্য ও ইষ্টলাভের দিননির্ণয়" নামক পুঁথিতে লিখিত আছে যে, সংবৎ ১৫৬৩ (ইঃ ১৫০৬ খৃঃ) ইঁহার জন্ম। ইনি ১১



রঘুনাথ দাস-গোস্বামীর সমাধি।

বৎসর গৃহে ছিলেন। পুরীতে আট বৎসর ও রাধাকুণ্ড তীরে ৪৯ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং ৭৬ বৎসর বয়সে ১৬৩৯ সংবতে (১৫৮২ খৃঃ) ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। চৈতন্যদেব-প্রদত্ত রঘুনাথ দাস কর্তৃক আজীবন-পূজিত গোবর্দ্ধন-শিলাটি (দেখিতে প্রায় গোলাকার, পরিমাণ প্রায় ২ ইঞ্চি) এখন বৃন্দাবনে রাধাবিনোদজীর মন্দিরে রহিয়াছেন।

ই, আই, রেলের ত্রিশবিঘা নামক ষ্টেশনে নামিয়া সপ্তগ্রামে যাওয়া যায়। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে, ক্ষীণকায়া সরস্বতী-নদী-তীরে, রঘুনাথ দাসের পাট-বাড়ী জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। তথায় পরবর্ত্তীকালে প্রতিষ্ঠিত দারুময় রাধাবিনোদ-বিগ্রহের পূজা হয়। প্রবাদ, এইস্থানে রঘুনাথ দাসের পৈতৃক প্রাসাদ ছিল, কালবসে সে সমস্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শ্যাম সুন্দরজী ও ব্রজমণ্ডলের পরিচয়।

যশেশ্বর গ্রামবাসী সদ্গোপ-জাতীয় কৃষ্ণ মণ্ডল ও দুরিকা দাসীর পুত্রের নাম কৃষ্ণদাস। কেহ কেহ বলেন, ১৬০০খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি কোনও বৎসরে চৈত্র পূর্ণিমায় ইহাঁর জন্ম হয়। কৃষ্ণমণ্ডল অতি কষ্টে তাঁহার পুত্রকে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া, পুত্রকে সকলে দুঃখী কৃষ্ণদাস বলিয়া ডাকিত। ইঁহারা পূর্ব্বে গৌড়দেশবাসী ছিলেন। তাহার পর উৎকল দেশে যাইয়া দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাদুরপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। বাল্যকালেই কৃষ্ণদাস অতি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। কিশোর বয়সে বাঙ্গালায় আসিয়া অম্বিকা নগরে গৌরীদাস পণ্ডিতের পাঠ-বাড়ীতে, তথাকার তদানীন্তন সেবাইত, হৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন

এবং তাঁহার নিকট সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা করেন। যখন শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৃন্দাবনে আইসেন, সেই সময়ে কৃষ্ণদাসও বৃন্দাবনে আসিয়া জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন। ইনি একদিন প্রত্যূষে নিকুঞ্জবনে ঝাড়ু দিবার সময় শ্রীরাধার পদের নূপুর কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। সেই জন্য ইঁহাদের সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা তিলক-মধ্যে নূপুর চিহ্ন স্বরূপ একটি একটি লোহিত বিন্দু ধারণ করিয়া থাকেন।

জীব গোস্বামী ইঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়া দুঃখী নামের পরিবর্ত্তে শ্যামানন্দ নাম রাখেন। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে—

রাধিকার দাসী ভাব এই ইচ্ছা মনে।
শ্রীগুরু আজ্ঞায় লভ্য হৈল জীব স্থানে॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি।
করিলেন মানস সেবার অধিকারী॥
রাধা শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নাম থুইল॥

(৬ষ্ঠ তরঙ্গ) ৪৫৯ পৃষ্ঠা,

ইনি শ্রীনিবাসের সহিত বৃন্দাবন হইতে গ্রন্থরাজি লইয়া দেশে যান। তথা হইতে উড়িষ্যায় যাইয়া নৃসিংহপুরে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেইখানে তিনি গোপীবল্লভ নামে বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইহাঁর শিষ্যগণের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারি সমধিক বিখ্যাত। উৎকল দেশে ইহাঁরা হরিনামের বন্যা আনিয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জ এবং অপরাপর স্থানের রাজা ও জমিদারেরা পর্য্যন্ত ইহাঁদের শিষ্য। শ্যামানন্দের তিন পত্নী,—শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গ দাসী। প্রেমবিলাস গ্রন্থে দেখিতে পাই, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ, বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীগণের ন্যায়

সখী-ভাবক সম্প্রদায়ভুক্ত। ইঁহাদের সিদ্ধ নাম বা সখী নাম, শ্রীনিবাস—মণিমুঞ্জরী, নরোত্তম—চম্পকমুঞ্জরী, শ্যামানন্দ—কনকমুঞ্জরী। বৃন্দাবনে রাধা-দামোদরের মন্দিরের নিকটেই শ্যামসুন্দরের মন্দির অবস্থিত। শেষ-জীবনে শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে যাইয়া এ বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া থাকিবেন। কেন না, কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনায় শ্যামসুন্দর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। বোধ হয় পূর্ব্ববর্ণিত মন্দিরগুলির অনেক পরেই এই দেবালয়টি স্থাপিত হইয়াছিল। এই দেবালয়ের সম্মুখবর্ত্তী পথের অপর দিকে, একটি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে শ্যামানন্দের 'সমাজ' আছে। জ্যৈষ্ঠা শুক্লা-পঞ্চমী তিথিতে যেখানে তিরোধান-মহোৎ-সব হয়, তাহারই পার্শ্বে একটু প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আছে, পূজারীরা বলিয়া থাকেন যে, সেই স্থানে শ্রীরাধার নূপুর কুড়াইয়া পাওয়া গিয়াছিল। এই মন্দিরে দেখিবার উপযোগী কোনরূপ শিল্পকার্য্য নাই। তবে ছোট ছোট ইঁটে গাঁথা চারিদিকের উচ্চ প্রাচীরটি দেখিয়া অতি প্রাচীনকালের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এটিকে ভগ্নপ্রায় দেখিয়া-ছিলাম, এখন মেরামত হইতেছে।

রাধাদামোদর, রাধারমণ, গোকুলানন্দ ও শ্যামসুন্দর ঠাকুরের নাম চরিতামৃতে নাই। ভক্তিরত্নাকরে আছে। এই জন্য মনে হয়, এই চারিটি বিগ্রহ চরিতামৃত-রচনার পর স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

সেই সময়ে বঙ্গদেশে যে রহস্যজনক ঘটনা ঘটিতেছিল, এবার আমরা তাহার দুই একটা কথা শুনাইব। চৈতন্যদেব, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত-প্রভুকে অবতার রূপে পূজিত হইতে দেখিয়া, আর কয়েকজন লোক আপনাদিগকে অবতার রূপে পরিচিত করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু রূপ, সনাতন প্রভৃতির পরবর্ত্তী বৃন্দাবনস্থ গোস্বামী ও পূজারীরা তাঁহাদিগকে প্রত্যাখান ও বর্জ্জন করিবার যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছিলেন,

তাহা ভক্তিরত্নাকরে ও প্রেমবিলাস গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। সেই সকল নকল-অবতার মধ্যে তিনজনের এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়।

১ম। বাসুদেব নামক একজন ব্রাহ্মণ 'আমি নন্দপুত্র গোপাল' এইরূপ পরিচয় দিয়া লোকদিগকে ভুলাইতেছিলেন। রাঢ় দেশের লোকেরা তাঁহার 'খেউ খেউ' কঠোর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাঁহাকে গোপাল না বলিয়া শৃগাল বা শৃগাল-বাসুদেব বলিত।

২য়। বিষ্ণুদাস নামে অপর একজন কায়স্থ বলিত, 'আমি রঘুনন্দন রাম'; 'বৈকুণ্ঠধাম হইতে তোমাদিগকে তরাইবার জন্য ধরাধামে আসিয়াছি, হনুমান, অঙ্গদাদি কপীন্দ্রগণ আমার ভক্ত' এইরূপ বাক্ছলে লোকদিগকে প্রতারিত করিত। সাধারণ লোকেরা তাহাকে কপীন্দ্র নাম দিয়াছিলেন।

৩য়। মাধব নামে অপর একজন ব্রাহ্মণ, কোন রাজার দেবালয় হইতে অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। কিছুদিন পরে এক গোপ গ্রামে গিয়া, মাথায় চূড়া বাঁধিয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, 'আমি নারায়ণ কৃষ্ণ; পৃথিবীর লোকগণের উদ্ধারের জন্য বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছি। আমার নাম কৃষ্ণ-নারায়ণ। আমায় ভজিলে যাবে বৈকুণ্ঠ-ভবন।' সে গোপ, চণ্ডালাদি নিম্নশ্রেণীর রমণীগণের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার নানা অভিনয় করিত। ইহাকে অনেকে চূড়াধারী বলিয়া ডাকিত। এব্যক্তি একবার পুরীধামের জগন্নাথের রথের সময়, চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের সহিত নারীগণ সঙ্গে লইয়া, সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে গিয়াছিল। চৈতন্য-দেব ইহার রমণী-সংশ্রব দেখিয়া নিজ সম্প্রদায় হইতে ইহাকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীরা এই শ্রেণীর প্রতারক অবতার-গণকে পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

এই সময় হইতে ব্রজস্থ বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণেতর জাতীয় লোকদিগকে

গোস্বামী, মোহান্ত, ঠাকুর প্রভৃতি উচ্চ পদবী দিয়া ধর্ম্মপ্রচারে অধিকার দিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সময়েই কায়স্থ গোবিন্দ ঘোষ—ঠাকুর, ও রঘুনাথ দাস—গোস্বামীপদ, লাভ করিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রণম্য হইয়াছিলেন। কায়স্থ নরোত্তম ও সদ্‌গোপ দুঃখী কৃষ্ণদাস (শ্যামানন্দ গোস্বামী নামে) বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যসন্তান তাঁহাদের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া শিষ্য হইতে লাগিল। নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য—প্রসিদ্ধ গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বলরাম মিশ্র, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী এবং বৈদ্য রামচন্দ্র সেন ও তাঁহার ভ্রাতা গোবিন্দচন্দ্র সেন। শ্যামানন্দ গোস্বামীর শিষ্য—ব্রাহ্মণ রসিকানন্দ এবং ভাগবতের টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্ব্ব চতুর্থপুরুষ রসিক মুরারি। এইরূপ সমাজবিপ্লব জন্য তখন একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বোধ হয়, তাহারই কৈফিয়ৎ স্বরূপ নিম্নলিখিত পদ্যগুলি চৈতন্যচরিতামৃতে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন,—

আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্রদ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপ'ন প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা॥
হরিদাস দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিলাস॥
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজের রসপ্রেম লীলা।
কে কহিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা॥

(অঃ লীঃ, ৫ম পরিচ্ছেদ)

শাক্ত, শৈব প্রভৃতি অপর ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের লোকেরা চৈতন্যদেবের এই ঐশ্বর্য্য-স্বভাব বা উদারনীতি (আজিকার ভাষায় সাম্যবাদ) সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রূপ ও কুৎসা রটনা করিতেন। * উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত প্রভুকে ত্রিপুরাসুরের তেজ বলিয়া উপহাস করিয়া, তন্ত্ররত্নাকর নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এমন কি শক্তিসাধক ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদও তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর-কাব্যে চোরধরা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণবগণের একখানা বিকৃত চিত্র (১) দিয়া বলিতেছেন—

"ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়।"

এই যে ছত্রিশ জাতির একাকার করিবার চেষ্টা, তাহা এক শ্রেণীর লোকের নিকট দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইলেও, অন্যশ্রেণীর লোকেরা গুণ বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা চৈতন্যদেবকে অধম-তারণ, পতিতপাবন ও কাঙ্গালের ঠাকুর বলিয়া পূজা করেন। বৈষ্ণব-দিগের জাতিভেদ-নিষিদ্ধতা আমাদের মনঃকল্পিত কথা নহে, ভক্তমাল গ্রন্থের ষষ্ঠ ও ষোড়শ মালা দেখুন।

ব্রজমণ্ডল বা মথুরামণ্ডল

রূপ, সনাতন, জীব ও লোকনাথ প্রভৃতি গোস্বামী-পাদেরা ভাগবত, আদিবরাহ, স্কন্দ, পদ্মপুরাণ এবং মথুরামাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া

* শ্রীঅমিয় নিমাই-চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, ষোড়শ অধ্যায় দেখুন।

(১) অনেক অসংযতচিত্ত অনধিকারী লোকেরা যে চৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত পবিত্র প্রেম-ভক্তির ধর্ম্মে কলঙ্ক লেপন করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রজমণ্ডলের মানচিত্র

শ্রীকৃষ্ণের যে সকল লীলাভূমি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এখন আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। পাঠকগণ ব্রজমণ্ডলের মানচিত্রের সহিত তাহা মিলাইয়া দেখিবেন।

ব্রজমণ্ডলের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেওয়া আছে। আদিবরাহ পুরাণমতে বিংশতি যোজন, বায়ুপুরাণ মতে চল্লিশ যোজন, স্কন্দপুরাণ মতে দ্বাদশ যোজন, পদ্মপুরাণ মতে মথুরামণ্ডল যাযাবার হইতে শৌকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত বিংশতি যোজন বিস্তীর্ণ। সাধারণ ব্রজবাসিগণের মতে পরিধি ৮৪ ক্রোশ মাত্র। ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে লিখিত আছে—

মথুরামণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হইল।
কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা॥
শ্রীবিগ্রহ সেবা কৈলা কুণ্ডাদি প্রকাশ।
নানারূপে পূর্ণ হইল তাঁর অভিলাষ॥
কথো দিন পরে সব হইল গুপ্তপ্রায়।
তীর্থ প্রসঙ্গাদি সব কেহ না করে কোথায়॥

বজ্রনাভ-প্রতিষ্ঠিত সেই কৃষ্ণলীলার গ্রামগুলিকে এখন বন বলা হইয়া থাকে। বাস্তবিক সেগুলি বিজন অরণ্য নহে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র সমাপ্ত করিলে জীব গোস্বামী তাঁহাদিগকে রাঘব গোস্বামীর সহিত, ব্রজমণ্ডলে তাঁহারা যে সকল লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাঠাইলেন। রাঘব পণ্ডিত দাক্ষিণাত্যবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ। তিনি গোবর্দ্ধনের নিভৃত গুহায় থাকিয়া বিরলে ভগবৎ-উপাসনা করিতেন। তিনি 'ভক্তিরত্নপ্রকাশ' নামে একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন, এবং ব্রজমণ্ডলের সমস্ত লীলাস্থানের বিষয় অবগত ছিলেন।

তিনি প্রথমে শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুরায় কেশবদেব, দীর্ঘবিষ্ণু, গতশ্রম, গোকর্ণ, পদ্মনাভ, স্বয়ম্ভূ, মহাবিদ্যা ও ভূতেশ্বর দেবকে দেখাইয়া বিশ্রান্তি ঘাটে লইয়া যান এবং তাঁহাদিগকে তথাকার ২৪টি ঘাট দেখান। কোন্ স্থানে সুদামা মালীর ঘর ছিল, কোথায় শ্রীকৃষ্ণ কংশের রজককে বধ করিয়াছিলেন, কোথায় ধনুর্ভঙ্গ করিয়াছিলেন, কোথায় কুব্জার মন্দির ছিল এবং কোন্‌খান দিয়া কংশের দেহ যমুনায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, সে সকল দেখাইলেন। পরে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যে দ্বাদশ বন ও উপবন সকল দেখাইতে গিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ আমরা পরে দিতেছি। দ্বাদশবনের নাম এই—যমুনার পশ্চিম তীরে মধু, তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য, খদির ও বৃন্দাবন; এবং যমুনার পূর্ব্ব তীরে ভদ্র, ভাণ্ডীর, বিল্ব, লোহ ও মহাবন অবস্থিত। তদ্ভিন্ন পিলু, কোট, কোকিল, ছত্র, কদম্ব, কটক প্রভৃতি স্থানগুলিকে উপবন বলে।

মধুবন—রাঘব গোস্বামী ও তাঁহার সঙ্গীরা মথুরা হইতে প্রথমে মধুবনে গমন করেন। এখানে মধু দৈত্যের বাসস্থান ছিল। বলদেব এখানে মধুপান করিয়াছিলেন। অর্দ্ধক্রোশ দূরে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুবের তপস্যার টীলা আছে।

তালবন—এখানে শ্রীকৃষ্ণ ধেনুক নামক তালবনরক্ষক গর্দ্দভাকার অসুরকে বিনাশ করিয়া, সখাগণ সঙ্গে তালফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অধুনা এখানে একটিও তালবৃক্ষ নাই।

কুমুদবন—এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বচ্ছ কুমুদ-সরোবরে জলকেলী করিয়াছিলেন। শ্যামতমাল বৃক্ষতলে চৈতন্যদেবের বসিবার আসন ও কপিল-মুনির মূর্ত্তি আছে। এখানে দন্তবক্র বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই জন্য কুমুদ-বনের অপর নাম দতিহা হইয়াছে।

আড়িং—ইহার নিকটেই শান্তনু কুণ্ড। লোকে ইহাকে শাঁতিহা বলে। শান্তনু রাজা এখানে তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীর গর্ভে সত্যব্রত বা ভীষ্ম নামে সন্তানকে লাভ করেন। অদ্যাপি বন্ধ্যা রমণীগণ রবিবারে এখানে আসিয়া সন্তান-বিহারী ঠাকুরের নিকট সন্তান-কামনা করিয়া থাকেন। ঠাকুরের মন্দিরটি সরোবরের মধ্যস্থ একটি দ্বীপের উপর স্থাপিত।

বহুলাবন—পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে দুইক্রোশ দূরে বহুলাবনে শ্রীকৃষ্ণ বহুলা নামক গাভীকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বকুলবন নামের অপভ্রংশ বহুলাবন।

রাধাকুণ্ড—এখানে শ্রীকৃষ্ণ বৃষরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম আরিট্ হইয়াছে।

শ্রীরাধা গোবধকারী শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করিতে অসম্মত হওয়ায় তিনি শ্যামকুণ্ড নামে সর্ব্বতীর্থময় একটি কুণ্ড (সরোবর) সৃজন করিয়া, তাহাতে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন। শ্রীরাধাও শ্যামকুণ্ডের পার্শ্বে নিজ নামে একটি কুণ্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উভয় কুণ্ডের মধ্যে জল যাইবার নালা আছে। সেই নালার উপর শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত ছত্রীর ভিতর উভয়ের চরণচিহ্ন স্থাপিত আছে।

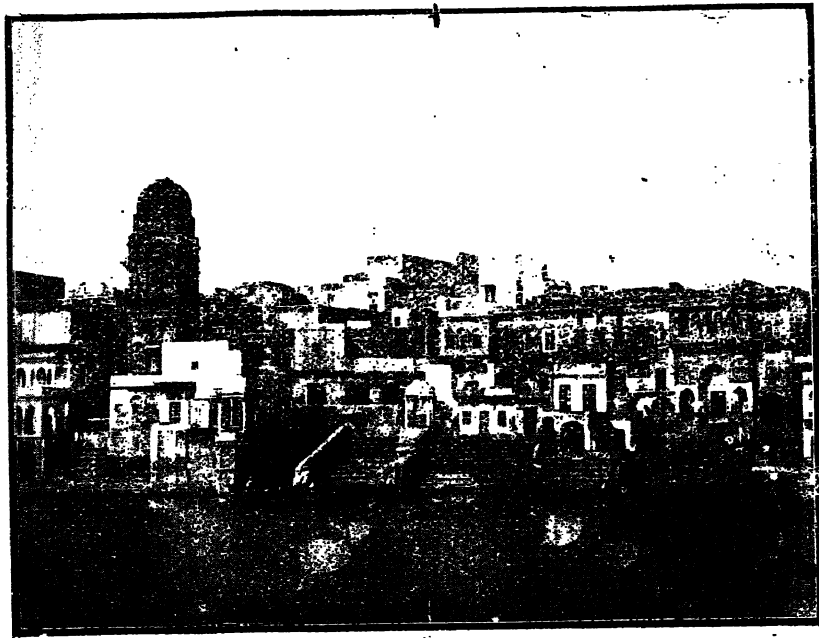
শ্রীচৈতন্যদেব যখন এ স্থান দর্শন করিতে আসেন, তখন উভয় কুণ্ডই মজিয়া গিয়া ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। রঘুনাথ দাস গোস্বামী এখানে আসিয়া বাস করিলে পর, তাঁহারই উদ্যোগে কুণ্ড-দুইটির পঙ্কোদ্ধার করা হয়। পরে লালাবাবুর ব্যয়ে ইহা পাথর দিয়া বাঁধান হইয়াছে। যে সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, তখন এখানেও তাঁহাদের একটি প্রধান আড্ডা হইয়াছিল। এখানে চৈতন্য-দেব, বল্লভাচার্য্য, ছয় গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম ঠাকুর,

শ্যামানন্দ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভৃতি বাঙ্গালী-গণেরই আসন, কুটীর প্রভৃতি কোন না কোন নিদর্শন আছে। এই স্থানে থাকিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার প্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। রাধাকুণ্ড তীরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সমাজ আছে, তাঁহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এই রাধাকুণ্ড বৃন্দাবন হইতে প্রায় নয় ক্রোশ।

গোবর্দ্ধনগিরি—এস্থান মথুরা হইতে প্রায় আটক্রোশ দূরে। এখানে মানসী-গঙ্গাতীরে বজ্রনাভ-প্রতিষ্ঠিত হরিদেবের ও চক্রেশ্বর শিবের মন্দির আছে। সেই স্থানেই পথপ্রদর্শক রাঘব গোস্বামীর গুহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নিকটেই অন্নকূট গ্রামে (বর্ত্তমান নাম আনিওর) গোবিন্দকুণ্ডতীরে মাধবেন্দ্রপুরী বন-জঙ্গল ও মৃত্তিকার ভিতর হইতে গোপাল বিগ্রহ বাহির করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনে আগমনের বহু বৎসর পূর্ব্বেই ইহা ঘটিয়াছিল। তিনি দুইজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণকে গোপালজীর সেবার ভার দিয়া দক্ষিণ দেশ হইতে চন্দন আনিতে যাত্রা করেন। আমরা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যতদূর জানিতে পারিতেছি, এই বুঝি ব্রজমণ্ডলে বাঙ্গালিগণের প্রথম পূজারী কর্ম্ম আরম্ভ।

দিগ্ বা লাঠাবন—এ উপবনটি ভরতপুরের এলেকায় অবস্থিত। ইহা ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল না। প্রসিদ্ধ জাঠরাজ সুরজমল এ স্থানে বহু কোটী টাকা ব্যয়ে, অতীব সুন্দর দেবমন্দির, ভবন, ফোয়ারা ও পুষ্করিণী প্রভৃতি করিয়া দিয়া এ স্থানটিকে তীর্থরূপে পরিণত করাইয়াছেন। বনযাত্রীরা ইহার শোভায় আকৃষ্ট হইয়া এই স্থান দেখিতে আসেন।

কাম্যবন—এখানে শ্রীরাধার অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ, রামবেশে লঙ্কাকুণ্ডের উপর সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র শৈলশিরে পাষাণখণ্ডে শ্রীরাধার



যমুনা হইতে মথুরার শোভা ও সতী-বুরুজ

পদাঙ্ক আছে। এখানকার কামেশ্বর শিবলিঙ্গ বজ্রনাভ কর্ত্তৃক স্থাপিত। এখানে ময়দানব-তনয় বোমাসুরের বৃহৎ গুহা আছে। ভোজনস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ-সহ ভোজন করিয়াছিলেন। আরঙ্গজেবের উপদ্রবে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ সকল জয়পুরে লইয়া যাইবার সময়, বৃন্দাদেবীর রথচক্র কাম্যবনের মৃত্তিকা মধ্যে বসিয়া অচল হইয়া গিয়াছিল। ইহাতে পূজারীরা তাঁহাকে বৃন্দাবন ছাড়িয়া যাইতে অসম্মতা ভাবিয়া এই স্থানেই তাঁহাকে রাখিয়া যান। এই বনে পাণ্ডবেরা বনবাস-কালে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ঐতিহাসিকগণের দেখিবার একটি প্রাচীন কীর্ত্তি আছে। সেটি পৌরাণিক বা বৌদ্ধ কোন্ যুগের, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। সেটির নাম চৌষট্টি খাম্বা, অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলের ৮৪ ক্রোশের সংখ্যানুসারে এই চৌষট্টিটি স্তম্ভ-বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ হলটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার লালপাথরের থামগুলিকে প্রাচীন ভাস্করকার্য্যের আদর্শ বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

বর্ষাণ—এ নামটি বৃষভানু শব্দের অপভ্রংশ। মহাবনের সন্নিকটস্থ রাভেল গ্রামে শ্রীরাধার জন্ম। কংশপ্রেরিত অসুরগণের উপদ্রবে রাধার পিতা বৃষভানু রাজা এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার কয়েকটি বৃক্ষে নূপুরাকৃতি ফল ধরে। আল্‌তা পাহাড়ীতে শ্রীরাধার অলক্তক-রঞ্জিত পদচিহ্ন আছে। এখানে রাধিকার নাম লাড়্‌লীজী। তাঁহার মন্দিরটি পর্ব্বতের উপর অবস্থিত।

নন্দীশ্বর বা নন্দগ্রাম—শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় জন্ম। কংশভয়ে বসুদেব তাঁহাকে লইয়া, যমুনা পার হইয়া মহাবনের নিকটস্থ গোকুলে নন্দভবনে রাখিয়া আসেন। পরে সেখানে পুতনা, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি অসুরের উপদ্রব দেখিয়া এই নন্দগ্রামে আসিয়া বাস করেন। এখানে পাবন নামে বিস্তৃত সরোবর আছে, এবং নন্দীশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-

লীলার নানা চিহ্ন আছে। চৈতন্যদেব এই স্থানে পর্ব্বত-গুহামধ্যে নন্দ, যশোদা ও ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন। ব্রজধামের আর কোথাও তিনি এইরূপ ত্রিভঙ্গ কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখেন নাই। "সেবাপ্রাকট্য" ও "ইষ্টলাভের দিননির্ণয়" নামক পুথিতে লেখা আছে, সম্বৎ ১৫৯৫ মাঘ শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সনাতন গোস্বামী সেই সকল বিগ্রহের অভিষেক করিয়াছিলেন।

ছত্রবনে—শ্রীকৃষ্ণ রাজা সাজিয়াছিলেন।

খদির বনে—বকাসুর বধ হইয়াছিল।

চরণ পাহাড়ী—শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে পর্ব্বত দ্রব হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে গোপ ও গাভীগণের যে পদাঙ্ক পড়িয়াছিল, তাহা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভদ্রবন—কৃষ্ণ-বলরামের ক্রীড়া ও গোচারণ স্থান।

ভাণ্ডীরবন—এখানে প্রলম্বাসুর নিহত হইয়াছিল। ভদ্রবন হইতে এস্থান কেবল মাত্র একক্রোশ দূরে অবস্থিত।

বিল্ববন—এখানে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির আছে।

লোহবন—এখানে শ্রীকৃষ্ণ লোহজঙ্ঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

গোকুল—এখানে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের গোস্বামিগণের স্থাপিত গোকুলনাথজীর মন্দির আছে। তাঁহারা বাৎসল্য ভাবে কৃষ্ণ ও বলদেবের সেবা করিয়া থাকেন।

মহাবন—এখানে আশীখাম্বা নামে একটি প্রাচীন গৃহ আছে, লোকে তাহাকে নন্দরাজার প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। এখানে যশোদা শ্রীকৃষ্ণের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন। ইহা, পুতনা ও তৃণাবর্ত্তের বধ-স্থান। এই স্থানেই শকট ও যমলার্জ্জুনভঞ্জন হইয়াছিল। এখান হইতে অসুরের উপদ্রব-ভয়ে নন্দমহারাজ গোপগণকে লইয়া নন্দগ্রামে গিয়া বাস করেন।

বলদেব—এখানে বজ্রনাভ-প্রতিষ্ঠিত বলদেবের শেষ বা নাগ মূর্ত্তি

আছে। এই সকল দেখিয়া রাঘব গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরকে লইয়া মথুরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। যাঁহারা তীর্থ করিতে যান, তাঁহারাও এই ভাবে পথের অনুসরণ করেন।

সত্যের অনুরোধে এখানে এক কথা বলিয়া রাখি,—মথুরা,বৃন্দাবন—এমন কি ব্রজমণ্ডলের প্রায় অনেক গ্রাম হইতেই কনিংহ্যাম,গ্রাউস,ফুরার, ভোগেল ও পণ্ডিত রাধাকৃষণ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধযুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ ও নিদর্শন সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। সে সকল নিদর্শন এক্ষণে মথুরা, লক্ষ্ণৌ ও কলিকাতা প্রভৃতি যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। *

* খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক, এই মথুরা প্রদেশে, বুদ্ধদেব ও তাঁহার প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর স্মৃতিরক্ষার জন্য কয়েকটি স্তূপ ও বিহার নির্ম্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ, শক-সম্রাট কনিষ্ক (যাঁহার নাম হইতে শকাব্দা প্রচলিত) এবং তাঁহার বংশধরেরা এখানে আরও স্তূপ, চৈত্য, সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। মথুরা তাঁহাদের রাজধানী ছিল। মাঠগ্রাম হইতে কনিষ্ক ও পুত্র হবিষ্কের নাম লেখা মুণ্ডহীন পাষাণময় প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়া মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথমে চৈনীক পরিব্রাজক ফাহিয়ান, এখানে ২০টি বিহার ও ৩০০০ বৌদ্ধ-যতির বাস দেখিয়াছিলেন। তিনি এখানে কোন হিন্দু দেবতা ছিল কি না তাহার উল্লেখ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনীক পর্য্যটক হিউএন্থ সঙ্গ, এখানে উপগুপ্ত-নির্ম্মিত বুদ্ধদেবের নখস্তূপ ও বিহারাদি দেখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এখানে তখন ৫টি মাত্র ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু দেবালয় ছিল। কি কি দেবতা, তাহার নাম করেন নাই। তখন এখানে বৌদ্ধগণের সংখ্যা কমিয়া গিয়া ২০০০ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে শকারি যশোবর্ম্মদেবের সময় হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়া মগধের গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে পতন হইয়াছিল। আজিও মথুরার একটি ঘাটের নাম বোধিতীর্থ এবং কঙ্কালী টীলা, আনন্দ টীলা, বৈনায়ক টীলা, ও জামালপুর প্রভৃতি স্থান হইতে অসংখ্য বৌদ্ধ-ধ্বংসাবশেষ সকল বাহির হইতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ

বাঁকেবিহারীজী।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তি-গুলির বিবরণ দিয়াছি। এবার আমরা তৎকালে যে সকল পশ্চিম-প্রদেশীয় সাধু ও বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে দেববিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয়েক জনের পরিচয় দিব। তাঁহাদের মধ্যে হরিদাস স্বামী, হিত হরিবংশ, হরিরাম ব্যাসজী, সুরদাস মদনমোহন, অন্ধ সুরদাস, তুলসী-দাস ও থানেশ্বরী জগন্নাথের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা সকলেই ভক্ত, সাধক, গায়ক ও কবি। একে একে ইহাঁদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

হরিদাস স্বামী, বাঁকেবিহারী বা কুঞ্জবিহারী নামে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বংশের এইরূপ পরিচয় জানিতে পারা যায়ঃ—মূলতানের অন্তর্গত কোল গ্রামে (কেহ কেহ বলেন উর্চ্চাগ্রামে) ব্রহ্মধীর নামে একজন ধনী সারস্বত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র জ্ঞানধীর, গিরিধারী গোপালমূর্ত্তির পূজা করিতেন। তিনি মথুরায় আসিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার পুত্র আশাধীর, বৃন্দাবনের পার্শ্ববর্ত্তী রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর নামক একজন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, শ্বশুরা-লয়ে বাস করিলেন। আশাধীরের দুইপুত্র—নাম, হরিদাস ও জগন্নাথ। বাল্যকাল হইতেই হরিদাসের মন অতিশয় ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। পিতামাতার বিশেষ অনুরোধেও বিবাহ করিলেন না। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৃন্দাবনের পরপারে মান-সরোবর নামক কুণ্ডতীরে কুটীর বাঁধিয়া একাকী ভজন-পূজনে নিমগ্ন থাকিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা



হরিদাস স্বামী (তানসেনের গুরু) (নিধুবনের প্রাচীন চিত্র হইতে)

বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিলে তিনিও বৃন্দাবনে আইসেন। তথায় নিধুবনের বিশাখা কুণ্ড হইতে মৃত্তিকা খনন করিয়া বাঁকেবিহারী ঠাকুরটিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কঠোর সাধনা ও সুমধুর ভজনগীতির যশ দিন দিন চারিদিকে বিস্তৃত হইতে লাগিল। ইনি কাহার নিকট, ও কোন্ সময়ে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সঠিক প্রকাশ নাই। তবে জনরবে শুনা যায় যে, মানসরোবরে অবস্থানকালে গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণদত্ত নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট ইঁহার নাদবিদ্যা শিক্ষা হইয়াছিল। তাঁহার মাতুল বিথল বিপুল প্রথমে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

দয়াল দাস নামক দিল্লীবাসী ক্ষত্রিয় ইঁহাকে স্পর্শমণি (পরশ-পাথর) দিতে গিয়াছিলেন, ইনি সেটি যমুনায় ফেলিয়া দিলেন। দয়াল দাসের মন অতিশয় বিষণ্ণ হইল। হরিদাস তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে এক অঞ্জলি যমুনার বালি তুলিতে বলিলেন। দয়ালদাস সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, প্রত্যেক বালুকা-কণাতেই লৌহ স্পর্শ করাইলে সোনা হইতে লাগিল। তিনি তখন ধন অপেক্ষা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারিলেন, এবং অবিলম্বে হরিদাসের শিষ্য হইলেন। *

হরিদাস স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, এক চোর তাঁহার পূজিত শালগ্রাম-শিলাটিকে, পরশপাথর ভাবিয়া চুরি করিয়া লইয়া যায়, পরে নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া একটি কুঞ্জবনে ফেলিয়া পলাইল। হরিদাস শালগ্রাম অনুসন্ধান করিতেছিলেন, এমন সময় ঠাকুরটি তাঁহাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া নিজ অবস্থান জানাইয়া দিলেন, হরিদাস হৃষ্টচিত্তে মন্দিরে ঠাকুর লইয়া গেলেন।

একদিন হরিদাস যমুনাতীরে বসিয়া ভজন করিতেছিলেন; একজন

* ভক্তমাল গ্রন্থে এই পরশ-পাথরের আখ্যান সনাতন গোস্বামীর নামে বর্ণিত হইয়াছে।

ধনী কায়স্থ আসিয়া তাঁহাকে একবোতল অতি সুবাসিত আতর আনিয়া উপহার দিল। হরিদাস সেটি লইয়া যমুনার বালুকার উপর সমস্ত আতরটাই ঢালিয়া দিলেন। দাতা বিষণ্ণ হইলেন, হরিদাস তখন তাঁহাকে ইঙ্গিতে মন্দিরে যাইতে বলিলেন। ধনী কায়স্থ মন্দিরে যাইয়া দেখিলেন, মন্দিরের ভিতর আতরের সৌরভে ভরপুর হইয়া গিয়াছে এবং দেব-অঙ্গে আতরের বিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে। হরিদাসের এইরূপ অলৌকিক শক্তি দেখিয়া আতরদাতা ধনী ভক্তিভরে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

লোকে বলে, তিনি কোথা হইতে প্রতিদিন একটি করিয়া মোহর পাইতেন; তাহা হইতে দেবতার উত্তমরূপ ভোগ দিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহা লইয়া ধান্য, ছোলা প্রভৃতি কিনিয়া বানর, ময়ূর, কচ্ছপাদি জীবগণকে খাওয়াইতেন। তাঁহার লোকান্তরের পর, বিথল বিপুল, বিহারিণী দাস, নাগরী দাস প্রভৃতি শিষ্যগণ মোহান্তের কায করিতেন। কিন্তু হরিদাসের ভ্রাতা জগন্নাথের দুই পুত্র মেঘশ্যাম ও মুরারি দাস, বাঁকেবিহারী ঠাকুরের অধিকারী ও সেবাইতরূপে গোস্বামী নামে অভিহিত হন। তাঁহাদের বংশধরেরাই এখন গোস্বামীরূপে শিষ্যগণকে মন্ত্রদান করিয়া থাকেন।

স্বামী হরিদাস সংস্কৃত বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন কি না, তাহা বলা যায় না। 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ' নামক তাঁহার যে দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হিন্দী ভাষায় রচিত। তাঁহার শিষ্য বিহারিণী দাস মোহান্তও অনেক লীলাপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বাঁকেবিহারীজী নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের বালগোপাল মূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ন্যায়; ইঁহাদের মন্দিরে রাধামূর্ত্তি বা তাঁহার পূজা নাই। বাঁকেবিহারীর চরণে আত্মসমর্পণ ও সাধারণ বৈরাগ্যই ইঁহাদের প্রধান

সাধনা। তৎসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলাগীতিও হইয়া থাকে। বাঁকেবিহারীর চরণদ্বয় বারমাস পরিধেয় বস্ত্রে আচ্ছাদিত থাকে; কেবল বৈশাখ মাসে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন ভক্তগণেরা ইঁহার চরণ দর্শন করিতে পান। ইঁহার "ঝাঁকি" দর্শন—অর্থাৎ মন্দিরের দরজায় একখানি পর্দ্দা ঝুলান আছে, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সেখানি খুলিয়া দিলে ঠাকুর দর্শন হয়। আবার কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য পর্দ্দাটি টানিয়া দেওয়া হয়। বেলা দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যার পর দুই ঘণ্টা করিয়া ইঁহার মন্দির খোলা থাকে, সেই সময়েই ঠাকুর দর্শন হয়। অবশিষ্ট সময় মন্দির বন্ধ থাকে।

প্রথমে ঠাকুরটি নিধুবনে থাকিতেন, পরে মদনমোহনের বাটী যাইবার পথে পুরাণ সহরে ইঁহার মন্দির হইয়াছিল। সেটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইলে ইঁহাদের নানা দূরদেশস্থ ধনী ভক্তগণ চাঁদা তুলিয়া প্রায় ৭০০০০ সত্তর হাজার টাকা ব্যয় করিয়া একটি সুদৃশ্য নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তাহার প্রবেশদ্বারটি দেখিতে বড়ই সুন্দর।

নিধুবনে হরিদাস স্বামীর সমাধি আছে। বাঁকেবিহারীজীর আসল মূর্ত্তি বৃন্দাবনে আছেন। মুসলমানের উপদ্রব সময়ে সেবকেরা ইহাঁকে গুপ্তভাবে পূজা করিতেন, সেই জন্য ইনি স্থানান্তরিত হন নাই।

আকবর শাহের প্রসিদ্ধ গায়ক, মিঞা তান্‌সেন এই হরিদাস স্বামীর শিষ্য। তাঁহার এইরূপ জীবনী আমরা জানিতে পারিয়াছি:—মিঞা তানসেনের হিন্দু নাম রামতনু মিশ্র। তিনি বাল্যকালে বৃন্দাবনের কোন ব্রজবাসীর গৃহে গোচারণে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন প্রভাত সময়ে হরিদাস স্বামী যমুনায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন, পথে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের গর্জ্জন-শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং দেখিলেন যে, কতকগুলি গাভী ঊর্দ্ধ-পুচ্ছে ভয়ে পলাইতেছে। স্বামী জানিতেন যে, বৃন্দাবনে ব্যাঘ্রের উপদ্রব



বাঁকেবিহারীজীর মন্দিরের ফটক

নাই। তবে কোথা হইতে এ গর্জ্জন আসিল? বিস্মিত নয়নে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একজন বালক বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া বাঘের ডাক ডাকিতেছে। তাহার কণ্ঠস্বর ব্যাঘ্ররবের এত অনুরূপ যে, তাহা শুনিয়া গাভীরাও ভয়ে পলাইতেছে। তিনি সেই বালককে নিকটে ডাকিলেন এবং ব্রাহ্মণ জানিয়া নিজের শিষ্য করিয়া তাহাকে সঙ্গীত-বিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই রামতনু সঙ্গীত-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া পড়িলেন।

একদিন অপরাহ্নে হরিদাস যমুনা-তীরে বসিয়া, উচ্চকণ্ঠে ভজন গাহিতেছিলেন। আকবর বাদশাহ সে সময়ে যমুনা উপরে রাজকীয় বজরা করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তাঁহার কর্ণে স্বামীর কণ্ঠনিঃসৃত ভাগবত-স্তোত্রলহরী অমৃতধারা ঢালিয়া দিল। বাদশাহ বজরা তীরে লাগাইয়া, ভজন-শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। পরে তাঁহাকে সশিষ্যে দিল্লীতে লইয়া যাইয়া রাজগায়কের পদে নিযুক্ত করিবার জন্য অভিলাষ প্রকাশ করিলেন এবং পুরস্কার-স্বরূপ ধনরত্ন দিতে চাহিলেন। বিষয়বিমুখ নির্লিপ্ত-সন্নাসী হরিদাস তাঁহার সহিত যাইতে বা ধনগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া, যমুনার একটি ভগ্ন সোপান মেরামত করাইয়া দিতে বলিলেন। বাদসাহ বিস্মিত নয়নে দেখিলেন, সোপানগুলি এত বহুমূল্য মণি-রত্নাদিতে নির্ম্মিত যে, তাঁহার সমগ্র ধনভাণ্ডার ঢালিয়া দিলেও ভগ্ন সোপানটি মেরামত করিতে কুলাইবে না। বাদসাহ সন্ন্যাসীর এইপ্রকার অলৌকিক বিভূতি দর্শনে অতিশয় বিস্মিত, প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। আর কিছু উপরোধ করিতে সাহস পাইলেন না, কেবল তাঁহার অনুমতি লইয়া, শিষ্য যুবক রামতনুকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। উত্তরকালে রামতনু মিশ্র এক সুন্দরী যবনীর পাণিগ্রহণ করিয়া মিঞা তানসেন নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

গোয়ালিয়র সহরে এক তিন্তিড়ি বৃক্ষতলে তাঁহার সমাধি আছে। নানা-দেশীয় গায়কেরা তথায় যাইয়া সুকণ্ঠ হইবার আশায় সেই তেঁতুল গাছের পাতা চিবাইয়া থাকেন।

দশম পরিচ্ছেদ

রাধাবল্লভজী।

সাহারাণপুর পরগণার অন্তর্গত হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী দেববন নামক গ্রামে ব্যাস মিশ্র নামে একজন কাশ্যপ গোত্রীয় গৌর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম তারাদেবী। ব্যাস মিশ্র মথুরার নিকট-বর্ত্তী বাদগ্রামে দিল্লীর বাদসাহের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তথায় ১৫৩০ সম্বতে (১৪৭৩ খৃঃ) বৈশাখ মাসে শুক্লা একাদশী সোমবারে হরিবংশ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হরিবংশ রুক্মিণী নাম্নী এক বালিকার পাণিগ্রহণ করেন। হরিবংশের বনচন্দ্রজী, কৃষ্ণচন্দ্রজী ও গোপীনাথজী নামে তিনটি পুত্র ও সাহব দেবী নামে একটি কন্যা হইয়াছিল। তিনি পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া, ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, শ্রীরাধার আজ্ঞানুসারে, পত্নী পুত্র সকলকে ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথে চটথাবল নামক গ্রামে, দ্বিজ অনন্ত নামে একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে একরাত্রি বাস করেন।

দ্বিজ অনন্তের কৃষ্ণদাসী ও মনোহরী দাসী নামে দুইটি যুবতী অনূঢ়া কন্যা ছিল। তিনি আসিয়া হরিবংশ মিশ্রকে বলিলেন, "শ্রীরাধাঠাকুরাণী আমাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়াছেন যে, অদ্য তোমার বাটীতে যে অতিথি আসিয়াছে, তাহার সহিত তোমার কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিবে এবং তোমার



হিত হরিবংশ

গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ নামক ঠাকুরটিও তাহাকে যৌতুক দিবে।" হরিবংশ দেবাদেশ শুনিয়া অন্যথা করিতে পারিলেন না। পত্নীদ্বয় ও রাধাবল্লভ ঠাকুরটিকে লইয়া বৃন্দাবনে গেলেন এবং সংবৎ ১৫৬৫ কার্ত্তিক মাসে শ্রীবৃন্দাবনে পুরাতন সহরে মদনমোহনজীর বাটীর অল্পদূরে রাধাবল্লভজীর একটি মন্দির স্থাপন করিলেন। তাঁহার নরবাহন, নবল, ছবিলে গাহ, নাহর, স্থবিটল প্রভৃতি অনেকগুলি শিষ্য জুটিল। তিনি নিকুঞ্জবনে একটি উদ্যান স্থাপন করিয়াছিলেন। নিকুঞ্জবনের কথা পরে বলিব। তিনি গোবিন্দ ঘাটের নিকট রাসমণ্ডল নামে একটি বেদী করিয়া দিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বংশীবট নামক স্থান তিনিই প্রথমে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাঁর কৃষ্ণদাসী পত্নীর গর্ভে মোহনচাঁদ নামে একটি পুত্র হইয়াছিল। ১৬০৮ সংবতে (১৫৫১ খৃঃ) আশ্বিন মাসে ৭৮ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়। ইনি "রাধাসুধানিধি" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ এবং "সেবাসখিবাণী" প্রভৃতি কতকগুলি হিন্দী গ্রন্থ ও গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবনে রাধাবল্লভী নামে ইঁহাদের পৃথক্ সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা কিশোরী-ভজন ও কামসাধন-প্রণালী মতে দেবার্চ্চন করিয়া থাকেন। বোম্বাই, গুজরাট প্রভৃতি স্থানে এবং দিল্লী অঞ্চলে ইঁহাদের অনেক ধনী শিষ্য আছে। সুন্দরলাল নামে আকবর সাহের একজন খাজাঞ্চী বা মন্‌সবদার হরিবংশের শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে সুন্দরলাল, মানসিংহ-বিনির্ম্মিত গোবিন্দজীর মন্দিরের অনুকরণে তদপেক্ষা অনেক ছোট ও কারুকার্য্যহীন লাল পাথরে একটি সুন্দর মন্দির রাধাবল্লভজীর জন্য করিয়া দিয়াছিলেন। সেটিতে মূল মন্দির জগমোহন ও নাটমন্দির ছিল। মুসলমান উপদ্রবে মূল মন্দিরটি ভূমিসাৎ হইয়াছে। এখন কেবল জগমোহন ও নাটমন্দিরটি

অর্দ্ধ-ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। নাটমন্দিরের ভিতরদিকে মহিলাগণের বসিবার জন্য দোতালা বারান্দা আছে। বাহির দিকের বারান্দাগুলা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাধাবল্লভজী এখন ইহার পার্শ্ববর্ত্তী যে নূতন মন্দিরে রহিয়াছেন, সেটি দেখিতে আমাদের বাঙ্গালা দেশের ঠাকুর-দালানের মত, সম্মুখে প্রাঙ্গণ। গুজরাট-দেশীয় লল্লুভাই নামক একজন বণিক ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির করিয়া দিয়াছেন।

রাধাবল্লভজীর সহিত কোন রাধিকামূর্ত্তি নাই। সিংহাসনের উপর মুকুট স্থাপন করিয়া শ্রীরাধার উদ্দেশে সেবা চলে। ইঁহাদের সেবা-প্রণালীটা বৃন্দাবনের অপর অপর সম্প্রদায়ের সেবা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ইঁহারা অগ্রে শ্রীরাধাকে ভোগ দিয়া সেই প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করেন এবং শ্রীরাধার উদ্দেশে বসনভূষণাদি সমর্পণ করিয়া পরে তাহা রাধাবল্লভজীকে পরিধান করাইয়া থাকেন। শ্রীরাধার সপত্নী বলিয়া, তুলসীপত্র বা মুঞ্জরী ইঁহাদের মন্দিরে ভোগের উপর ন্যস্ত হয় না। ইঁহাদের মতে উপবাসাদি কৃচ্ছ্র সাধন করা অবৈধ। ইঁহাদের গোস্বামীরা এবং শিষ্যেরা সকলেই ভোগবিলাসে নিমগ্ন। "রাধাসুধানিধি" নামক গ্রন্থের একস্থানে রাধার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, "ত্বৎকেলিকুঞ্জ-ভবনাঙ্গনমার্জ্জনী স্যাম্"—সুতরাং ইঁহারাও যে শ্রীরাধার সখিভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। ব্রজবাসিগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় এবং প্রেমবিলাস ও ভক্তমাল নামক গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, হরিবংশ ঠাকুর পূর্ব্বে গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। গুরু ইঁহাকে একাদশীর দিবস তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে নিষেধ করেন। হরিবংশ শ্রীরাধার অনুমতিক্রমে পাণ খাইতেছি বলিয়া বার-বার গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন। সেই অপরাধে গুরু গোপাল ভট্ট, শিষ্য হরিবংশকে ত্যাগ করেন। তৎপরে হরিবংশ কতকগুলি চেলা



রাধাবল্লভজীর ঝুলন

জুটাইয়া রাধাবল্লভের নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ইহাঁরা "শিলালেখ" মূর্ত্তি (শ্রীরাধার নামাঙ্কিত পাষাণ-ফলক)ও পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে শ্রীকৃষ্ণ অনুকূল নায়ক, কেবলমাত্র শ্রীরাধার সহিত বিহার করিয়াছিলেন। অপর সকলে তাঁহাকে দক্ষিণ নায়ক, অর্থাৎ 'অনেক-নারী-পরিরম্ভণ-প্রিয়' বলিয়া থাকেন। ইহাঁরা বলেন, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম-খণ্ডে ১৫শ অধ্যায়ের বর্ণনামত ভাণ্ডীর বনে ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ দিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাঁদের মতে শ্রীরাধা স্বকীয়া নায়িকা। জয়দেবের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে তাহারই আভাষ দেওয়া হইয়াছে। বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণচরিত্রের ২য় ভাগে ১০ম পরিচ্ছেদ দেখুন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

যুগলকিশোরজী।

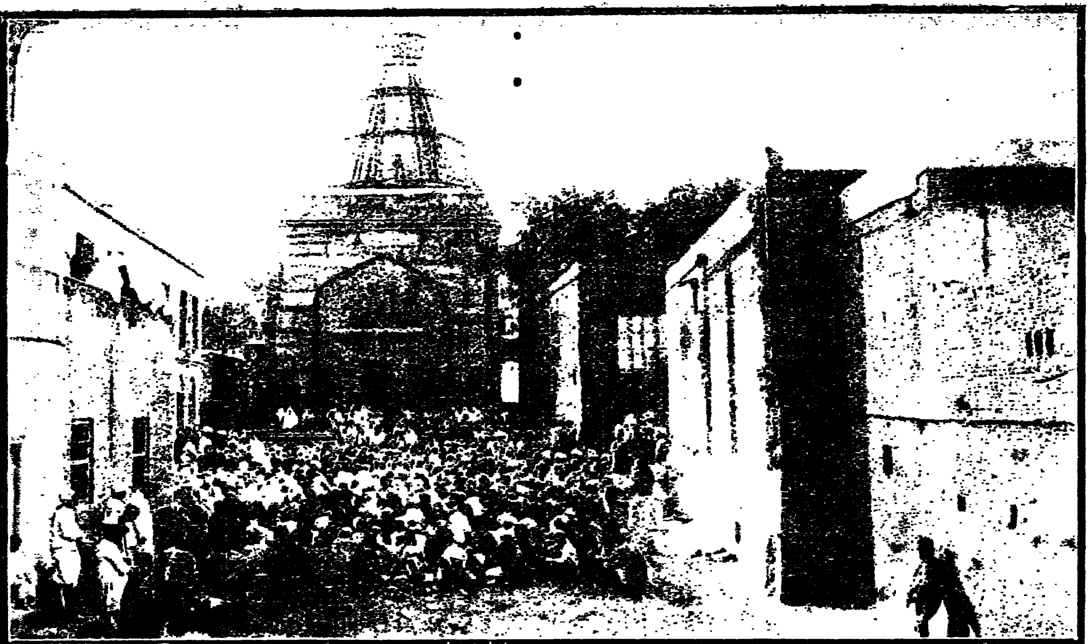
প্রথম যুগলকিশোর। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত ওঁড়ছা বা উর্চ্চা গ্রামে হরিরাম ব্যাস নামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীমাধব নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এক দিন বিবাহ উপলক্ষে তাঁহার বাটীতে ভোজের মহা আয়োজন হইলে, হরিরাম ঐ সমস্ত সুখাদ্য পক্বান্ন ও মিষ্টান্নাদি লইয়া ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদির সেবা নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে একদিন কতকগুলি হাড়ি, কোন মহোৎসব স্থান হইতে অন্ন লইয়া যাইতেছিল। ব্যাসজী জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, নিকটবর্ত্তী কোন

গ্রামে মহোৎসব হইয়াছিল। হরিরাম হাড়িগণের হাত হইতে একমুষ্টি বৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট অন্ন তুলিয়া লইয়া নিজে খাইলেন। এই সকল কারণে তাঁহার ভ্রাতা ও জ্ঞাতি সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিল। হরিরাম পত্নীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিলেন। একদিন বৃন্দাবনে অবস্থানকালে তিনি রাসলীলা যাত্রা শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে শ্রীরাধাবেশে সজ্জিত বালকের চরণ হইতে নূপুর ছিঁড়িয়া পড়িল। হরিরাম অবিলম্বে নিজ যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া, নূপুর গাঁথিয়া যথাস্থানে বাঁধিয়া দিলেন। তখন ইঁহার ভক্তি দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। ইঁহার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদিগকে বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া, পত্নীকে গৃহে যাইয়া বাস করিতে বারবার অনুরোধ করিলেন। পতিব্রতা ব্যাসপত্নী তাহা শুনিলেন না। তিনি পতিপার্শ্বে বনে পড়িয়া রহিলেন। ইহাঁর কিছুদিন পরে ব্যাসজীর সহিত কতকগুলি বৈষ্ণব একত্র ভোজন করিতে বসিয়াছিল, ইঁহার পত্নী পরিবেষণ করিতেছিলেন। দৈবাৎ দুগ্ধের সরখানা ব্যাসজীর পাতে পড়িয়া গেল। ইহাতে ব্যাসজী মহা-কুপিত হইয়া পত্নীকে ভর্ৎসনা করিয়া তাড়াইয়া দিতে চাহিলেন। পত্নী কিছু না বলিয়া, নিজ অঙ্গ হইতে দশ হাজার টাকার অলঙ্কার খুলিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া যুগলকিশোর নামে ঠাকুর এবং তাঁহার মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ মিটিয়া গেল। যুগল-কিশোরের সেই মন্দিরটী অতি পুরাতন। এই মন্দিরের উপরিভাগ গোলাকার গম্বুজের মত ইটে গাঁথা, সম্মুখের জগমোহন নাটমন্দির প্রভৃতি লাল পাথরে গাঁথা, সমস্তই ভগ্নদশায় পতিত রহিয়াছে। সম্মুখে একটি ছোট বাটীতে এখন ঠাকুরটিকে রাখা হইয়াছে। ইহাদের কিশোরবন বা ব্যাসজীকা ঘেরা নামে একটি উদ্যানও আছে। সেখানে হরিরাম

ও তৎপত্নীর সমাধি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, আকবর বাদশাহ ইহাঁর ভক্তি দেখিয়া বৃন্দাবনে বহু বিস্তৃত ভূমি দান করিয়াছিলেন। এখন সেগুলির অধিকাংশ হস্তান্তরিত হইয়াছে।

ব্যসজী ও তাঁহার পত্নীর বিরচিত অনেকগুলি বাণী বা পদগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে 'স্বধর্ম্মপদ্ধতি' নামক গ্রন্থ সমধিক প্রচলিত। মতান্তরে হরিরাম, যুগলকিশোর ঠাকুরটিকে কিশোরবনের মধ্যস্থ ইন্দারার (কূপ) ভিতর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুগলকিশোরকে কেহ কেহ নবল-কিশোর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় যুগলকিশোরজী—কেশীঘাটের পার্শ্বে একটী টীলা বা উচ্চস্থানের উপর ঝান্নাপান্না রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটী আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের গঠন মদন-মোহনজীর মন্দিরের মত। কেবল মন্দির-সংলগ্ন লাল পাথরের ফলকগুলির উপর তত কারুকার্য্য নাই। সেকালে যমুনার উপর নৌকা হইতে, উত্তরদিকে এই মন্দির, ও দক্ষিণদিকে মদন-মোহনজীর মন্দির, এই দুইটিকে বৃন্দাবনের দুইটি উচ্চশীর্ষ জয়স্তম্ভের (Tower) মত দেখাইত। এখন মন্দিরে ঠাকুর নাই। মন্দিরের ভিতরটা পূর্ব্বে গোশালারূপে ব্যবহৃত হইত; মিউনিসিপ্যালিটীর ব্যয়ে এখন মেরামত হইয়াছে। মূল মন্দির ও 'জগমোহন' এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ফটক ও নাটমন্দির প্রভৃতি অন্তর্হিত, তাহাদের চিহ্ন সকল আজিও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের ভিত্তি-গাত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। জগমোহনের দ্বারের উপর একটি কারুকার্য্য-খচিত পরম সুন্দর গো-গোপ-গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি—বামকরে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।



যুগলকিশোরজীর মন্দির সম্মুখে ভাগবত পাঠ হইতেছে

কেহ কেহ অনুমান করেন, রায় সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৌহান-বংশীয় ঠাকুর নোন্‌করণ সিংহ ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছিলেন।

জগমোহনের দ্বারের পার্শ্বে একটি 'লেখ' আছে। তাহা হইতে আমরা কেবল "সংবৎ ১৬৮৪ বর্ষে শ্রাবণ বদি দশমী" পড়িতে পারিলাম। অবশিষ্ট অক্ষরগুলি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, কিছুই বুঝা গেল না। এই মন্দিরের পার্শ্বে একটি একতলা গৃহে যুগলকিশোর নামে নূতন রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি এবং একখানি এক হাত লম্বা পাথরের গায়ে শিশু কৃষ্ণ একটি ঘোড়ার কেশ আকর্ষণ করিতেছেন, অঙ্কিত আছে। এ ঠাকুরটির নাম কেশীমর্দ্দন। তৎসঙ্গে একটি বৃহৎ শালগ্রামও আছেন। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের ভগ্ন খণ্ডসকল পড়িয়া আছে। আরঙ্গজেবের উপদ্রবে আদি যুগলকিশোর ঠাকুরটি ঝান্না পান্না রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠাদির বিবরণ বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

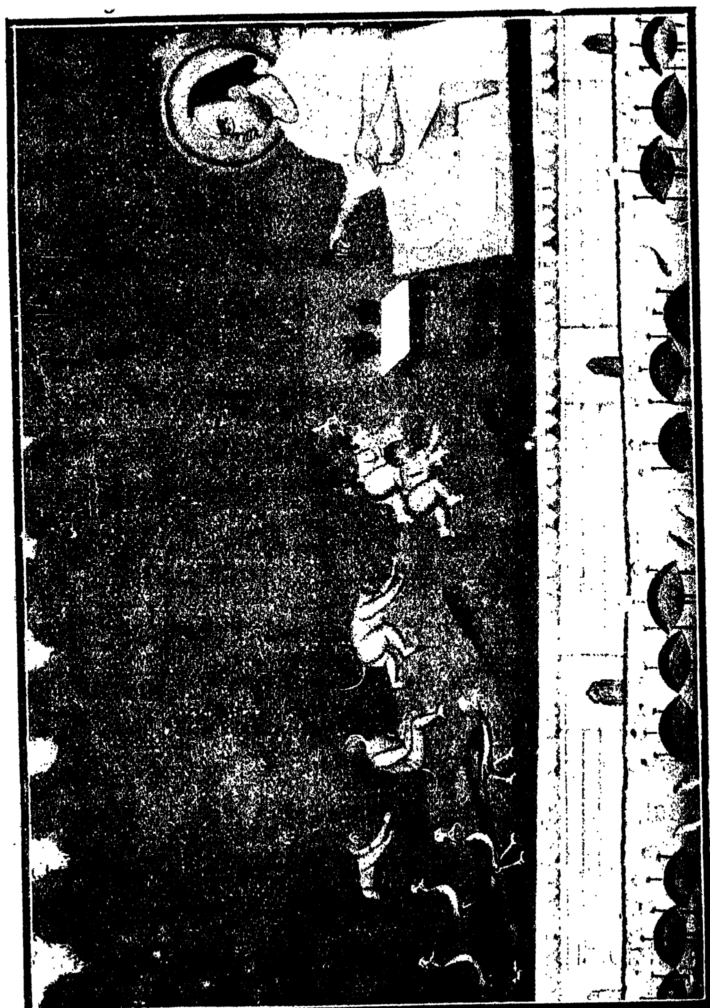
তৃতীয় যুগলবিহারী—ইহাঁর মন্দিরটিও দেখিতে প্রায় মদনমোহনের মন্দিরের সদৃশ এবং তাহারই নিকটস্থ; কিন্তু উচ্চতায় তাহার অর্দ্ধেকও হইবে না। জয়পুরের অন্তর্গত নিমকা থানা গ্রাম-নিবাসী তোমর-বংশীয় রাজপুত, হরিদাস ঠাকুর ও গোবিন্দদাস ঠাকুর নামক দুই ভ্রাতা এই মন্দিরটি আকবরের রাজত্বের সময়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থান-টিকে নির্জ্জন দেখিয়া, মীরাবাই বৃন্দাবনে আসিয়া এই মন্দিরেই পূজা করিতেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বল্লভাচার্য্য ও মীরা বাই।

বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত তৈলঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, লক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র বল্লভাচার্য্য বারাণসী-সন্নিহিত চম্পকারণ্যে (অন্যমতে রায়পুর জেলার অন্তর্গত রাজম্ গ্রামে) ১৪৭৯ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে পিতার মৃত্যু হইলে, বল্লভ ভট্ট সাহিত্য ব্যাকরণাদি পাঠ সমাপ্ত করিয়া, কাশীতে যাইয়া দর্শন ও ভক্তি শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে তীর্থ ও দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া দাক্ষিণাত্যের বহু বিদ্যাপীঠ তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তথাকার শাঙ্কর অদ্বৈতবাদ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের খণ্ডন করিয়া, নিজ সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ মত প্রচার করেন। পুরীধামের রাজা প্রতাপরুদ্র যেমন চৈতন্যদেবের শিষ্য, বল্লভাচার্য্যের মাতুলালয় বিদ্যা বা বিজয় নগরের রাজা কৃষ্ণদেবও তেমনি ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্য হইয়াছিলেন। ২৮ বৎসর বয়সে ইনি গৃহে ফিরিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলেন। ১৫১১ খ্রীঃ অঃ ইঁহার ১ম পুত্র গোপীনাথ ও ১৫১৬ খ্রীঃ অঃ ইঁহার ২য় পুত্র বিট্‌ঠলনাথের জন্ম হয়। ইঁহার ভক্তগণের বিশ্বাস—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে মথুরার পরপারে গোকুল গ্রামে মঠস্থাপন করেন। একদা স্নানকালে বাল-মুকুন্দ নামক ঠাকুরটী ইঁহার যজ্ঞসূত্রে জড়াইয়া যমুনা-জল-মধ্য হইতে প্রকট হইলেন। তখন কাশী, আউলীল বা অড়েল, চূণার প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মঠ ছিল। ইনি অধিকাংশ সময় গোকুলে থাকিতেন, কখন কখন অন্য মঠেও যাইতেন।

এখন ইঁহাদের মথুরা, গোকুল, কাম্যবন, বারাণসী, সুরাট, কোটা ও নাথদ্বারে ৭টী প্রধান মঠ হইয়াছে। আজি কালি নাথদ্বারের শ্রীনাথজীর মঠ ধন-রত্ন-সম্পত্তি-বলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। বল্লভকুলের গোস্বামীরাই মথুরা অঞ্চলে সাতিশয় ধনশালী। ইঁহারা বাৎসল্যভাবে বালকৃষ্ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মতে সংযম, ব্রত ও নিয়মাদি দ্বারা শরীর শোষণ করা অকর্ত্তব্য। সকল প্রকার ভোগবিলাসের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও সাধনা চলে। গুরু ও কৃষ্ণে অভেদ জ্ঞান করিয়া গুরুকে তনু, মন ও ধন দান করাই ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, চৈতন্যদেবের সহিত বল্লভ ভট্টের দুইবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল—১ম চৈতন্যদেব যখন প্রয়াগে ছিলেন, তখন বল্লভ ভট্ট পরপারে আউলী গ্রামে নিজগৃহে তাঁহাকে লইয়া গিয়া পরম সমাদরে তাঁহার আতিথ্য-সৎকার করেন। ২য়—বল্লভাচার্য্য পুরীধামে যাইয়া নিজ-রচিত ভাগবতের টীকা দেখাইলে, চৈতন্যদেব, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যার বিরোধী দেখিয়া ইহাকে উপহাস করেন এবং সাধারণে তাহা গ্রহণ করিবে না বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইঁহার কথা যেরূপ উপেক্ষাভাবে লিখিয়াছেন, বাস্তবিক ইনি সে দরের লোক ছিলেন না। বম্বাই, গুজরাট, রাজপুতনা, মথুরা, কাশী প্রভৃতি স্থানের লোকেরা বল্লভাচার্য্যকেই মহাপ্রভু বলিয়া অর্চ্চনা করেন। কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট, ইঁহার ততটা প্রতিপত্তি নাই। খাস বৃন্দাবনেও বল্লভকুলের প্রাধান্য বা মন্দিরাদি বিরল। ৫২ বৎসর বয়সে (১৫৩১ খ্রীঃ) বল্লভাচার্য্য কাশীর হনুমান ঘাটে গঙ্গাজলে প্রবিষ্ট হইয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হন; তৎকালে জলমধ্য হইতে একটি জ্যোতি উঠিয়া আকাশে মিশাইয়া গিয়াছিল বলিয়া জনরব আছে। ইনি তত্ত্বার্থ-



দীপ-নিবন্ধ, অনুভাষ্য, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, সুবোধিনী, পূর্ব্বমীমাংসা ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্য ও টীকাগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

"বল্লভ-দিগ্‌বিজয়" নামক হিন্দী পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে—যে বৎসর বল্লভাচার্য্যের জন্ম হয় (১৪৭৯ খ্রীঃ) সেই বৎসর মাধবেন্দ্রপুরী গোবর্দ্ধন-কন্দরা হইতে গোবর্দ্ধন-নাথ নামক বিগ্রহ আবিষ্কার করেন। বল্লভাচার্য্য তাঁহার শিষ্যরূপে সেবাধিকারী হইয়া ১৫২০ খৃষ্টাব্দে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরে একটি মন্দির করিয়া দিয়াছিলেন। বল্লভের পরলোক-প্রাপ্তি হইলে প্রথমে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পরে কনিষ্ঠ পুত্র বিট্‌ঠলনাথ ও তদ্বংশীয়েরাই সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। আরঙ্গজেবের উপদ্রব সময়ে (১৬৬৮ খ্রীঃ) রাণা রাজসিংহের রাজধানী উদয়পুরে ঠাকুর লইয়া যাওয়া হইতেছিল। পথিমধ্যে উদয়পুরের সিহাড়গ্রামে রথচক্র আট্‌কাইয়া গেল। ঠাকুরের সেই স্থানে থাকিবার ইচ্ছা হইয়াছে মনে করিয়া, সেই স্থানে মহারাণার ব্যয়ে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হইল। মহারাণা রাজসিংহ সপরিবারে বিট্‌ঠল-নাথের বংশীয় দামোদর নামক তৎকালীন সেবাইতের নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন ও সিহাড় গ্রামখানি ঠাকুরকে ভেট দিলেন। তদবধি গোবর্দ্ধননাথ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীনাথজী-নাথ হইল। সিহাড় গ্রামও এখন নাথদ্বার নাম ধারণ করিয়াছে।

মীরাবাই।

যে সময়ে গৌড়ীয় রূপ-সনাতন প্রভৃতি বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবনে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে বল্লভাচার্য্য অথবা তাঁহার শিষ্যেরা বোম্বাই, গুজরাট, রাজপুতনা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া তথাকার শৈব ও শাক্ত অধিবাসিগণকে নবীন বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিতে-

ছিলেন। রাজপুতনার মেরতা নামক গ্রামের ভূস্বামী বা রাজা রতনসিংহ তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন।

মীরা নামে রাজার একটী পঞ্চমবর্ষীয়া রূপবতী তনয়া ছিল। সেও পিতামাতার দেখাদেখি শিশুকণ্ঠে মধুর-স্বরে বৈষ্ণব পদগুলি গাহিতে শিখিয়াছিল। একদিন রাজবাটীর সম্মুখ দিয়া বাদ্যধ্বনিতে দিক্ মুখরিত করিয়া মহা সমারোহে একটি বর বিবাহ করিতে যাইতেছিল। কন্যা তাহা দেখিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা ও কি যাইতেছে?" পিতা বলিলেন, "দুলাহ (বর) যাইতেছে।" বালিকা আব্দার ধরিল, "আমিও দুলা লইব।" পিতা তাহাকে একটী নবনির্ম্মিত কৃষ্ণমূর্ত্তি দিয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার দুলা।" বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "দুলাকে লইয়া কি করিতে হয়?" পিতা উপদেশ দিলেন, দুলাকে বসন, ভূষণ ও মাল্য-চন্দনে সাজাইয়া উত্তম উত্তম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ দিতে হয়। বালিকা মীরা পিতার শিক্ষামত এই কৃষ্ণমূর্ত্তিটিকে বিচিত্র বেশভূষা পরাইল; আপনার খাদ্য অগ্রে ইঁহাকে নিবেদন করিয়া আপনি প্রসাদ খাইতে লাগিল।

মীরা এইরূপে শিশুকাল হইতেই বৈষ্ণব-ধর্ম্মাচরণে অভ্যস্তা হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বাটীতে অনেক বৈষ্ণব আসিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা-পদ গান করিতেন। তাঁহাদের নিকট মীরা সঙ্গীত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তিরও উন্মেষ হইল।

মীরার অনুপম রূপমাধুরী ও অমৃতনিস্যন্দিনী সঙ্গীতশক্তির কথা ক্রমে চারিদিকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, মেওয়ারের রাণার সহিত তাঁহার পরিণয় হইয়া গেল। বৈষ্ণব গ্রন্থে কোন্ রাণার সহিত বিবাহ হইল, তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। ইনি শিবিকার ভিতর করিয়া গিরিধারী নামক আবাল্য-পূজিত কৃষ্ণমূর্ত্তিটী সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয়ে গেলেন। ইঁহার শ্বশুরকুলে প্রায় সকলেই শক্তি-উপাসক।

শ্বাশুড়ী বধূ-বরণ করিতে আসিয়া মীরার ক্রোড়ে কৃষ্ণমূর্ত্তিকে দেখিয়া বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া তাঁহাদের কুলদেবতা কালিকাদেবীর মন্দিরে যাইয়া বধূকে প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন। নববধূ এক পদও অগ্রসর হইলেন না, বা নিজ ঠাকুরটিও ফেলিয়া দিলেন না। কাযেই প্রথম দর্শনের দিন হইতেই শ্বাশুড়ীর সহিত তাঁহার মনান্তর হইল এবং যে বধূ তাঁহাদের কুলদেবতা কালিকাকে পূজা ও ভক্তি করিতে অসম্মতা, তাঁহাকে তাঁহারা নিজ গৃহে লইতে সম্মত হইলেন না। প্রথম দিন হইতেই নববধূর জন্য প্রাসাদের বহির্দ্দেশে স্বতন্ত্র ভবন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মীরা সেই ভবনে থাকিয়াই স্বীয় অভীষ্টদেব গিরিধারীর নির্ব্বিঘ্নে সেবা করিতে লাগিলেন। মাতার কথার অবমাননা জন্য রাণাও পত্নীর মুখদর্শন করিতেন না; কেবল দাস-দাসীরা আসিয়া যথাসময়ে তাঁহার আহারাদি দিয়া যাইত।

মীরা প্রতিদিন নির্জ্জনে আবাল্য-অভ্যাস-মত অগ্রে আপন আহার্য্য ঠাকুরকে ভোগ দিয়া পরে বৈষ্ণব ও অতিথিগণকে খাওয়াইয়া, শেষে যাহা থাকিত, আপনি আহার করিতেন। যথাসময়ে ঠাকুরের আরতি করিয়া ও তাঁহার সমক্ষে ভজনগান গাহিয়া প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রহরীরা আসিয়া রাণাকে জানাইল যে, রজনীকালে রুদ্ধদ্বার গৃহে মীরা কাহার সহিত হাস্য-পরিহাস, গীতবাদ্য ও অক্ষক্রীড়া করিতেছেন, এরূপ শব্দ পাওয়া যায়; অথচ বাহিরের কোন লোককে তাহারা ভিতরে যাইতে দেয় না। রাণা এক রাত্রিতে গুপ্তভাবে মীরার গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মীরা গীত গাহিতেছেন ও যেন কাহার সহিত পাশা খেলিতেছেন; অথচ দ্বিতীয় লোক কেহ তথায় নাই। রাণা সক্রোধে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কাহার সহিত পাশা খেলিতেছিলি?"

মীরা উত্তর দিলেন, "আমার স্বামীর সহিত।" রাণা মীরাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তোর আবার অন্য কোন্ স্বামী আছে?" মীরা হাসিতে হাসিতে নিম্ন লিখিত গানটি গাহিলেন—

মেরে গিরিধর গোপাল দুসরা না কোই।
যাকে শির মৌরমুকুট মেরে পতি সোই॥
কৌস্তুভ মণিকণ্ঠ পদিকণ্ঠ উরসি দেশ জোই।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কণ্ঠমাল সোই॥
মৈ তো আয়ি ভক্তি জানি যুক্তি দেখি মোই।
আঁসুআন জল সিঁচি-সিঁচি প্রেমবীজ বোই॥
সাধুন্ সঙ্গ বৈঠি বৈঠি লোকলাজ খোই।
অব তো বাত ফয়ল গৈ জানে সব কোই॥
প্রেম কি মথানি মথি যুক্তিসে বিলোই।
মাখন ঘৃত কাঢ়ি লেত ছাঁছ পিয়ে কোই॥
রাজন ঘর্ জন্ম লেত সবে বাত হোই।
মীরা প্রভু লগন লগী হোনী হো সো হোই॥

৺অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উপরি-উক্ত শ্লোকের এইরূপ অর্থ দিয়াছেন—

"গিরিধর গোপালই আমার, দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূর-মুকুট, তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তুভ মণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমি তো ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি; যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেম-বীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোকলজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন তো কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেমরূপ মন্থন দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক

মন্থন করিয়া আমি মাখন ঘৃত বাহির করিয়া লইতেছি, যে হয় কেহ ঘোল থাক্। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করাতে সকল সুখ-সম্ভোগই হইতে পারে; কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে। ইহাতে যা' হবার তা' হউক।"

রাণা পত্নীর এইরূপ নির্ভীক অথচ অবিচল ভক্তিমাখা কথা শুনিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও ভীত হইলেন এবং মীরার প্রার্থনা-মত বৈষ্ণব ও অতিথি-সেবার অধিকতর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

মীরা তদবধি বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, নানা সামগ্রী আনাইয়া ঠাকুরটীর রাজভোগে সেবা করিতে লাগিলেন। একদিন পুরবাসিনী কতকগুলি মহিলা আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ অর্থব্যয়সাধ্য বিলাস-পরিপূর্ণ সেবা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি যদি বৈষ্ণবী হইয়াই থাকেন, তবে এত বেশভূষার ঘটা কেন? উদাসিনী সন্ন্যাসিনীদিগের মত কৃষ্ণ-সাধন করিলেই ত হয়। ইহাতে মীরা তাঁহাদের কথার উত্তর স্বরূপ এই পদটী গাহিয়াছিলেন।

নিত্ নাহানেসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোই।
ফল মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুর বাঁদরাই॥
তিরণ ভখনকে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়্কে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হেয় খোজা॥
দুধ পিকে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেম্‌সে না মিলে নন্দলালা॥

কিন্তু ইহাতেও রাণার মনের মালিন্য ঘুচিল না। তিনি একদিন একজন তরুণবয়স্ক মনোহর-দেহ বয়স্যকে বৈষ্ণব-বেশে সাজাইয়া মীরার গৃহে আতিথ্যলাভের জন্য পাঠাইলেন। সে আসিয়া, মীরাকে বলিল যে, বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণ মীরাকে 'অঙ্গসুখ' দিবার জন্য তাহাকে এখানে

পাঠাইয়া দিয়াছেন। মীরা তাহাকে পরদিন মধ্যাহ্নকালে আসিতে বলিলেন। পরদিন সে আসিয়া দেখিল যে, প্রাঙ্গণের চারিদিকে বৈরাগী, কাঙ্গালী প্রভৃতি ভোজন করিতে বসিয়াছে, মধ্যস্থানে মীরা একখানি পালঙ্কের উপর সুসজ্জিত বেশে বসিয়া তাঁহাদের ভোজনের তত্ত্বাবধান করিতেছেন। সে কম্পিত-হৃদয়ে নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, মীরা সমবেত বৈষ্ণবমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই লোক আসিয়া আমাকে বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বৈকুণ্ঠধাম হইতে আমাকে অঙ্গসুখ দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমিও আপনাদের সম্মতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা পালন করিতে প্রস্তুত আছি।" এই কথা শুনিবামাত্র সমবেত জনমণ্ডলী আহার পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া সেই লোকটাকে প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। কেবল মীরার অনুরোধে তাহার প্রাণটা রহিয়া গেল।

জনরব আরও বলে যে, রাণার আজ্ঞায়, নিজ পবিত্র চরিত্র পরীক্ষা দিবার সময়, মীরা সর্ব্বজন-সমক্ষে কালসর্প-পূরিত পেট্‌রার ভিতর হইতে অনাবৃত হস্তে একটা চন্দন-চর্চ্চিত শালগ্রাম-শিলা বাহির করিয়াছিলেন। দর্শকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, সর্প টা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

মীরার অপূর্ব্ব ভক্তি ও অনন্যসাধারণ গীত-শক্তির কথা দেশবিদেশে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আকবর বাদশাহ ইহাঁর মুখে সঙ্গীত শুনিবার জন্য তাঁহার প্রিয় গায়ক তানসেনকে সঙ্গে লইয়া ইঁহাদের গৃহে ছদ্ম বৈষ্ণব-বেশে অতিথি হইয়াছিলেন। মীরার মুখে সুমিষ্ট ভগবৎ-পদলহরী শুনিয়া পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার হস্তে একছড়া বহুমূল্য মুক্তার হার দিয়া, উহা দেবতার গলদেশে বিলম্বিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মীরা হার দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ছদ্মবেশী আকবরকে তিনি সাধু বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আকার দেখিয়া

তোমাকে ত ধনী বলিয়া মনে হইতেছে না।" ছদ্মবেশী সাধু বলিলেন, "আমি পূর্ব্বে একজন সওদাগর ছিলাম, নানা দৈব দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া এক্ষণে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। আমার পূর্ব্ব-অর্জ্জিত অর্থ হইতে এই মালা কিনিয়াছিলাম। এখন সন্ন্যাসী হইয়া আর এই মালায় আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনার ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলে এই মালার সমুচিত ব্যবহার হইবে এবং আমিও দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব।"

মীরা সন্ন্যাসীর এইরূপ দেবভক্তি দেখিয়া আনন্দিত মনে ও সরল বিশ্বাসে সেই মালাগাছটী লইয়া ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন। বাদশাহ ঠাকুরকে হিন্দুভাবে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

এই মালা-গ্রহণ উপলক্ষেই মীরার জীবনে একটী বিষম পরিবর্ত্তন ঘটিল। লোকমুখে এই সংবাদ রাণার কর্ণে গেল। লোকরসনা কত অলীক কুৎসা রটাইল। রাণা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, নিরপ-রাধা মীরাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিতা করিয়া দিলেন।*

মীরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা বা বিচলিতা হইলেন না। যিনি ভগবানের অভয় চরণে আশৈশব ধন-জন মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন,

---

* কলিকাতা হইতে ৬০৬ মাইল দূরে বিন্দকি রোড নামে একটি ষ্টেশন আছে। এই ষ্টেশন হইতে ২ মাইল অন্তরে গঙ্গাতীরে একটি মন্দিরের ভিতর, বাম-কর উর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া কৃষ্ণ-প্রস্তরের গিরিধারী গোপাল মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছেন। তথাকার পূজারীরা বলেন যে, এই মূর্ত্তিটিকে মীরাবাই পূজা করিতেন। মহারাণা রোষবশে মীরাকে বিষপান করিতে দিলে, দেবানুগ্রহে তাহাতেও কোনরূপ বিষ-ক্রিয়া হইল না দেখিয়া, একাকিনী গৃহবহিষ্কৃতা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি চলিয়া গেলে পূজারীরা গিরিধারী ঠাকুর লইয়া বারাণসীতে পলাইয়া যাইতেছিলেন, পথি-মধ্যে তথাকার ভূস্বামী বা জমিদার ভক্তিবশে এইখানে ঠাকুরের মন্দির করিয়া দিয়া সেবার জন্য গ্রাম দান করিয়াছেন মন্দিরটি এখন কিন্তু ভগ্নপ্রায়।

তাঁহার আবার কিসের ভয়? মীরা কতকগুলি রাজপুত-নরনারীকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহারা সকলেই মীরার অনুগমন করিল। মীরা প্রফুল্লমুখে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাভূমি বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তথায় অবস্থানকালে একদিন তিনি—

কহি পাঠাইল শ্রীরূপেরে কার দ্বারে।
দরশন করি যদি কৃপা করে মোরে ॥
গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ ॥
এ কথা শুনিয়া বাই ক্ষোভ পাই মনে।
পুন কহি পাঠাইল গোসাঞির স্থানে ॥
এতদিন শুনি নাই শ্রীমন্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে ॥

(ভক্তমাল গ্রন্থ)

রূপগোস্বামী মীরার এই তেজোগর্ভ শ্লেষবাক্য শুনিয়া নিজ নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং পরস্পর রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

একদা তীর্থ-পর্য্যটন-কালে তুলসীদাসের সহিত মীরার সাক্ষাৎ হইলে মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, স্বামী-পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোনরূপ অপরাধিনী হইয়াছেন কি না? তুলসীদাস হাসিয়া উত্তর দিলেন ;—

ত্যজো প্রহ্লাদ পিতা, বিভীষণ ভ্রাতা, ভরত মাহতারী।
বলি গুরু ত্যজো, কান্ত ব্রজবনিতা, ভয়ে সব মঙ্গলকারী ॥

অর্থ—ভগবানের জন্য প্রহ্লাদ পিতাকে, বিভীষণ ভ্রাতাকে, ভরত মাতাকে, বলি গুরুকে ও ব্রজ-বনিতারা পতিকে ত্যাগ করিয়াছিল ; ইহাতে তাহাদের মঙ্গলই ঘটিয়াছে।



মোরছল-হস্তে সন্ন্যাসিনী মীরা

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

কয়েক বৎসর বৃন্দাবনে কাটাইয়া মীরা শ্রীকৃষ্ণের উত্তর-লীলাস্থলী দ্বারকায় চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, তিনি যখন যেখানে যাইতেন, তাঁহার গিরিধর বা রণছোড় ঠাকুরটীকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। দ্বারকায় যাইয়া মীরা একটী মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অনেকগুলি শিষ্য সেবক হইয়াছিল।

রামচন্দ্র যেমন বিশুদ্ধচরিত্রা সীতাদেবীকে বনবাস দিয়াছিলেন এবং পরে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, রাণাও তেমনই মীরার অলৌকিক চরিত্রের খ্যাতি শুনিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। মীরা তখন বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বিদায়ের জন্য রণছোড়জীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। মন্দিরদ্বারে শিবিকা অপেক্ষা করিতেছিল। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, বাহক ও প্রহরীরা বলপূর্ব্বক মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিল যে, মীরা তথায় নাই, তাঁহার বস্ত্রালঙ্কার সমস্তই রণছোড়জীর গাত্রে সুশোভিত রহিয়াছে। পূজারীরা সকলে বলিল যে, মীরার নশ্বর দেহ দেব-অঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

এই অলৌকিক ঘটনার পর হইতে উদয়পুরে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে রণছোড়জীর সহিত মীরার পরিণয়-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের পূজাও চলে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মীরা বাইয়ের নামে ভণিতা দেওয়া অনেক দোঁহা গীত শুনিতে পাওয়া যায়। জনরবে শুনিলাম যে, মীরা বাইয়ের নামে একটি সম্প্রদায় আছে। আমরা বাঙ্গালা ভক্তমাল,হিন্দী ভক্তকল্পদ্রুম ও গোস্বামি-গণের মুখে যেরূপ আখ্যান জ্ঞাত হইয়াছি,তাহাই পাঠকগণকে শুনাইলাম, বৈষ্ণবগণের গ্রন্থে, মীরা কোন্ রাণার মহিষীছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ নাই।

প্রায় সার্দ্ধ দুইশত বৎসর পরে, ভাট ও চারণগণের মুখে শুনিয়া টড্ সাহেব (Mr James Tod) তাঁহার রচিত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে, মীরা বাই রাণা কুম্ভের মহিষী ছিলেন ও তাঁহার নিকট হইতে কবিত্ব ও সঙ্গীত-শক্তি লাভ করেন। রাণা কুম্ভ ১৪১৯ খৃঃ অব্দে রাজা হন; সুতরাং এ সময়ের সহিত রূপগোস্বামী বা বল্লভাচার্য্যের সময়ের সামঞ্জস্য হয় না। মীরা বাইয়ের স্বদেশীয় ভাষায়, যোধপুর-নিবাসী মুন্‌সি দেবপ্রসাদের লিখিত "মীরাবাই কা চরিত্র" নামক পুস্তকে এবং "চতুর কুল চরিত্র" নামক রাঠোর-ক্ষত্রিয়গণের মেরতা শাখার বৃত্তান্ত গ্রন্থে আমরা নিম্নলিখিত বিবরণ পাইতেছি,—

উদয়পুরের অন্তর্গত মেরতা নামক প্রদেশের অধিপতি রাও দুদাজীর চতুর্থ পুত্র রতনসিংহের কন্যার নাম মীরা বাই। সম্বৎ ১৫৫৫ (১৪৯৮ খৃঃ অঃ) ইঁহার জন্ম। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া, পিতামহ দুদাজীর ক্রোড়ে পালিতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। রাণাসঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সহিত ১৫৭৩ সম্বতে (খৃঃ অঃ ১৫১৮) ১৮ বৎসর বয়সে মীরার পরিণয় হয়। বিধাতার বিড়ম্বনায়, বিবাহের স্বল্পকাল পরে অভাগিনী মীরা বিধবা হইয়াছিলেন। তদবধি একান্ত নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে ভগবদুপাসনায় নিশিদিন যাপন করিতেন। ১৫৮৪ সম্বতে মীরার পিতা রতনসিংহ ও শ্বশুর রাণাসঙ্গের পরলোক-প্রাপ্তি হয়। মীরার তৃতীয় দেবর রত্নসিংহ ৪।৫ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া যুদ্ধে নিহত হন। ইঁহার পর অবিমৃশ্যকারী উদ্ধতস্বভাব বিক্রমাদিত্য রাণার সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য অতিশয় বিশৃঙ্খল-চরিত্রের লোক ছিলেন; মীরার প্রতি অমানুষিক দুর্ব্ব্যবহার ও নিদারুণ পীড়ন করিতেন। এমন কি বিষ-প্রয়োগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এই সকল সংবাদ শুনিয়া মীরার পিতৃব্য বিরামদেব তাহাকে

মেরতা গ্রামে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া যত্নে রাখেন। কিছুদিন পরে যোধপুরের রাজা রাওমল বলপূর্ব্বক মেরতা গ্রাম অধিকার করিয়া লইলে, অনাথিনী মীরা শ্বশুর ও পিতৃ-গৃহ নষ্ট হইল দেখিয়া, মনোদুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইলেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, কিছু দিন বৃন্দাবনে থাকিয়া অবশেষে দ্বারকায় যাইয়া শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন। এদিকে রাণা উদয়সিংহের সাহায্যে মীরার পিতৃব্য বিরামদেব মেরতা নগর পুনরধিকার করেন। উদয়সিংহ ও বিক্রমদেব মীরার পুণ্যময় চরিত-কথা লোকমুখে শুনিয়া তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মীরা আর মুক্তিক্ষেত্র দ্বারকা ত্যাগ করিয়া আইসেন নাই। তথায় ১৬০৩ সম্বতে (১৫৪৬ খৃঃ অঃ) ৪৮ বৎসর বয়সে মীরার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়।

আকবর সাহ ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎপূর্ব্বেই মীরার তিরোধান ঘটে। সুতরাং উভয়ের সাক্ষাৎ অসম্ভব। প্রতি-বৎসর জন্মাষ্টমীর সময় এক ছড়া গজমুক্তার মালা দিয়া নাথদ্বারে শ্রীনাথ-জীর কণ্ঠ বিভূষিত করা হয়। পূজারীরা বলেন যে, বিট্‌ঠল-নাথের সময়ে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতোপরে আকবর বাদসাহ সেই সুবৃহৎ মুক্তামালা ঠাকুরকে উপহার দিয়াছিলেন। হয় ত কিম্বদন্তী মুখে সেই মালা-দানের আখ্যান মীরা বাইয়ের নামের সহিত বিজড়িত হইয়া থাকিবে।

মীরার নাম বৃন্দাবনে সকলেই জানেন; কিন্তু তিনি কোন্ কুঞ্জে বা বাটীতে অবস্থান করিতেন, তাহা কেহই বলিতে পারিলেন না। দুই একজন বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম যে, মীরাবাই রাজপুতগণ-প্রতিষ্ঠিত যমুনাতীরস্থ যুগলবিহারীজী-মন্দিরে পূজা করিতে আসিতেন। তাঁহার নিজ ঠাকুর রণছোড়জী কখনও এখানে স্থাপিত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা গেল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

সূরদাস।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দী কবিগণের এই প্রশংসা-পদটী প্রচলিত আছে—

স্থর স্থরজ, তুলসী শশী, উরগণ কেশব দাস।
অবকে কব্ সব খদ্যোতসম্ যাঁহা তাঁহা করত প্রকাশ॥

ইহার অর্থ—"স্থর (স্থরদাস) সূর্য্যের ন্যায়, তুলসীদাস চন্দ্রের ন্যায়, কেশবদাস তারাগণের ন্যায় মনোহর। আধুনিক কবিরা জোনাকি পোকার মত যথায় তথায় প্রকাশিত।" কিন্তু একই সময়ে স্থরদাস নামে দুই জন কবি বৃন্দাবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং উভয়েই গায়ক, সাধক ও মদনমোহনজীর ভক্ত ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থেও দুই জনের নাম স্থরদাস বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজন অন্ধ ছিলেন বলিয়া 'অন্ধ স্থরদাস', অপরের নাম স্থরদাস মদনমোহন। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের মুখে শুনিলাম যে, উপরিউক্ত কবিতাটী অন্ধ স্থরদাসকে লক্ষ্য করিয়াই বিরচিত হইয়াছিল। ইঁহার জীবনী অনেকেই জানেন না। ভক্তমালেও ইনি কেবল 'পরম রসিক কৃষ্ণনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রত সাধু' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইনি—

অষ্টাদশ সিদ্ধি যেহ উপেক্ষা করিল।
চারি মুক্তি আদি চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিল॥

এইটুকু মাত্র পরিচয় পাই। পরে আমরা "সঙ্গীতসুধাসিন্ধু" নামক গ্রন্থ হইতে ইঁহার যেরূপ জীবনী পাইয়াছি, তাহাই দিতেছি।

ব্রহ্মরাও নামক যতি-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকের বংশে "পৃথ্বিরাজা

রাসো”-রচয়িতা বিখ্যাত চাঁদ কবি জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ পৃথ্বিরাজ ১১৯০ খৃষ্টাব্দে কবিকে জুয়ালা নামে একখানা গ্রাম দান করিয়াছিলেন। চাঁদ কবির চারিটি পুত্র ছিল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম গুণচন্দ্র। গুণচন্দ্রের পুত্র শীলচন্দ্র, তৎপুত্র বীরচন্দ্র—রামথাম্ভারের মহারাজ হামীরের সভাসদ হইয়াছিলেন। ইনি পাশাখেলায় বড় সুনিপুণ ছিলেন। আলাউদ্দীন খিলীজীর সহিত যুদ্ধে মহারাজ হামীর নিহত হইলে বীরচন্দ্রের পুত্র হরিচন্দ্র আগরায় বাস করিলেন। হরিচন্দ্রের পুত্র রামচন্দ্র সঙ্গীতবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া বাবারাম নামে খ্যাত হন। বাবারাম প্রথমে ইস্লাম সাহার এবং পরে আকবরের অভিভাবক বায়রাম খাঁর সভায় গায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কিছুদিন লক্ষ্ণৌ ও কিছুদিন গোপচাল গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার সঙ্গীতবিদ্যায় পাণ্ডিত্য দেখিয়া গুণ-গ্রাহী আকবর শাহ ইঁহাকে নিজ সঙ্গীতসভায় রত্ন স্বরূপ লইয়াছিলেন। বাবারামের কৃষ্ণচাঁদ, উদয়চাঁদ, রূপচাঁদ, বুদ্ধিচাঁদ, দেবচাঁদ, সম্প্রীতচাঁদ ও সুরজচাঁদ নামে ৭টী পুত্র হইয়াছিল। প্রথম ছয় জন পুত্র মোগল-সেনা মধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই যুদ্ধে নিহত হন। কনিষ্ঠ সুরজচাঁদ অন্ধ ছিলেন বলিয়া বাল্যকাল হইতে পিতার নিকট সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। এই সুরজচাঁদই শ্রীকৃষ্ণের বরে ‘সুর স্বামী’ নামে খ্যাতিলাভ করেন। কিন্তু বিনয়বশতঃ সকল স্থানেই নিজনাম ‘সুরদাস’ বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। কবি আপন বংশাবলীর উপরিউক্ত পরিচয় ‘ধৃষ্টকুট’ নামক গ্রন্থে দিয়া গিয়াছেন।

আগরা হইতে মথুরা যাইবার পথে নয়ক্রোশ দূরে গয়ঘাট নামক গ্রামে ইনি বাস করিতেন। তখন সুর-স্বামী নাম দিয়া নল-দময়ন্তীর আখ্যান লইয়া একখানি হিন্দী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। পরে

বৃন্দাবনে আসিয়া বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিট্‌ঠল্‌-নাথের নিকট বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক অনেকগুলি হিন্দী পদ রচনা করেন। তুলসীদাস যেমন রামায়ণ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, স্থরদাসও তেমনি শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত স্থরসাগর নামক গ্রন্থে ৬০ ষাট হাজার কবিতা আছে। জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় যে, ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম এবং ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে গোকুলে ইঁহার দেহান্ত হয়।

স্থরদাস অন্ধ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং লিখিতে পারিতেন না। একজন লেখক নিকটে বসিয়া তাঁহার মুখোচ্চারিত কবিতাগুলি লিখিয়া যাইত। একদিন লেখক কোথায় গিয়াছিল, স্থরদাস কবিতা বলিয়া যাইতেছিলেন। কবির ভক্তিডোরে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ লেখকের বেশে স্বয়ং আসিয়া তাঁহার কবিতাগুলি লিখিয়া দিতেছিলেন। কবি দেখিলেন, মনোভাব-প্রকাশের পূর্ব্বেই ২।১ টা কবিতা লিখিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি লেখকের হাত ধরিলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। স্থরদাস বুঝিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব। নিমেষে শ্রীহস্ত অন্তর্হিত হইল। অন্ধও মনোদুঃখে গাহিলেন—

"কর ছটকাই যাতে হ্যায় দুর্ব্বলা জানি মোহি।
হৃদয়সে যাও যাহাগি মর্দ্দা বাখানি তোহি॥"

অর্থ—আমাকে দুর্ব্বল জানিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া গেলে, কিন্তু আমার মন হইতে পালাও দেখি কেমন তুমি বীর। বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের নামে এইরূপ আখ্যান আছে।

স্থরদাস বৃন্দাবনে বংশীবটের পার্শ্বে একটী ছোট ঠাকুরবাড়ীতে মদন-মোহন নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেটী আজিও বিদ্যমান

আছে। সময়ে ইঁহার মন্দিরটী অনেক পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ দর্শনীয় কারুকার্য্য নাই বলিয়া অধিক যাত্রী দেখিতে আইসে না।

দ্বিতীয়—সূরদাস মদনমোহন—ইনি কোন্ দেশে বা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইনি আক্‌বরের অধীনে শাণ্ডিলে বা সারলা পরগণার আমীন ছিলেন। ইনি সনাতন-প্রতিষ্ঠিত মদনমোহনজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন। একবার তিনি মদনমোহনের সেবার জন্য, 'অতি চমৎকার গুড়, মিছ্‌রির প্রায়' বাজারে বিক্রয় হইতে আসিয়াছে দেখিয়া, সমস্তই (মদনমোহনের সেবার মালপুয়া প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য) কিনিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আর এক সময় শাণ্ডিলার রাজস্ব বহু লক্ষ টাকা রাজসরকারে না পাঠাইয়া সমস্তই মদনমোহনের ভোজ ও বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য খরচ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। এইরূপ অমিতব্যয়িতা জন্য দিল্লীতে টাকা পাঠাইতে না পারিয়া, সিন্দুকের ভিতর শিলাখণ্ড সকল ভরিয়া, রাজসরকারে প্রেরণ করেন। পরে তাঁহার অপরাধ প্রকাশিত হইলে, তিনি কারারুদ্ধও হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি মদনমোহনের কৃপায় কারামুক্ত ও কর্ম্মচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীবেশে আসিয়া সনাতন গোস্বামীর নিকট মদনমোহনজীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ইনি মদনমোহনের মন্দিরের নীচেকার ঘরে থাকিতেন এবং গীত রচনা করিয়া ও ভজন গাহিয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভক্তমালগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইঁহার আসল নাম 'কমললোচন', সঙ্গীতে নৈপুণ্য জন্য ইনি 'সুরদাস উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি মদনমোহনের ভক্ত ছিলেন বলিয়া নিজ রচিত সকল গানেই 'সূরদাস মদনমোহন' বলিয়া

ভণিতা দিয়াছেন। ইঁহার একটি গানে 'ভক্ত জন্‌কে পাহুকা মৈ শির ধরেঁ।' বলিয়া রচনা করিয়াছিলেন। দূরদেশ হইতে কয়েকজন যাত্রী আসিয়া মদনমোহনের মন্দিরের উপরে যাইবার জন্য জুতা খুলিয়া, একজন অপরকে বলিতেছিল, 'ওহে এখানে বানরের বড় উৎপাত, আমাদের জুতা আগ্‌লাবে কে ?' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, 'কেন ? স্থরদাস মদনমোহন ত এইখানেই থাকেন ; তিনি ত নিজ গানে ভক্তগণের জুতা রক্ষার ভার লইয়াছেন।' তাহারা জুতা খুলিয়া উপরে ঠাকুর দেখিতে গেল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, বাস্তবিক স্থরদাস মদনমোহন তাঁহাদের জুতাগুলি হইতে ধূলা কাদা ঝাড়িয়া, মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার এই দৈন্য ও বিনয় দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল। তদবধি স্থরদাস এ কর্ম্মটীকে নিজ কর্ত্তব্য মনে করিয়া শেষ দিন পর্য্যন্ত পালন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না, জানিতে পারি নাই ; তবে ইঁহার রচিত অনেকগুলি গীত গায়কগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দিরের নীচে এবং নূতন মন্দিরে যাইবার পথের পার্শ্বে, ইঁহার সমাধি আজিও বিদ্যমান আছে।

এই সময়ে আনন্দঘন নামে অপর একজন ভক্ত, কবি ও গায়কের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। তখন হইতে বৃন্দাবনে সঙ্গীত-চর্চ্চা আজিও চলিয়া আসিতেছে।

থানেশ্বরী জগন্নাথ। মদনমোহনজীর মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে একটী লাল পাথরে নির্ম্মিত বৃহৎ মন্দিরের ভগ্ন খণ্ড—স্তম্ভ,খিলান, ব্রাকেট প্রভৃতি পড়িয়া আছে। কোথাও কোথাও মৃত্তিকায় চাপা পড়িয়াছে। শুনিলাম রূপ, সনাতন, প্রভৃতি গোস্বামিগণের সমকালে থানেশ্বরী জগন্নাথ নামক কোন একজন পশ্চিম-দেশীয় ভক্ত বহু ব্যয় করিয়া এই

মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে যবন-দৌরাত্ম্যে বা অর্থাভাবে এখন সেটীর পূর্ব্বোক্ত রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাতা রাধামনোমোহন নামক ঠাকুরটী আজি কালি মন্দির-সংলগ্ন একটী ছোট কুঠারীর ভিতর, একজন বৃদ্ধা ব্রজবাসিনীর তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন। এখানকার ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য পাটনা-নিবাসী কোন ভক্ত মাসিক ২৲ টাকা মাত্র পাঠাইয়া থাকেন। পণ্ডিতবর বনমালী গোস্বামীর মুখে শুনিলাম যে, থানেশ্বরী জগন্নাথ, রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য বা বন্ধু ছিলেন। সেই জন্য রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর মতেই এই মন্দিরের পূজা-পদ্ধতি হইত। থানেশ্বরী জগন্নাথের নাম হিন্দী ভক্তমাল ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে পাই নাই। তবে এক সময়ে যে এই মন্দিরটী শোভা-সৌন্দর্য্যে সমুন্নত ছিল, তাহা ইহার কারুকার্য্যখচিত ভগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

পূজ্যপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটস্থ থানেশ্বর গ্রামে জগন্নাথের জন্ম বলিয়া ইঁহার নাম 'থানেশ্বরী জগন্নাথ' হইয়াছে। চৈতন্যদেব যখন বৃন্দাবন সন্দর্শনে আইসেন, তখন বৈদান্তিক পণ্ডিত জগন্নাথ, গোকুল বা মহাবনের নিকট, কোন বাটিতে থাকিতেন, চৈতন্য দেব সেই বাটির সম্মুখে এক বৃক্ষতলে ত্রিরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। জ্ঞানবাদী জগন্নাথ, ভক্তিবাদী চৈতন্যদেবকে দেখিয়া, বাটি প্রবেশ, বা নির্গমন কালে, যখনই দেখা হইত, 'সোঽহং' 'সোঽহং' 'সোঽহং' বলিয়া রহস্য করিতেন, চৈতন্যদেব মুখে কিছু না বলিয়া কেবল মৃদু মৃদু হাসিতেন। তৃতীয় দিন সায়ংকালে সেই দাম্ভিক জগন্নাথ আসিয়া চৈতন্যদেবের চরণ ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তত্ত্বমসি", "তত্ত্বমসি", "তত্ত্বমসি"। মহাপ্রভুর দর্শনেই ইঁহার মতি-গতি ফিরিয়া গিয়াছিল! ইনি তদবধি চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বন

করেন। ইঁহার বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না। দিল্লী বা থানেশ্বরের নিকট ইহাঁদের সম্প্রদায়ের মঠ আছে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

তুলসীদাস।

শিবলিঙ্গ, সূর্য্যমন্দির, শক্তি-পীঠ ও নাগ-পূজা।

হিন্দী-রামায়ণ-রচয়িতা তুলসীদাসের নাম বাঙ্গালীরা প্রায় সকলেই জানেন, প্রয়াগের সন্নিহিত যমুনা-তীরস্থ রাজাপুর গ্রামে সংবৎ ১৬০০ সালে (খৃঃ অঃ ১৫৪৩) সরযূপারী ব্রাহ্মণকুলে ইহাঁর জন্ম, পিতা—ভানুদত্ত দুবে, জননী—হুল্লাসী। ১৬৩১ সম্বতে ইনি হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া নৃসিংহদাস বাবাজী নামক একজন সন্ন্যাসীর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। রামায়ণ ভিন্ন ইঁহার বিনয়পত্রিকা প্রভৃতি দোহা ও গান প্রচলিত আছে। নবীন বয়সে পরমা সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা রত্নাবলীর প্রেমে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের জন্য তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিতে পারিতেন না। একবার শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া পত্নীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে বাধ্য হন এবং নিজেও ডুলীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিলেন। ইহাতে ইঁহার বনিতা বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "আমি সামান্যা রমণী, আমার আঁচল ধরিয়া বেড়াইতে তোমার লজ্জা হয় না? লোকে তোমায় উপহাস করিয়া ছি ছি বলিয়া ধিক্কার দেয়, তাহা কি তুমি শুনিতে পাও না? তোমার এতটা অনুরাগ যদি ভগবানের পদে থাকিত, তাহা হইলে তুমি যে মুক্ত হইয়া যাইতে পারিতে। ছি ছি ফিরে যাও।"

সেই দিন হইতে তুলসীর মন ফিরিয়া গেল। তিনি পত্নীর অনুসরণ ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণ অন্বেষণে অগ্রসর হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ভজন, সাধন ও রামায়ণ-রচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি কাশীধামে গঙ্গাতীরে শ্রীরামচন্দ্রের একটী মঠ স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। কাশীতে অবস্থানকালে একটী সহমরণোদ্যতা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প স্বামীকে দৈবশক্তি প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। এতৎ সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস যে, তুলসীদাস হনুমানের কৃপায়, চর্ম্মচক্ষে ইষ্টদেবতা রামসীতার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে, আকৃবর বাদশাহ তুলসীদাসের অলৌকিক শক্তির সংবাদ শুনিয়া তাঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া গিয়া 'জহুরা' দেখাইতে বলেন। তুলসীদাস বলিলেন তিনি 'জহুরা' জানেন না। ইহাতে বাদশাহ রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কারাগারে দেন। পরে সহরে হনুমানের উপদ্রব হইতেছে দেখিয়া ভীতচিত্তে তাঁহাকে সসম্মানে বিদায় করিয়া দিলেন।

(বৃন্দাবনে যে তুলসীদাসের কিছু কীর্ত্তি আছে, তাহা অনেকেই জানেন না। এখানে যমুনা-পুলিনের দক্ষিণ দিকে তুলসীদাসের মঠ বলিয়া, একটি কুঞ্জ বা ঠাকুর-বাটী আছে, মন্দিরে রামসীতার বিগ্রহ, সম্মুখে পিত্তল-নির্ম্মিত তুলসীদাসের মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় ;—একদিন শারদীয়া পূর্ণিমা রজনীতে, তুলসীদাস বৃন্দাবনে যমুনা-পুলিনে ভ্রমণ করিতে করিতে, রাধাকৃষ্ণের দর্শন পাইলেন। রামসেবক তুলসীদাস শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—

কাঁহা কহুঁ ছঁব আজ্ কী ভলে বনেহ নাথ।
তুলসী মস্তক তব নবে যব ধনুস্ বাণ লেও হাত॥

শ্রীকৃষ্ণরাধাও ভক্তের কাতর প্রার্থনা শুনিয়া, তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য মুরলী লুকাইয়া, ধনুর্ব্বাণ বাহির করিয়া রামসীতার মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইলেন। তুলসীদাসও সঙ্গে সঙ্গে ধরাবলুণ্ঠিত হইয়া ভক্তি-গদ্-গদ্ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

কিত্ মুরলী, কিত্ চন্দ্রিকা, কিত্ গোপীন্ কো সাথ।
আপনে জনকে কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

এই ঘটনাটী স্মরণ করাইবার জন্য হৃদয়রাম বাবাজী নামক তুলসী-দাসের একজন ধনী ভক্ত এই মঠটী তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছিলেন। এ কুঞ্জ এত বড় যে, ৭টা মহল ও ৫টা কূপ আছে। সংস্কারাভাবে অনেক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। অধুনা এ মঠ রামানন্দী-সম্প্রদায়ের আখড়া রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

তুলসীদাসের মৃত্যুদিন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হিন্দী পদটী প্রচলিত আছে—

সম্বৎ ষোড়হষ আশী অসি গঙ্গকে তীর।
শ্রাবণ শুক্লা সপ্তমী তুলসী ত্যাজো শরীর॥

সুতরাং ১৬৮০ সম্বতে (১৬২৩ খৃঃ অব্দে) শ্রাবণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসি-গঙ্গা-সঙ্গমে কাশীধামে তুলসীদাসের স্বর্গলাভ হইয়াছিল তাহা বুঝা যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন এখানে আরও কয়েকটী রামানন্দী-সম্প্রদায়ের মন্দির আছে, তথায় রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

শিবলিঙ্গ, সূর্য্যমন্দির, শক্তিদেবীর পীঠ ও নাগপূজা।

বৃন্দাবনধামে যে কয়েকটী শিবলিঙ্গ আছেন, তাহার মধ্যে গোপীশ্বর

ও বনখণ্ডী মহাদেব বিশেষ বিখ্যাত। গোপীশ্বর শিবলিঙ্গের এইরূপ বিবরণ ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে আছে—

কি অপূর্ব্ব শোভা এই বনের ভিতর।
গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর ॥
এই সদাশিব বৃন্দা-বিপিন পালয়।
ইঁহাকে পূজিলে সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয় ॥
গোপীগণ সদা কৃষ্ণ-সঙ্গের লাগিয়া।
নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥
কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর।
গোপিকা পূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥

ব্রজবাসীরা কিন্তু বলেন যে, মহাদেব রাসলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া রাসমণ্ডলে গোপিকা-বেশে সমুপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া, তদবধি লিঙ্গমূর্ত্তিতে বৃন্দাবনধামে অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বজ্রনাভ মথুরা-মণ্ডলে যে চারিটী লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইনি তাহার অন্যতম। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র এবং মন্দিরেরও তাদৃশ শোভা-সম্পদ্ নাই। ইঁহার মন্দির বংশীবটের নিকট অবস্থিত।

বনখণ্ডী মহাদেব—এটীও প্রাচীন শিবলিঙ্গ, তবে রূপ ও সনাতনের সময়ের কি না, তাহা বলিতে পারিলাম না; কেন না প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাই নাই। পুরাতন সহরে যাইবার পথে যৎসামান্য কারুকার্য্য-বিশিষ্ট ইঁহার নূতন মন্দিরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজবাসীরা বলেন, সনাতন গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে গোপীশ্বর পর্য্যন্ত শিবপূজা করিতে যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া, মহাদেব কৃপা করিয়া এই স্থানে তাঁহাকে

দর্শন দিয়াছিলেন। সেবা-কুঞ্জ গলির মোড়ে কয়েক বৎসর হইল, একটি বৃহৎকায় গণেশমূর্ত্তি একজন ব্রজবাসী স্থাপিত করিয়াছেন। মণ্ডী-পল্লীতে কোরিয়া জাতীয় সেবাইতেরা, একটী আধুনিক চতুর্ভুজা সিংহ-বাহিনী ভগবতী দেবী স্থাপন করিয়াছে। কোরিয়া জাতির জল অনাচরণীয় হইলেও ব্রজবাসী এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় লোকেরাও, তথায় যাইয়া মানত করিয়া থাকেন।) এখানে সুরাও নিবেদিত হয়।

সূর্য্য মন্দির—শ্রীকৃষ্ণ কালীয়দমন করিয়া যমুনালহরী হইতে উত্থিত হইলে তাঁহার অতিশয় শীতবোধ হইয়াছিল। সে সময়ে দ্বাদশ আদিত্য (সূর্য্য) কিরণ বর্ষণ করিয়া ইঁহার শীত নিবারণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়। তদবধি এ স্থানের নাম প্রস্কন্দন হইয়াছে। ইহাকে লোকে দ্বাদশ আদিত্য টীলাও বলে। নিকটেই সূর্য্য ঘাট। এই টীলার উপর মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির। তাহার পার্শ্বেই সূর্য্যদেবের একটী মন্দির আছে। এ মন্দিরটী তত পুরাতন নহে। প্রাচীনকালে এখানে দ্বাদশ আদিত্যের যে মন্দির ছিল, যবন-বিপ্লবে তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে সূর্য্য মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া যায়। এখন একটী নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়া তাহার ভিতর সূর্য্যবিহারী নামে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য মন্দিরের পার্শ্বেই আবার শীতলা দেবীর একটী মন্দিরও স্থাপিত হইয়াছে। ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে কেবল প্রস্কন্দন তীর্থের উল্লেখ আছে। মন্দিরের কথা নাই। আমরা মনে করি, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্রজ-মণ্ডলে শৈব ও সৌরগণের নিবাস ছিল, উপরি উক্ত শিব ও সূর্য্য মন্দিরগুলি তাহারই সাক্ষী। কেশীঘাটের নিকট একটী নবনির্ম্মিত মন্দিরে দক্ষতনয়া মৃতা সতীর কেশপতন হইয়াছিল বলিয়া পাণ্ডারা দেখাইয়া থাকে। পঞ্জিকাতেও বৃন্দাবনে অম্বিকা বা কেশিনী দেবীর নামোল্লেখ আছে। কিন্তু ভৈরব ভূতেশ্বরের মন্দির মথুরায়। সেখানেও পাতাল-দেবী নামে

একটী মূর্ত্তি আছে। তদ্‌ভিন্ন মথুরার মহাবিদ্যা-দেবীকে সকলে শক্তি-পীঠ বলিয়া থাকেন।) সুতরাং সতীর কেশ, বৃন্দাবনে অথবা মথুরায়, কোথায় পড়িয়াছিল ঠিক বলা যায় না।* অনভিজ্ঞ পাণ্ডারা একটি নবনির্ম্মিত বাড়ীকে সতীপীঠ বলিয়া পরিচয় দেন। যেখানে কেশপতন স্থান দেখান, সেখানে কোন মূর্ত্তি নাই। ইহার সম্মুখবর্ত্তী গৃহে কৃষ্ণ-কালী মূর্ত্তি, অতি অল্পদিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। কোন প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে বৃন্দাবনে শক্তিপীঠের উল্লেখ পাই নাই। ইহা ছাড়া পৌর্ণমাসী, বৃন্দাদেবী, নন্দালয় প্রভৃতি অনেক গুলি আধুনিক দেবালয় এখানে স্থাপিত হইতেছে। ছিপি সলিতে একটি জৈন মন্দির আছে। ব্রজবাসীরা কেহ তথায় যান না।

নাগপূজা—বৃন্দাবনের দক্ষিণদিকে, পরিক্রমা পথের পার্শ্বে, অটল-বনের নিকট, একটি নবনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে, বলদেবের 'শেষ' মূর্ত্তি কয়েক বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছেন, সেই পাষাণ-রচিত মূর্ত্তিটি সোজা দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, রোষবিস্ফারিত-লোচনে দক্ষিণ হস্তে দণ্ড বা হল-মুসল তুলিয়া যেন কাহাকে মারিতে যাইতেছেন। বাম হস্তে চষক (পানপাত্র) বক্ষে ধরিয়া আছেন, মস্তকোপরে সাতটি সর্পফণা শোভিত। সর্পদেহটি ইংরাজী (S) অক্ষরের মত বক্রভাবে পদতল পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে। এখানকার পূজারী বলেন, কোন ভক্ত এই মূর্ত্তিটিকে মন্দির-সন্নিহিত ভূগর্ভ হইতে পাইয়া, এখানে স্থাপিত করিয়াছেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে, বৃন্দাবনেও প্রাচীনকালে নাগপূজা প্রচলিত ছিল। এইরূপ

(* শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরূপী কেশী দানবকে এই তীর্থে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া, কেশীঘাট নাম হইয়াছে।) নতুবা সতীর কেশ-পতন জন্য এ তীর্থের নাম কেশী-ঘাট হয় নাই।

কয়েকটি নাগমূর্ত্তি মথুরার যাদুঘরে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার একটির পশ্চাদ্‌ভাগে ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত আছে—'নাগরাজ ভগবান দধিকর্ণের মূর্ত্তি।' ভাগবতে বলদেবকে নাগরাজ অনন্তের অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, লীলা-সম্বরণ কালে বলদেবের মুখবিবর হইতে, একটি সহস্র-ফণা-বিশিষ্ট সর্প বাহির হইয়া পশ্চিম সাগরে প্রবেশ করিয়াছিল! বৌদ্ধেরাও এইরূপ শেষ-মূর্ত্তির পূজা করিতেন, তাঁহারা এগুলিকে নাগরাজ-মূর্ত্তি বলিতেন। যমুনার পূর্ব্বতীরে, মহাবন হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে, ক্ষীরসাগর নামক কুণ্ড-সমীপে বজ্রনাভ-প্রতিষ্ঠিত বলদেবের যে 'শেষ' মূর্ত্তি আছে, আমরা তাঁহার চিত্র দিলাম। ইহাঁর দক্ষিণ হস্তে কেবল দণ্ড নাই। ইহাঁর পূজারীরা 'অহিবংশী' ব্রাহ্মণ। এ অঞ্চলে বলদেবকে দাউজী (দাদাজী) বলে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ।

জয়দেব মন্দির ও সাক্ষীগোপাল।

ভারতের দক্ষিণ দেশে কৃষ্ণবেণ্বা নদীতীরস্থ গ্রামনিবাসী যে ব্রাহ্মণ-সন্তান—বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, নবীন যৌবনে বারাঙ্গনা-রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া, পিতৃশ্রাদ্ধ মৃতা-তিথি দিনে, অর্দ্ধরাত্রে ঘোর বৃষ্টি ঝঞ্ঝাবাত উপেক্ষা করিয়া শবদেহ-ভেলায় নদী পার হইয়াছিলেন; যিনি সুপ্তা চিন্তামণির গৃহদ্বার অর্গলিত দেখিয়া, প্রাচীর-বিলম্বিত কালসর্পকে রজ্জুভ্রমে আকর্ষণ করিয়া প্রাঙ্গণে লম্ফ দিয়া পড়িয়াছিলেন; যিনি বেশ্যার সদুপদেশগর্ভ ভৎর্সনায় চৈতন্য লাভ করিয়া, সোমগিরি নামক গুরুর নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষালাভ





বলদেবের শেষ মূর্ত্তি।

করিয়া, বৈরাগ্য পথের পথিক হইয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন; যিনি তথায় যাইবার পথে সরোবর-তীরে সুরূপা তরুণী বণিক্-সীমন্তিনীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া,উন্মত্তবৎ তাঁহার পতির নিকট আতিথ্য-চ্ছলে বনিতা-বিলাস কামনা করিয়াছিলেন; পরে অকস্মাৎ জ্ঞানোদয় হইলে অনুতাপভরে, সেই প্রার্থিতা সুন্দরীর নিকট হইতে সূচী লইয়া নিজ নয়নদ্বয়কে বিদ্ধ করিয়া, স্বহস্তে অন্ধ হইয়াছিলেন; যিনি বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডতীরে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের করস্পর্শে ও তাঁহার কৃপাবলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় লাভ করিয়াছিলেন;—সেই মহাত্মা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কথা নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অনুপম নাটকের প্রসাদে বাঙ্গালার সকলেই অবগত আছেন। অধুনা কেহ কেহ তাঁহাকে বীরভূম জেলার লোক বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। চরিতামৃতে দেখিতে পাই, চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিতে যাইয়া 'লীলাশুক' বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' নামক গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল বাঙ্গালী হইলে তাঁহার গ্রন্থ এদেশেই পাওয়া যাইত। বিল্বমঙ্গল রুদ্র বা বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম, বংশপরিচয় এবং তিনি কোন্ সময়ের লোক, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যদি তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া থাকেন, তবে সেটা ভারতে মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। তাঁহার বৃন্দাবনে অবস্থান-কথা, চরিতামৃত ও ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। ভক্তমাল গ্রন্থে কেবল তাঁহার আখ্যানটুকু দেখিতে পাই।

বৃন্দাবনে গোপীনাথ-বাজারের প্রবেশ-পথে বিল্বমঙ্গলের কুঞ্জ নামে একটী বাটী আছে। ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে সে বাটীটী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দেখিয়াছিলাম। আজি কালি সেটী নূতন ধরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে বারান্দার নীচে,বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সমাধি,বলিয়া নূতন পাথরে

গাঁথা একটী ছোট মন্দিরাকৃতি মঞ্চ রহিয়াছে এইমাত্র। অবশিষ্ট স্থানে লোকজনেরা বাস করে। অনুসন্ধানে জানিলাম, চিন্তামণির নামেও একটি কুঞ্জবাটী ছিল। এখন তাহা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। দুই-এক জন বিজ্ঞলোকের মুখে শুনিলাম যে বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণির স্মৃতিরক্ষা বা এই কুঞ্জটীর গৌরব বৃদ্ধির জন্য এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল, নতুবা ঐ সকল স্থানে, কোন কালে বিল্বমঙ্গল বা চিন্তামণি কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিছুই প্রমাণ নাই। ভক্তমালগ্রন্থেও কুঞ্জের কোন কথাই নাই।

জয়দেব-প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবজী

বাঙ্গালী কবি জয়দেব গোস্বামী-বিরচিত গীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থ হইতে আমরা কেবলমাত্র জানিতে পারি যে,তাঁহার পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী, পত্নী পদ্মাবতী এবং পরাশর নামে তাঁহার একজন সঙ্গীতপটু প্রিয়-বন্ধু ছিলেন; কেন্দুবিল্ব নামক গ্রামে তাঁহার জন্ম। ইঁহার সমকাল-বর্ত্তী উমাপতিধর, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য এবং ধোয়ী নামক কবিগণের নামও এ গ্রন্থে আছে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বল্লাল সেনের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভা-সদ ছিলেন। ইহাঁর জীবনী সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী আছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই জানেন। * গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে 'রাধামাধব' নামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অভীষ্টদেবের নামও আছে। তিনি

* জয়দেব গোস্বামীর এই সকল প্রবাদ ভক্তমাল প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়—১ম। জয়দেব যখন সন্ন্যাসীবেশে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এক ব্রাহ্মণ, পদ্মাবতী নাম্নী তাঁহার সুন্দরী যুবতী কন্যাকে লইয়া আসিয়া

এই বিগ্রহটীকে কিরূপে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত আছে—

শ্রীজয়দেব ঠাকুরের বৃন্দাবন যাইতে।
অন্তরে আবেশ হইল ঠাকুর সহিতে॥
ঠাকুর কিশোর রূপ স্থূল অঙ্গ ভারি।
কেমনে লইয়া যাইব উপায় কি করি॥

তাঁহাকে বলিলেন, তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই বলিয়া জগন্নাথের নিকট পূর্ব্বে তিনি মানত করিয়াছিলেন যে, প্রথমজাত সন্তানকে জগন্নাথের সেবায় নিযুক্ত করিবেন। তদনুসারে এই প্রথমজাত কন্যাকে দেবতার নিকট সমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হইয়াছে যে, জয়দেব নামক ভক্তের করে ইহাকে দান কর। জয়দেব প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন, পরে দেবাদেশ অবহেলা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি কেন্দুবিল্বে আসিয়া সংসারী হন। এইস্থানে অবস্থানকালে তিনি গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা করিতেন। একদা তিনি গ্রন্থ রচনা করিতে করিতে 'স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্য্যন্ত লিখিয়া, 'দেহি পদপল্লবমুদারং' পদটুকু লিখিতে সঙ্কোচবোধ করিয়া, পুথিলেখা রাখিয়া অজয়-স্নানে চলিয়া যান। সেই অবকাশে ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ, জয়দেবের বেশে তাঁহার গৃহে আসিয়া সেই পদটুকু লিখিয়া দিয়া যান।

২য়। দেবসেবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া গৃহে ফিরিবার পথে দস্যুরা তাঁহার অর্থহরণ করিয়া তাঁহার হস্তপদাদি ছেদন করিয়া তাঁহাকে কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়ন করে। পরে দেবানুগ্রহে তাঁহার অঙ্গহানি ঘুচিয়া যায়।

৩য়। জয়দেবের প্রার্থনায় গঙ্গাদেবী অজয় নদ বাহিয়া আসিয়া কেন্দুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয় এই যে, জয়দেব কি সূত্রে লক্ষ্মণসেনের সভাসদ-পদে বৃত হইয়াছিলেন বা কোন্ ঘটনায় রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এতেক ভাবিতে রাধামাধব কহিল।
চিন্তা কি আমারে লয়্যা বৃন্দাবনে চল॥
ঝুলির ভিতর করি লইয়া যাইবে।
ছোটরূপ হব কিছু ভার না লাগিবে॥
ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কবিরাজ।
বৃন্দাবনে গেলেন ঠাকুর ঝুলি মাঝ॥
বৃন্দাবন ধাম দেখি পুলক হইলা।
কেশীঘাট সন্নিধানে আনন্দে রহিলা॥
কোন মহাজন রাধামাধবে দেখিয়া।
আর্দ্র হইয়া দিল মন্দির বানাইয়া।
কবিরাজ অপ্রকটে বহুকাল পরে।
ঠাকুর লইয়া রাজা গেল জয়পুরে॥
অদ্যাবধি তথা ঘাটিনাম রাজস্থানে।
বিরাজ করয়ে চাঁদ ঝলকে বদনে॥

বৃন্দাবনে ভ্রমরঘাটের উপর, জয়দেব গোস্বামীর নামে একটী প্রাচীন মন্দির আজিও বিদ্যমান আছে। পণ্ডিতবর মধুসূদন সার্ব্বভৌম মহাশয় বলেন যে, জয়দেব গোস্বামী ভারতে মুসলমান-উপদ্রবের পূর্ব্বে আসিয়া থাকিবেন,এবং মন্দিরাদি যদি কিছু তিনি নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন,সে সমস্তই পাঠান রাজারা ধ্বংস করিয়া সমভূমি করিয়া দিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ভরতপুরের রাজাদিগের আমলে, একজন গীতগোবিন্দ-মুগ্ধ মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত, ভ্রমরঘাটের নিকট জয়দেবের কুটীর ছিল, এইরূপ প্রবাদ শুনিয়া, বর্ত্তমান মন্দির ও নূতন রাধামাধব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের উপদ্রব-কালে বৃন্দাবনের অপরাপর প্রধান বিগ্রহের ন্যায়

সেই রাধামাধব মূর্ত্তিটিকে জয়পুরে ঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। * আবার আল্ওয়ারের মহারাজের সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লাল রাজ্যরত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে, প্রথমে সে মূর্ত্তি-টিকে কাম্যবন মধ্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখা হইয়াছিল। পরে গোলযোগ মিটিয়া গেলে, সেটিকে তুলিয়া লইয়া আজমীর যাইবার পথে, কিষণ-গড় রাজ্যের অন্তর্গত সেলিমাবাদ নামক গ্রামে, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান মঠে, সংস্থাপিত করা হইয়াছে। সে মূর্ত্তিটি দেখিতে পরম রমণীয়।

পূর্ব্বে এই মন্দিরের সেবার ব্যয় জন্য, বার্ষিক পাঁচ শত টাকা ভরত-পুরের রাজকোষ হইতে পাওয়া যাইত। এখন তাহা ক্রমেই কমিয়া গিয়া মাসিক দুই টাকায় দাঁড়াইয়াছে! কাযেই মন্দিরের মেরামত এবং পূজা-ব্যয় সঙ্কুলান হয় না বলিয়া, রাধারমণজীর সেবাইতেরা ইহার তত্ত্বাবধান ছাড়িয়া দিয়াছেন। এ মন্দিরটি যমুনাপার্শ্বে অল্পস্থানের উপর

* জয়দেব গোস্বামী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক। বৃন্দাবনে তাঁহার কোনরূপ কীর্ত্তি বা দেবমূর্ত্তি থাকিলে চরিতামৃতে, ভক্তিরত্নাকরে বা ব্রজপরিক্রমা গ্রন্থে তাহার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আকবরের রাজত্বের পরে ও আরংজেবের শাসনের পূর্ব্বে এই মন্দিরটী স্থাপিত হইয়াছিল। ভক্তমালের উক্তিটুকু জনপ্রবাদমূলক। এমন কি, বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব-প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যে রাধামাধব বিগ্রহ আছেন, তাহারও উল্লেখ কোন প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থে পাই নাই। আমাদের বিশ্বাস, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পরে ইহা স্থাপিত হইয়া থাকিবে। বীর-ভূমের বিবরণ নামক পুস্তকে দেখিলাম যে, সে মূর্ত্তিটির নাম রাধামাধব নহে, তাঁহার নাম রাধাবিনোদ, পরবর্ত্তিকালে বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণীদেবী, ১৬১৪ শকে জয়দেবের জন্মভূমিতে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য মন্দির ও রাধাবিনোদ বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন।

নির্ম্মিত। কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ছোট প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। মন্দিরটি ইটেগাঁথা, সেকেলে ধরণের চতুষ্কোণ চূড়াও আছে। তবে দেখিবার উপযোগী কোন কারুকার্য্য নাই। একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোক যাত্রীগণের নিকট হইতে যাহা পান, তাহা দিয়া প্রতিনিধি ঠাকুরগুলির সেবা করেন ও আপনি খান। তিনি বলিলেন যে, এই মন্দিরের গায়ে একখানি প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন ছিল, তাহাতে মন্দিরের স্থাপয়িতৃদিগের পরিচয় খোদিত ছিল। আজ কয়েক বৎসর হইল, ভরত-পুরের রাজাদিগের কোন ঘরাও বিসম্বাদের মীমাংসার জন্য, সে পাথরখানা লইয়া গিয়াছে।) এই মন্দিরের পার্শ্বেই একটি সুবৃহৎ পীলু ফলের গাছ আছে।

সাক্ষীগোপাল।

বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর ঘেরার উত্তর দিকে উচ্চভূমির উপর একটী অতি পুরাতন শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে। ব্রজবাসীরা সেটীকে সাক্ষীগোপালের মন্দির বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সাক্ষীগোপালের এইরূপ আখ্যান দেওয়া আছে। উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলে, বিদ্যানগর-নিবাসী একজন বৃদ্ধ (বড়-বিপ্র) ও একজন যুবা (ছোট বিপ্র) উভয়ে মিলিয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগ দর্শন করিয়া অবশেষে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

'বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয়।
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয়॥
কেশীতীর্থে কালীয়হ্রদাদিতে করি স্নান।
শ্রীগোপাল দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম॥

চৈঃ চঃ, ম-লী, ৫ম পঃ।

এই গোপাল-মন্দিরে তাঁহারা দুই চারি দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বড় বিপ্র, ছোট বিপ্রের সেবা ও পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নিজের কন্যা দান করিবেন বলিয়া, গোপালদেবের সম্মুখে প্রতিশ্রুত হন। পরে উভয়ে দেশে ফিরিয়া আসিলে, বড় বিপ্র, স্ত্রী, পুত্র ও জ্ঞাতিগণের প্ররোচনায়, ছোট বিপ্রকে হীনকুল ও দরিদ্র বলিয়া কন্যাদানে অস্বীকার করিলেন। ছোট বিপ্র ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া, গোপালজীর নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। গোপালজী তাঁহার স্তবস্তুতিতে পরিতুষ্ট হইয়া, বৃন্দাবন হইতে পদব্রজে তাঁহার সহিত বিদ্যানগরে সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন। গোপালজীর মূর্ত্তি সমুপস্থিত দেখিয়া, বড় বিপ্র ও জ্ঞাতি-কুটুম্ব ছোট বিপ্রের বাসনা পূর্ণ করিল। তদবধি ঠাকুরের নাম সাক্ষীগোপাল হইল। ইহার বহুদিন পরে উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেব, বিদ্যানগরপতিকে জয় করিয়া, সাক্ষী-গোপালটীকে নিজ রাজধানী কটক নগরে লইয়া আইসেন। আজি কালি সে মূর্ত্তিটী, খুরদা-জংসন হইতে পুরী যাইবার পথে, সত্যবাদীপুরে অবস্থান করিতেছেন। চৈতন্যদেবের সময় তিনি কটকে ছিলেন। ব্রজবাসীরা বৃন্দাবনের যে শূন্য মন্দিরকে অধুনা সাক্ষীগোপালের মন্দির বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, সেটী কোন কালে বাস্তবিক ইঁহার মন্দির ছিল কি না, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। কেবল চরিতামৃতে 'গোবিন্দস্থানে' শব্দ লিখিত আছে বলিয়া,তাঁহারা এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন; নতুবা ভক্তিরত্নাকর, ব্রজপরিক্রমা প্রভৃতি কোন গ্রন্থেই এ মন্দিরের উল্লেখ পাই না। বৃন্দাবন হইতে কখন যে কোন মূর্ত্তি উড়িষ্যায় গিয়াছিল, চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রবাদমূলক উক্তিটুকু ছাড়া, তাহার আর অন্য ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। যদি সত্যই এই ঘটনা ঘটিয়া থাকে,তবে তাহা ভারতে মুসল-মান আগমনের বহু পূর্ব্বেই হইয়া থাকিবে বলিয়া অনুমান হয়। সে যাহা

হউক, এই ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দিরটী বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রণালীতে গঠিত, তবে উচ্চতায় অনেক ছোট, কেবল ২০।২৫ ফিট উচ্চ হইবে। এখন ইহার পার্শ্বস্থ রন্ধনশালাদি গৃহগুলি নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল মূল মন্দির ও জগমোহন জীর্ণ শীর্ণ হইলেও দণ্ডায়মান আছে। দুই এক জন কৃতবিদ্য শিক্ষিত লোকের মত এই যে, চরিতামৃতে রঘুনাথ ভট্টের অজ্ঞাতনামা শিষ্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, গোবিন্দদেবের যে মন্দিরের কথা লিখিত আছে, এটী হয়ত সেই মন্দির। ইহার পর মানসিংহ লাল-প্রস্তর-নির্ম্মিত নূতন মন্দিরটী করিয়া দিলে, তথায় গোবিন্দজীকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। রূপগোস্বামী-বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক গ্রন্থের ৮৭ শ্লোকে আছে "গোবিন্দাখ্যং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে"—ইহা হইতে অনুমান হয় যে, প্রথম আবিষ্কারের পর গোবিন্দজীকে হয়ত কিছু-দিন কেশীঘাটের নিকটে স্থাপিত করা হইয়াছিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১। বংশীবট, ২। অদ্বৈতবট, ৩। শৃঙ্গার বট, ৪। অক্রূরঘাট, ৫। ভোজনটীলা। ৬। আমলীতলা।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশে, বটবৃক্ষতল যে, গৃহবিমুখ যোগী-ঋষি-সন্ন্যাসীগণের একমাত্র আশ্রয় স্থল ছিল, তাহা সকলেই জানেন। পুরাণাদিতে বটতরুর অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ব্রজধামে কয়েকটি বিখ্যাত বটবৃক্ষের নিকটেই সেই সকল বটের নামে দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। একে একে সেগুলির পরিচয় দিতেছি।

১। বংশীবট।

এটী যমুনার তীরবর্ত্তী। প্রবাদ এইরূপ যে, শ্রীকৃষ্ণ শারদ-পূর্ণিমা রজনীতে, এই বটবৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া, রাসলীলার জন্য ব্রজগোপিকাগণকে সুমধুর বংশীরবে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই জন্য এখানকার বট-বৃক্ষটির নাম বংশীবট হইয়াছিল। মধুপণ্ডিত মহাশয় এইস্থান হইতে গোপীনাথ মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। দ্বাপর যুগের সেই পুরাতন বটবৃক্ষ যমুনার ভাঙ্গনে ভাঙ্গিয়া গেলে, তাহারই একটী শাখা লইয়া পূজারীরা এই স্থানে রোপণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৃক্ষটি সেই শাখা হইতে সমুৎপন্ন। কোনও প্রাচীন ভক্ত এই বৃক্ষের নিকটে দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দালানের ভিতর বংশীবটবিহারী নামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার সম্মুখে একটী থালের উপর সোণা ও রূপার নির্ম্মিত কয়েকটী বাঁশী রক্ষিত আছে। যাত্রী বা ভক্তগণের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করেন, নির্দ্ধারিত মূল্যে একটী বংশী ক্রয় করিয়া ঠাকুরের হস্তে দেন। এরূপ করিলে অপুত্রকের পুত্র হয় বলিয়া ফলশ্রুতি আছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীরগাত্রে রাসলীলার অনুকরণে এক একটী কৃষ্ণ ও এক একটী গোপিকা-মূর্ত্তি, পরস্পর হাত-ধরাধরি করিয়া খোদিত ও অঙ্কিত আছে। উঠানের চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র মন্দিরে, শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক—রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্যের চারিটী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। * পূর্ব্বে এ

---

* বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম ও সনক নামে চারিটি সম্প্রদায় আছে। সম্প্রদায় বর্জ্জিত হইলে মন্ত্র সকল নিষ্ফল হইয়া যায়, এই জন্য সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী, এই চারি সম্প্রদায়ের কোন না কোন সম্প্রদায়ের, বা তাহার শাখার মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

দেবালয়টী গৌড়ীয়গণের সম্পত্তি ছিল। এক্ষণে ইহা গোয়ালিয়ারের

---

(১) রামানুজস্বামী—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহাদের মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শান্ত ও দাস্য ভাবে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী উপাস্য। কাঞ্চী ও শ্রীরঙ্গে ইঁহাদের প্রধান মঠ, তদ্‌ভিন্ন পুরীর জগন্নাথ, দ্বারকার রণছোড়জী, হিমালয়ের বদরীনাথ, কাশীর বিন্দুমাধব, প্রয়াগের বেণীমাধব, মথুরার কেশবদেব, দীর্ঘবিষ্ণু ও গতশ্রম প্রভৃতি, এই সম্প্রদায়ের ঠাকুর। বৃন্দাবনে কেবল মাত্র শেঠেদের রঙ্গনাথজী, এই সম্প্রদায়ভুক্ত। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামানন্দ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত রামানন্দী সম্প্রদায়, এই শ্রী-সম্প্রদায়ের একটি শাখা। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান ইঁহাদের উপাস্য। বৃন্দাবনে ইঁহাদের কয়েকটি মন্দির আছে।

(২) বিষ্ণুস্বামী—খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রুদ্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন ও বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ মত প্রচার করেন। দাক্ষিণাত্যে কোথাও কোথাও ইঁহাদের মঠ আছে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। গোকুলের বল্লভাচার্য্য এই মত বহুলভাবে মথুরামণ্ডলে প্রচার করেন। (বল্লভাচার্য্য প্রবন্ধ দেখুন)। বাৎসল্যভাবে বালগোপাল ইঁহাদের উপাস্য।

(৩) ভাস্করাচার্য্য,—(ইঁহার অপর নাম নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য),খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই সনক সম্প্রদায় ও দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। মথুরার সন্নিহিত ধ্রুবটীলায় ইহাদের মঠ বা গদি আছে। তদ্‌ভিন্ন কিষণ-গড় রাজ্যের অন্তর্গত সেলিমাবাদ সহরে ইঁহাদের প্রধান মঠ অবস্থিত। জয়দেবের নামে প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহ এই মঠে আছেন বলিয়া শুনা যায়। বৃন্দাবনে তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী, গোয়ালিয়র-রাজের গুরু গিরিধারিদাস ব্রহ্মচারী, জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজা মাধোসিংহ, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল তারাকিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তি, কেহ কেহ বা রাধাকৃষ্ণ-যুগলমূর্ত্তি সখ্যভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন।

(৪) খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদ মত ও ব্রহ্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে পাপনাশন নদীতীরে ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত উদিপী সহরে ইঁহাদের সর্ব্বপ্রধান মঠ। তথায় 'মল্লপাশধর'

রাজার গুরু, গিরিধারী ব্রহ্মচারী মহাশয় ক্রয় করিয়াছেন। সুতরাং ইহা এখন নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়াছে।

২। অদ্বৈত-বট।

মদনমোহনজীর উত্তর-তোরণের সন্নিকটে যমুনাতীরে এই বৃক্ষটী অবস্থিত। "ব্রজপরিক্রমা"গ্রন্থে লিখিত আছে—

যে বট বৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্ব্বত্র হইল সে অদ্বৈত-বট খ্যাতি॥

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, অদ্বৈত প্রভু শিবের অবতার এবং ইহাঁরই হুঙ্কারে বা কাতর আহ্বানে, চৈতন্যদেব ধরাধামে অবতীর্ণ

রাধাবিহীন বালকৃষ্ণ-মূর্ত্তি মহাসমারোহে অর্চ্চনা হয়। লোকে সেটিকে আদি-কৃষ্ণমূর্ত্তি বলে। প্রবাদ—দ্বাপর যুগের শেষে, বজ্রনাভ ব্রজধামে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার বহু পূর্ব্বে, অর্জ্জুন সেটীকে দ্বারকায় স্থাপন করিয়াছিলেন। সমুদ্রগর্ভে দ্বারকা বিলীন হইয়া গেলে, সে মূর্ত্তিটি অদৃশ্য হইয়া যায়। বহু শতাব্দী পরে দ্বারকার হরিচন্দন মৃত্তিকা (হরিদ্রাবর্ণ তিলকমাটি) পরিপূর্ণ একখানা জলযান ঝটিকাবলে উদিপী পার্শ্ববর্ত্তী নদীমুখে মগ্ন হইয়া যায়। মধ্বাচারী মহাশয় ধ্যানে জানিতে পারিয়া, সেই হরিচন্দন মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে অর্জ্জুনপ্রতিষ্ঠিত এই মূর্ত্তিকে উত্তোলন করিয়া আপনাদের মঠে স্থাপন করিয়াছিলেন। দাক্ষিণ দেশে ধনরত্ন-সম্পন্ন এই উড়ুপী কৃষ্ণের মঠ সাতিশয় প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে ইঁহাদের আরও অনেক মঠ আছে। চৈতন্যদেব স্বয়ং এই মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, শিষ্য-পরম্পরায় সপ্তদশ সংখ্যক! চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, তীর্থভ্রমণোপলক্ষে তিনি যখন এই মঠে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার জ্ঞান ও কর্ম্মবাদমতের সহিত, তাঁহার ভক্তি-বাদমতের ঐক্য হয় নাই। বৃন্দাবনে গৌড়ীয় ও রাধাবল্লভী সম্প্রদায় এই মধ্বাচারী-সম্প্রদায়ের শাখা; কান্ত বা মধুরভাবে ইঁহাদের উপাস্য রাধাকৃষ্ণ। রাধাবল্লভীরা কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে অধিকতর মর্য্যাদা দিয়া থাকেন।

হইয়াছিলেন। ঈশান নাগর বিরচিত "অদ্বৈতপ্রকাশ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অদ্বৈত প্রভুর 'দ্বিপঞ্চাশ' বর্ষ বয়ঃক্রম কালে চৈতন্যদেবের জন্ম হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ সাবডিভিজনের ভিতর, লাউর পরগণার মধ্যে নবগ্রামে ১৪৩৩ খৃঃ অঃ মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অদ্বৈতের জন্ম। পিতামহ নৃসিংহ নাড়িয়াল, শ্রীগণেশ বা দিব্যসিংহ রাজার মন্ত্রী ছিলেন। পিতার নাম কুবের তর্কপঞ্চানন, মাতা নাভা দেবী। বাল্যকালে অদ্বৈতের নাম কমলাক্ষ নাড়িয়াল ছিল। পণ্ডিতের বংশেই ইহাঁর জন্ম। শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের পর ইনি বেদপঞ্চানন উপাধি পাইয়াছিলেন।

অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া, কিছুদিন তীর্থ ভ্রমণ করিতে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনের দ্বাদশ-আদিত্য টীলা তীর্থে (ঘাটে) অল্প মৃত্তিকার নিম্নে মদনগোপাল নামক বিগ্রহটীকে প্রাপ্ত হন। তথায় কয়েক মাস যাবৎ একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ তলে ঝোপড়া বাঁধিয়া ঠাকুরটির সেবা করিতেন। পরে ম্লেচ্ছ (পাঠান) গণের উৎপাত দেখিয়া ঠাকুরটীকে মথুরার এক চৌবের হস্তে অর্পণ করিয়া দেশে চলিয়া আইসেন। ইনি নবগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া, গঙ্গাতীরে শান্তিপুরে আসিয়া বাস করেন, এবং তথাকার নৃসিংহ ভাদুড়ির দুই কন্যা—সীতা ও শ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কমলাক্ষ বেদপঞ্চানন, মাধবেন্দ্র-পুরীর নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মের দীক্ষা লইয়া, অদ্বৈতপ্রভু নামে খ্যাত হন। চৈতন্যদেব ও লোকনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেকেই ইঁহার নিকট দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের সহিত একত্র মিলিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁরা তিনজন বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব

পাশ্চাত্য বৈদিক, * নিত্যানন্দ প্রভু রাঢ়ী এবং অদ্বৈত প্রভু বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি একবার বৈদান্তিক মতে মায়াবাদ প্রচার করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া, চৈতন্যদেব ইঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁর নাড়িয়াল উপাধি ছিল বলিয়া তিনি সময়ে সময়ে ইহাঁকে নেড়া বলিয়া তামাসা করিতেন। অদ্বৈত প্রভু যোগবাশিষ্ট রামায়ণের ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তিমার্গানুগামিনী টীকা বা ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, যবন হরিদাস অদ্বৈত-প্রভুর শিষ্য। অদ্বৈতের পুত্রগণের নাম অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণদাস, গোপাল দাস, বলরাম দাস, স্বরূপ ও জগদীশ। ১৫৫৮ খৃঃ অঃ ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার তিরোধান হয়। চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর অপেক্ষা ইনি অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও ইহাঁদের অনেক পরে স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুরীধাম হইতে বিদায় কালে চৈতন্যদেব—

আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান।
আচণ্ডালাদিরে করিহ কৃষ্ণ-ভক্তি দান॥
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গৌড়দেশে।
অনর্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে॥

চৈঃ চঃ, ম-লী, ১৫ পরি।

এই উক্তি হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, বাঙ্গালাদেশে তখন কৃষ্ণ-পূজা বা প্রেম-সেবা প্রচলিত ছিল না বলিয়া, এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের কেহই অদ্বৈত প্রভু কর্ত্তৃক মদনগোপাল-আবিষ্কারের কথা স্বীকার করেন না। "অদ্বৈতপ্রকাশ" ভিন্ন অন্য কোন পুথিতেও

---

* ভ্রান্ত-সংবাদে আমরা ইহাঁকে ৫ম পৃষ্ঠায় দাক্ষিণাত্য বৈদিক লিখিয়াছিলাম।

একথা নাই। এখন অদ্বৈত-বট নামে যে বৃক্ষটি আছে, সেটী অদ্বৈত প্রভুর সময়ের নহে। তবে তাহার প্ররোহ কিংবা শাখা হইতে উৎপন্ন হইলেও হইতে পারে। বৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী ভগ্নপ্রায় দেবালয়ে মদনগোপালজীর সহিত, সীতা ও অদ্বৈত প্রভুর মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। মন্দিরটীর নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কোন রূপ নির্দ্দিষ্ট আয় নাই; যাত্রীগণ হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ সেবা চলে। বৃন্দাবনে নিকুঞ্জবনের পার্শ্বে গলির ভিতর পুরাণ-সীতানাথ নামে অদ্বৈত ও সীতাদেবীর অপর দারুময়ী মূর্ত্তিও আছে। সেটি তত প্রাচীন নহে।

৩। শৃঙ্গার-বট।

ইহার অপর নাম নিত্যানন্দ বট—যমুনার তীরে এই দেবালয়টী প্রতিষ্ঠিত। "ব্রজপরিক্রমা" গ্রন্থে লিখিত আছে—

দেখ এই অপূর্ব্ব বট যমুনার তীরে।
সকলে শৃঙ্গার-বট কহএ ইহারে॥
এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস।
বাড়াইল সুবলাদি সখার উল্লাস॥
ইহারেও নিত্যানন্দ-বট কেহ কয়।
যে যাহা কহএ তাহা সব সত্য হয়॥

শৃঙ্গার-বটের গোস্বামীরা কিন্তু বলেন, শ্রীরাধাঠাকুরাণী এই স্থানে বটবৃক্ষের নীচে বসিয়া বেশবিন্যাস করিতেন, সেই জন্য ইহার নাম শৃঙ্গারবট হইয়াছে। তীর্থভ্রমণ কালে নিত্যানন্দ প্রভু কিছুকাল এই

বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখন নিত্যানন্দ-বংশীয়েরা এই দেবালয়ের মালিক। এখানকার প্রধান বিগ্রহ নিতাই ও চৈতন্যমূর্ত্তি, এবং তৎসঙ্গে রাধাকৃষ্ণেরও সেবা আছে। দেবালয়টী বহু পুরাতন হইলেও ভগ্ন নহে। বাঁকুড়া জেলার পুরণিয়া গ্রাম হইতে পরমানন্দ গোস্বামী নামক একজন, নিত্যানন্দ-প্রভুবংশীয় সন্ন্যাসী আসিয়া প্রথমে এই স্থানে দেবালয় স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র—রসিকানন্দ, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে সপরিবারে যাইয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। রসিকানন্দের বংশীয়েরা এখন পালাক্রমে এ দেবালয়ের সেবাইত। ইহাঁরা বড় অমায়িক প্রকৃতির লোক। পূর্ব্বে বেদীর উপর যে শৃঙ্গার-বটটী ছিল, সেটি এখন কালবশে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তাহার বীজে উৎপন্ন অপর একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ, ঘাটের সোপানপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

বৈষ্ণব-গ্রন্থ-মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর এইরূপ জীবনী পাওয়া যায় ঃ—

বীরভূমের অন্তর্গত একচক্রা গ্রামে ১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ অঃ) মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দিনে বটব্যালোপাধিক শ্রীমুকুন্দ ওঝার (ডাকনাম হাড়াই ওঝা) ঔরসে পদ্মাবতী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। পিতামহের নাম সুন্দরামল্ল বাঁড়ুড়ী। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী আসিয়া ইঁহাকে পিতামাতার নিকট হইতে ভিক্ষাস্বরূপ লইয়া নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে যান। তীর্থ-ভ্রমণ-কালে নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রপুরী নামক একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন; এবং তাহার পর বৃন্দাবন আইসেন। কেহ কেহ ইঁহাকে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতির শিষ্য বলিয়া থাকেন। বিংশ বর্ষ যাবৎ নানা দেশ ও তীর্থ পর্য্যটন করিয়া, নিত্যানন্দ নবদ্বীপে নন্দন আচার্য্যের গৃহে আসিয়া চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্য-

দেব ইহা অপেক্ষা বার বৎসরের বয়ঃকনিষ্ঠ। ইনি, চৈতন্যদেব ও অদ্বৈত প্রভুর সহিত মিলিত হইয়া, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার নানা স্থানে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। একদিন নবদ্বীপে নগর-সংকীর্ত্তনকালে, জগাই ও মাধাই নামক দুইজন দুশ্চরিত্র মদ্যপায়ী আসিয়া কলসীর কাণা মারিয়া, নিত্যানন্দের অঙ্গে শোণিতপাত করিল। দয়াল নিতাই ইহাতে কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ বা বিচলিত না হইয়া, হাসিমুখে প্রেমভরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া, হরিনামামৃত দানে পাপিষ্ঠদ্বয়কে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

প্রবাদ এইরূপ যে, পুরী যাইবার পথে একদিন নিত্যানন্দকে নিজ হস্তোপরি মস্তক রক্ষা করিয়া শয়ন করিতে দেখিয়া, চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে বলেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বলেন যে, সে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নহে; চৈতন্যদেবের নিজের সন্তানাদি ছিল না, সেই কারণেই তিনি নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করিয়া বংশরক্ষা এবং তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত নব-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিবার ভার বা আদেশ দিয়াছিলেন। সে আদেশ পূর্ব্ব প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে।

যে জন্যই হউক, নিত্যানন্দ প্রৌঢ়বয়সে বঙ্গদেশে শালীগ্রামে আসিয়া, সূর্য্যদাস সারখেলের বসুধা ও জাহ্নবা নাম্নী দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। সূর্য্যদাস প্রথমে সন্ন্যাসী বলিয়া, নিত্যানন্দ প্রভুকে কন্যা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়াছিলেন। পরে বসুধার অকস্মাৎ সর্পাঘাত অথবা অপস্মার রোগে মৃত্যু ঘটে। দাহ জন্য তাঁহাকে তীরস্থ করিলে, নিত্যানন্দ প্রভু দৈবশক্তিবলে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিতা করিয়া, পরে বিবাহ করেন। তাহার পরে জাহ্নবা দেবীকেও যৌতুক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহার পর নিত্যানন্দ

প্রভু খড়দহে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ত্রিপুরাসুন্দরী নামে শক্তিদেবীর যন্ত্রমূর্ত্তি ও অনন্তদেব নামক বহুচক্রবিশিষ্ট শাল-গ্রাম-শিলা পূজা করিতেন। তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্র খড়দহে বর্ত্তমান শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

বীরচন্দ্রের তিন পুত্র। জ্যেষ্ঠ গোপীজনবল্লভ, নোতা বা মাড়ো-গ্রামে; ২য় রামকৃষ্ণ, খড়দহে; ৩য় রামচন্দ্র, মালদহের গয়েজপুরে গদিস্থাপন করিয়া যান। রামচন্দ্রের বংশীয় কোন গোস্বামী বাঁকুড়া জিলায় পুরণিয়া গ্রামে যাইয়া বাস করেন; শৃঙ্গার-বটে মন্দির-স্থাপয়িতা পরমানন্দ গোস্বামী এই রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব।

জাহ্নবাদেবীর গর্ভে নিত্যানন্দের অনেকগুলি সন্তান হইয়া শৈশবেই প্রাণত্যাগ করে। কেবল বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র নামে একটি পুত্র ও গঙ্গা নাম্নী একটি কন্যা রক্ষা পাইয়াছিলেন। "অদ্বৈতপ্রকাশ" গ্রন্থে দেখিতে পাই, চৈতন্যদেবের তিরোধানের ৮ বৎসর পরে, ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে, জয়ানন্দ লিখিত চৈতন্যমঙ্গলের মতে "আশ্বিন মাসেতে. যোগ কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। নিত্যানন্দ বৈকুণ্ঠ চলিল ছাড়ি ক্ষিতি"।

ইঁহার তিরোধান কিরূপে হয়, সে বিবরণ কোনও গ্রন্থে নাই; তবে কেহ কেহ বলেন, ভাগীরথী জলে মগ্ন হইয়া দেহাবসান হইয়াছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মতে ইনি বলদেবের অবতার। ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থ নাই। চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবন দাস ও চরিতামৃত-প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইঁহার শিষ্য।

৪। অক্রূর-ঘাট

দ্বাপর যুগে যমুনাতীরবর্ত্তী এই ঘাটে, মথুরা হইতে বৃন্দাবন-প্রবেশ-

পথে রথ রাখিয়া, কংসপ্রেরিত দূত অক্রূর, শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবকে আনিবার জন্য নন্দভবনে গিয়াছিলেন। চরিতামৃতে লিখিত আছে যে, মথুরা সহরে লোকের অধিক জনতা দেখিয়া, চৈতন্যদেব এই অক্রূর ঘাটে আসিয়া বিরলে অবস্থান করিতেন। সে সময়কার সমস্ত সোপান ও গৃহাদি এখন কালবশে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অল্পদিন হইল,একজন সওদাগর পুরাতন ভিত্তির উপর ছোট একটী মন্দির করিয়া দিয়াছেন। তাহার ভিতর শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব ও অক্রূরের মূর্ত্তি আছেন। পুরাতনের মধ্যে কেবল একটী ভগ্নপ্রায় ছোট মন্দিরের ভিতর পঞ্চমুখী হনুমানজী, অতীত কালের সাক্ষিস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছেন। দুই এক স্থানে পুরাতন ভিত্তি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনা নদী এখান হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই তীরবর্ত্তী পথ দিয়াই লোকে মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যাতায়াত করিত। এখন অন্যস্থান দিয়া, একটি পৃথক নূতন পাকা রাস্তা হইয়াছে।

চৈতন্যদেব যখন এখানে ছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া এক অদ্ভুত জনরব উঠে। চরিতামৃত হইতে সে গল্পটি উদ্ধৃত করিতেছি—

“বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হইতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হইতে করিলে আগমন॥
লোক কহে কৃষ্ণ প্রকট কালীদহের জলে।
কালী শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥

সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইল দর্শন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ দরশন।
নিজজ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য ভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ দরশনে॥
তবে তাহে কহেন প্রভু চাপড় মারিয়া।
মূর্খের বাক্যে মূর্খ হইলা পণ্ডিত হইয়া॥
কৃষ্ণ কেন দরশন দিবে কলিকালে।
নিজভ্রমে মূর্খলোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হইও ঘরে রহত বসিয়া।
কৃষ্ণদর্শন করিও কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্যলোকে প্রভূ-স্থানে আইলা।
কৃষ্ণ দেখি আইল প্রভু তাহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া॥
দূর হইতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম।
কালীয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালীয় জ্ঞান দীপ রত্নজ্ঞানে।
জালিয়াকে মূঢ়লোক কৃষ্ণ করি মানে॥

(মঃ লীঃ, ১৮ পঃ)

চৈতন্যদেব একদিন এইস্থান হইতে যমুনার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। পুনঃ দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিয়া তাঁহার সঙ্গী ও পাচক বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে এই স্থান হইতে সরাইয়া প্রয়াগে লইয়া গিয়াছিলেন। এস্থানে চৈতন্যদেবের কোন চিহ্নাদি পাই নাই।

৫। ভোজন টীলা।

অক্রূর-ঘাট হইতে অল্পদূরে একটী পুরাতন ২০।২৫ ফুট উচ্চ ভাতরোল নামে টীলার উপর একটী ভগ্ন মন্দির আছে। এখানে আজকাল আর ঠাকুর বা লোকজন কেহই থাকে না। সমস্ত স্থানই ভগ্ন শূন্য ও পড়িয়া রহিয়াছে। তবে সেকালে টীলার উপর কিরূপ প্রণালীতে মন্দিরাদি গঠিত হইত, এটি দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দর্শনযোগ্য ধ্বংসাবশেষ বলিয়া এটীর উল্লেখ করিলাম। "ব্রজপরিক্রমা" গ্রন্থে ইহার নাম ভোজন-টীলা। ব্রজবাসীরা বলেন, শ্রীকৃষ্ণ মুনিপত্নীগণের নিকট হইতে অন্ন ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, সখাগণ সঙ্গে এখানে ভোজন করিয়াছিলেন। এখানে বিহারীজী নামে বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের যে ঠাকুর ছিল, তাহা এখন মথুরায় আছেন। মথুরা যাইবার নূতন পথ হওয়াতে এদিকে যাত্রী বা লোক-সমাগম কমিয়া গিয়াছে।

৬। আমলীতলা।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে এই নির্জ্জন স্থানে বসিয়া চৈতন্যদেব আহ্নিক ও নাম-সংকীর্ত্তন করিতেন।

' তেঁতুল তলাতে আসি করিল বিশ্রাম॥
কৃষ্ণলীলা কালের বৃক্ষ পুরাতন।

তার তলে পিঁড়ি বান্ধা পরম চিক্কণ ॥
নিকটে যমুনা বহে শীতল সমীর।
বৃন্দাবন শোভা দেখি যমুনার নীর ॥
তেঁতুল তলাতে বসি করেন নাম সংকীর্ত্তন।
মধ্যাহ্ন করি আসি করে অক্রূরে ভোজন ॥
অক্রূরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে।
লোক ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে ॥
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে।
নাম সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্তে ॥

সে পুরাতন তেঁতুল গাছটী নাই। এখন যেটী আছে, সেটির বয়স ৫০।৬০ বৎসর হইবে। ইহার তলদেশে বেদী গাঁথান, তাহার উপর শ্বেতপ্রস্তরে চৈতন্যদেবের চরণচিহ্ন অঙ্কিত আছে। যমুনার দিকে প্রাচীর দেওয়া বলিয়া, অনেক গলির ভিতর দিয়া এখানে যাইতে হয়। নিত্যানন্দবংশীয় গোস্বামীরা ইহার পার্শ্বে একটি মন্দির করিয়া দিয়াছেন, সেটি সংস্কারাভাবে ভগ্নপ্রায়। তথায় নিতাই ও চৈতন্য মূর্ত্তি আছে।

এই স্থানেই কৃষ্ণদাস নামক রজপুত আসিয়া, চৈতন্যদেবের শিষ্য হইয়াছিলেন। এবং সেই কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালীই পঞ্জাব, গুজরাট, সুরাট, প্রভৃতি স্থানে গৌড়ীয় মত প্রচার করেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১। ধীরসমীর, ২। উদ্যান, ৩। কুণ্ড, বাপী ও কূপ।

১। ধীরসমীর।

"ধীরসমীর" কুঞ্জ বা দেবালয়টী নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশুর—সূর্য্যদাস

সারখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গৌরীদাস পণ্ডিত স্থাপিত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের শিষ্য গৌরীদাস, নবদ্বীপ হইতে সুবৃহৎ নিম্ববৃক্ষ আনাইয়া অম্বিকানগরে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভুর দুইটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ-জীবনে তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া শ্যামরায় নামে ঠাকুর ও ধীরসমীর কুঞ্জ স্থাপন করেন। এখানে তাঁহার সমাধি আছে। চরিতামৃতে এ দেবালয়ের উল্লেখ নাই। ব্রজপরিক্রমা-গ্রন্থকার বলেন যে, জয়দেব গোস্বামী "ধীরসমীরে, যমুনাতীরে, বসতি বনে বনমালী" বলিয়া যে কুঞ্জের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, এটী সেই স্থান। এই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্—"

বলিয়া চরণে ধরিয়া শ্রীরাধার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধার চরণ মস্তকে ধারণ করিতেছেন, এই কথাটি বাঙ্গালী কবি জয়দেব বোধ হয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্ম-খণ্ডের ৬৭ অধ্যায়ের ৭৮ শ্লোক হইতে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। সে শ্লোকটি এই—

"অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি॥"

অর্থ—আমি কলা-দ্বারা শেষ (নাগ)। তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা। হে সুন্দরী, শস্য-রত্নাধার-স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি।

আমরা অনুমান করি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই উক্তিটুকু দেখিয়াই রাধাপদ মস্তকে ধারণের ভাবটুকু কবির মনে উদয় হইয়া থাকিবে।

নতুবা কোনও পুরাণে না থাকিলে, "এত বড়" কথাটি তিনি লিখিতে কোনরূপে সাহসী হইতেন না।

মতান্তরে—রাসলীলায় অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণকে নিশীথকালে বনে বনে অন্বেষণ-ক্লান্তা "পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ" গোপিকাগণ সমক্ষে "তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ", এই কুঞ্জে দর্শন দিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যমুনার ভাঙ্গনে ধীর সমীরের কয়েকটা ঘর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাটীটী পুরাতন ও জীর্ণশীর্ণ। এখানে দর্শন-উপযোগী কোনরূপ কারুকার্য্য নাই।

২। উদ্যান।

সেকালে বৃন্দাবনে অনেকগুলি উদ্যান রচিত হইয়াছিল। সেগুলিকে লোকে উদ্যান না বলিয়া বন বলিয়া থাকে। তাহার কতকগুলি এখনও আছে; কতকগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহাদের নাম এই— ১ম, অটল বন—এখানে অটলবিহারী ঠাকুর আছেন। ২য়, কেবারি বন—এই বনে শ্রীকৃষ্ণ দাবানল ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এখানকার পাথরে গাঁথান দাবানল-কুণ্ডের জল সুপেয়। ৩য়, বিহার বন—এখানে রাধাশ্যাম নামে একটি কূপ আছে। যাত্রীগণ তথায় রাধাশ্যাম শব্দ উচ্চারণ করিলে কূপের ভিতর হইতে তাহার প্রতিধ্বনি উঠে। ৪র্থ, গোচারণ বন—এখানে অনুচ্চ টীলার উপর বরাহ-মূর্ত্তি ও সৌভরি মুনির আশ্রম আছে। ৫ম, কালীয়দমন বন—এখানে কদম্ব বৃক্ষের উপর হইতে শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে দমন করিবার মানসে যমুনায় ঝম্প দিয়াছিলেন। এই বৃক্ষের কিছু উত্তরে কালীয়-মর্দ্দন ঠাকুর আছেন। ৬ষ্ঠ, গোপাল বন—এই স্থানে কালীয় হ্রদ হইতে উত্থিত

শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল জন্য, নন্দ ও যশোদা গো-দান করিয়াছিলেন। ৭ম, রাধাবাগ—যমুনাতীরে এই উদ্যানে শ্রীরাধা সখিগণ-সহ পুষ্পবৃক্ষ-সকল রোপণ করিয়াছিলেন। ৮ম, ঝুলন-বন। ৯ম, গহ্বর বন। ১০ম, পপর বন। শেষ তিনটি স্থানে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। ১১শ, নিধুবন—তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী এই স্থানে বিশাখা-কুণ্ড হইতে বাঁকেবিহারী ঠাকুর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানে হরিদাস স্বামীর "সমাজ" আছে। তথায় স্বামীজীর চিত্র প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে। ব্রজবাসীরা বলেন, এই স্থানে শ্রীরাধা রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ কোটাল-বেশে দ্বাররক্ষা করিয়াছিলেন। (রাইরাজা লীলা)। এখানকার সকল বৃক্ষগুলি ব্রজের রজঃস্পর্শের আশায় নিজ নিজ শাখা নিম্নাভিমুখী করিয়া দিয়াছেন। এ উদ্যানটি রাধারমণের বাটীর সন্নিকট, পথপার্শ্বে লম্বা প্রাচীর দেওয়া। হরিদাস স্বামী জীবিতকালে এই স্থানেই থাকিতেন বলিয়া শুনা যায়। ১২শ, নিকুঞ্জবন—এ স্থানটি রাধাদামো-দরের বাটীর নিকট ও রাধাবল্লভ ঠাকুরের গোস্বামিগণের অধীন। একটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত ছোট মন্দিরের ভিতর রাধিকার চিত্রপট পূজা হইয়া থাকে। এই পটে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার চরণ সেবা করিতেছেন, অথবা "রাধে মৃন্ময়ং পরিহর হরিঃ পাদমূলে তবায়ং" অঙ্কিত আছে। একটি শয্যাও বিন্যস্ত আছে। ব্রজবাসীরা বলেন, আজিও প্রতিরাত্রিতেই রাধাকৃষ্ণ এই কুঞ্জে আসিয়া বিহার করেন। সেই জন্য লোকে এই উদ্যানটিকে "সেবাকুঞ্জ" বলিয়া থাকে। রাত্রিকালে পূজারিরা পর্য্যন্ত এখানে থাকেন না। ললিতা নামে একটী বাঁধান কুণ্ড ও কেলিকদম্ব নামে একটি বৃক্ষ আছে। বৃক্ষটির গাত্রে অনেক স্থানে মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। পূজারীরা বলেন,

শ্রীকৃষ্ণ মাখন খাইয়া এই বৃক্ষের গায়ে হাত মুছিয়াছিলেন বলিয়া এইরূপ চিহ্ন হইয়াছে। আমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে ইহার একটি শাখার গ্রন্থিতে গোলাকার কৃষ্ণবর্ণ শালগ্রামের আকৃতি দেখিয়াছিলাম। এখন সে শাখাটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখানে বানরের সংখ্যা কিছু অধিক। অযোধ্যার রাণী এই সেবাকুঞ্জের ভগ্নপ্রায় প্রাচীরাদি, অল্পদিন হইল মেরামত করিয়া দিয়াছেন। এ উদ্যানে অপর যে সকল বৃক্ষ আছে, সেগুলির শাখাও নিম্নাভিমুখী। নিধুবন ও নিকুঞ্জ বন উভয় স্থানেই কয়েকটা "মুক্তাফলে"র গাছ আছে, তাহাতে সরিষা অপেক্ষা কিছু বড় লালবর্ণের ফুল ধরে, ফল পাকিয়া শাদাবর্ণ হইলে মুক্তার মত দেখায়।

আমরা উপরে যে দ্বাদশটি উদ্যানের নাম করিলাম, এগুলি অতি প্রাচীন। এতদ্‌ভিন্ন লালাবাবু, শেঠজী প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের দেবালয়ে নূতন উদ্যান রচনা করিয়াছেন। সেগুলির বিবরণ যথাস্থানে দিব।

৩। কুণ্ড, বাপী ও কূপ।

বৃন্দাবনে যে সকল কুণ্ড আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্ম-কুণ্ড ও গোবিন্দ-কুণ্ডই উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মা এই স্থানে গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড হইয়াছে। "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থে দেখিতে পাই, ব্রহ্ম-কুণ্ড-তট হইতে রূপ গোস্বামী বৃন্দাদেবীকে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরে এই মূর্ত্তিটী গোবিন্দজীর মন্দিরের বামদিকে একটী ছোট মন্দিরের ভিতর স্থাপিত করিয়া পূজা করা হইত। আওরঙ্গজেবের উপদ্রবে, যখন বৃন্দাবনের বিগ্রহগুলিকে স্থানান্তরিত করা হয়, তখন বৃন্দাদেবীকেও শকটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

কাম্যবনে ইহাঁর রথের চাকা মাটীতে বসিয়া যাইয়া অচল হইয়া পড়ে। তদবধি দেবী কাম্যবনে অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্ম-কুণ্ডটীর চারিদিক লাল পাথরে বাঁধান, এবং ঘাটের উপরে চারিটি গম্বুজ বা ছত্রী দেওয়া। এখন সকল স্থানেই পাষাণ-গুলি খসিয়া পড়িতেছে। চারিটা ছত্রীও পতনোন্মুখ। জল দুর্গন্ধ ও বিবর্ণ। তথাপি ভক্তগণ এ জলে স্নানপানে বিমুখ নহেন। কেহ কেহ বলেন, আকবরের রহস্যপ্রিয় ব্রাহ্মণ-অমাত্য বীরবল এই ব্রহ্মকুণ্ড বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

গোবিন্দ-কুণ্ড—এটীও চারিদিকে বাঁধান ছিল। রাজসাহীর জমিদার-পত্নী ৺কালীসুন্দরী চৌধুরাণী ৩০০০০৲ টাকা ব্যয়ে এই গোবিন্দ-কুণ্ড বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। এখন নানা স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে ঘাট বা গম্বুজ নাই। বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে জলও থাকে না।

মল্‌হর রাওয়ের বাউলী (বাপী)—বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইবার পথে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মল্‌হর রাওয়ের কদম্বখণ্ডী নামে একটি উদ্যান ছিল। এখন সে উদ্যান ভাঙ্গিয়া মাঠ হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিতর বহু অর্থ ব্যয়ে একটী সুগভীর বাপী বা বাউলী নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে সকল কূপের পার্শ্বে সোপান দিয়া নিম্ন পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, সে কূপগুলিকে বাউলী বা বাপী বলে। এখন এ বাউলীর উপরের চাঁদনী প্রভৃতি পড়িয়া গিয়াছে। তথাপি মৃত্তিকার ভিতর যে সকল সোপানাদি বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সামান্য ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় নাই। সোপানের দিকে কূপের গাত্রে সাধু-সন্ন্যাসীগণের থাকিবার জন্য কয়েকটা ঘরও আছে। কূপের উপর হইতে জল তুলিয়া পুষ্পবৃক্ষাদিতে সিঞ্চন করা হইত। স্ত্রীলোকেরা

সোপান বাহিয়া, কলসী ভরিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইত। কেহ কেহ বলেন, এটি অহল্যা বাইয়ের কীর্ত্তি। তাঁহার শ্বশুরের নাম মল্হর-রাও বা মল্লারাও। তাঁহার নামেই এ বাউলী খ্যাত। ইহার অল্প দূরেই অহল্যা-গঞ্জ নামক পল্লী।

গোপাল রাওয়ের বাউলী বা বাপী,—উপরি উক্ত বাউলী হইতে এটী উত্তরে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহার গাঁথনিগুলিও তত মজবুত নহে। উপরে একটি ছোট দেবালয় আছে।

কূপ—বৃন্দাবনে যমুনাতীরবর্ত্তী সকল কূপেরই জল সুমিষ্ট ও সুপেয়। দূরবর্ত্তী কূপগুলির জল কিছু লবণাক্ত (খারা পানি।) কাশী-ধামে যেমন গৈবী কূপের জল প্রসিদ্ধ, এখানকার দিল্লী-কূপের জলও সেইরূপ অতি উপাদেয়। এ কূপটী সাহজীর মন্দিরের পার্শ্বে গলির ভিতর অবস্থিত। এখানকার সৌখিন ও ধনী লোকেরা এই কূপের জল ক্রয় করিয়া পান করেন। ছোট হাত-গাড়ী করিয়া বহু কলস জল প্রতিদিন বিক্রয় হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বেণুরবে যে বেণুকূপ সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা এখন শেঠেদের মন্দিরের ভিতর রহিয়াছে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ আখড়া, মৌনীদাসের টাটী, জ্ঞানগুদরী,
যমুনা-পুলিন ও চৌষট্টি-মোহান্তের সমাজ।

আখড়া—বৃন্দাবনে ১৬টী আখড়া ছিল। এখন তাহার চারিটী লুপ্ত হইয়া কেবল ১২টী আখড়া আছে। আখড়া হইবার এইরূপ বিবরণ ব্রজবাসীগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সকলেই জানেন

যে, মুসলমান-সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে ঠগ্‌ ও জলদস্যুগণের কতই উপদ্রব ছিল। তদুপরি শৈব ও বৈষ্ণবগণের মধ্যে বিরোধবশতঃ বৈষ্ণবেরা বড়ই হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ সময়ে, উজ্জয়িনী নগরীতে লছমন গিরি (লক্ষ্মণ গিরি) নামে একজন পরাক্রান্ত শৈব সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা অসহায় নিরীহ বৈষ্ণবগণের প্রাণবধ করিয়া, আপনাদিগের শৈব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যেরা, জগৎ হইতে বৈষ্ণব নাম বিলুপ্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভয়ে বৈষ্ণবেরা কোন তীর্থে যাইতে অথবা হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় যোগদান করিতে সাহস করিতেন না। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণগিরি প্রত্যহ অন্ততঃ একজন বৈষ্ণবের প্রাণ-সংহার না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।

এই সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে, ভারতের নানা স্থানের বৈষ্ণবেরা ইহার প্রতিকারের জন্য উদ্যোগী হইলেন। সেই সময় রাজপুতানার কিষণগড় রাজ্যের অন্তর্গত, সেলিমাবাদ নামক স্থানে আলেখ্‌রাম বাবা নামে, একজন বেতালসিদ্ধ প্রবল পরাক্রান্ত, বৈষ্ণব সন্ন্যাসী থাকিতেন। তাঁহার মূল আখড়া আজিও সেলিমাবাদে আছে। তিনি ব্রাহ্মণ ভিন্ন, অপর সকল জাতিকেও বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বলিষ্ঠ-দেহ যুবাপুরুষ পাইলেই তাহাকে দীক্ষা দিয়া বৈষ্ণব করিতেন। লক্ষ্মণগিরি কেবল ব্রাহ্মণগণকে শিষ্য করিতেন। আলেখ্‌রাম বাবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা চণ্ডাল হইলেও, তাহাকে নিজ সম্প্রদায়ে আনিয়া দলপুষ্ট করিতে লাগিলেন। শুনিতে পাই, তাঁহার শিষ্যেরা বৈষ্ণব বলিয়া কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন না, বঙ্কিমবাবুর আনন্দমঠের সন্তানগণের ন্যায় অস্ত্র-

চালনা ও যুদ্ধবিদ্যা পর্য্যন্ত শিক্ষা করিতেন। জনরব আরও বলে যে, অর্থ-সংগ্রহ জন্য তাঁহারা চুরি বা ডাকাতি করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার লিখিত History of Aurungzebe পুস্তকে লিখিত আছে যে, 'সৎনামী' নামক এক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় বাদশাহের সহিত বিষম বিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এই রূপে বৈষ্ণবের দল, বলশালী ও সংখ্যায় অধিক হইলে, তাঁহারাও শৈব-সন্ন্যাসীদিগের সহিত সংগ্রামে সমকক্ষ ও জয়ী হইতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরাও ঝণ্ডা বা নিশান উড়াইয়া হাতী, ঘোড়া, উট লইয়া অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত, দলবদ্ধ হইয়া বৃন্দাবনে 'নাকা-ঘাট' অর্থাৎ পথের মধ্যে একটা আড্ডা করিল। এখানে সমবেত হইয়া,—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র, সনক অথবা রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক এই চারি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা একত্র সম্মিলিত হইয়া, হরিদ্বারের কুম্ভমেলা * দর্শনে যাইতে লাগিলেন। ইহাতে আর তাঁহাদের বিপদের সম্ভাবনা তত রহিল না।

এই সূত্রে, সেই সময়েই বৃন্দাবনে আখড়াগুলি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। সেগুলির নাম—(১) রামজী নির্ব্বাণী, (২) শ্যামজী

* যে বৎসর হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়, সে বৎসর হোলির সময়, ভারতের নানা দেশ হইতে যাত্রী, সাধু, সন্ন্যাসী, নাগা, বৈরাগী, উদাসী প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চল্লিশ, পঞ্চাশ হাজার বা তদধিক লোক আসিয়া বৃন্দাবনে সমবেত হয়। কেহ কেহ হাতী, ঘোড়া, উট সঙ্গে লইয়া ঝণ্ডা বা নিশান উড়াইয়া এখানে আইসেন। মাঠ, ঘাট, কুঞ্জ, পথ, পুলিন, সর্ব্বত্রই লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। দোকান-পাটও অনেক আইসে। অতিরিক্ত সশস্ত্র পুলিশ বসে। এখানকার ধনী লোকেরা সাধু-ভোজন করাইয়া থাকেন। তাহাদের মধ্যে এমত সাধুও আছেন, যাঁহারা দাতার ভাণ্ডার লুণ্ঠন, ও পরিবেশনকারীগণের উপর লাঠি চালাইতে পশ্চাৎপদ হন না। সে সময়ে সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়ে। অবশেষে কলেরা দেখা দেয়।

নির্ব্বাণী, (৩) মালাধারী নির্ম্মোহী, (৪) ঝড়িয়া নির্ম্মোহী, (৫) স্বাধা-বল্লভী নির্ম্মোহী, (৬) বিষণস্বামী নির্ম্মোহী, (৭) মহানির্ব্বাণী নির্ম্মোহী, (৮) রামানন্দী নির্ম্মোহী, (৯) রামজী দিগম্বরী, (১০) শ্যামজী দিগম্বরী, (১১) বলভদ্রী, (১২) নিরালম্বরী। সকল আখড়াতেই এক একজন প্রধান মোহান্ত থাকেন। তাঁহার গৃহস্থ ও উদাসীন বা সন্ন্যাসী চেলাও থাকে। গৃহস্থ শিষ্যেরা আখড়ার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক বা পর্ব্ব-উপলক্ষে বৃত্তি দিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী চেলারা স্বগ্রামে, বা নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা যেখানে যাহা পান, তাহা হইতে নিজ ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা তাঁহারা আখড়াধারী মোহান্তকে আনিয়া দেন। ইহাতেই আখড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। এতদ্ভিন্ন আখড়ায়, দেবকার্য্যের জন্য, ও মোহান্তের সেবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট চেলা আখড়াতেই অবস্থান করিয়া থাকেন। চেলাগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকেরাই লেখাপড়া জানেন। অধিকাংশ লোকেই নিরক্ষর, কেবল কয়েকটি হিন্দী দোহা ও গান শিখিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন।

(১) রামজী-নির্ব্বাণী। ইহা রামানন্দী সম্প্রদায়-ভুক্ত, এখানকার উপাস্য ঠাকুর রামসীতা। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মলুক দাসের এইরূপ জীবনী জানিতে পারিয়াছি।—

মলুকদাস এলাহাবাদের অন্তর্গত করামাণিকপুরের একজন বণিকের পুত্র। ইনি নবীন বয়সেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া রামানন্দী সম্প্রদায়ের একজন গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া বৈষ্ণব হন। প্রবীণ বয়সে ইঁহার অনেকগুলি চেলা হইয়াছিল। ইনি করা-মাণিকপুর, কাশী, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, অযোধ্যা, বৃন্দাবন ও জগন্নাথ-

ক্ষেত্রে ৭টি মঠ বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বাদশাহ আরঙ্গজীব, কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বাদশাহ ইঁহার অলৌকিক প্রভাবের কথা শুনিয়া ইঁহাকে চেলাগণ সহ দিল্লীতে ধরিয়া লইয়া যান। তথায় ইহাঁকে কেরামৎ বা বুজরুক (অলৌকিক শক্তি) দেখাইতে অনুরোধ করেন। মলুক দাস দেখাইতে অসম্মত হইলে, তাঁহাকে সদলে কারাগারে অবরুদ্ধ রাখেন, এবং প্রতি-কয়েদীর সম্মুখে এক একখানা যাঁতা রাখিয়া গম ভাঙ্গিবার জন্য আদেশ করেন। মলুকদাস তখন নিরুপায় হইয়া চেলাগণকে উচ্চৈঃস্বরে রামনাম গান করিতে বলেন এবং নিজ হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা যাঁতাগুলি স্পর্শ করিয়া নিজেও রামনাম গাহিতে থাকেন। স্পর্শমাত্র যাঁতাগুলি ঘুরিয়া আপনাআপনিই গম ভাঙ্গিতে লাগিল। এরূপ অলৌকিক প্রভাব দেখিয়া বাদশাহ তাঁহাকে বহু সম্মান করিয়া বৃন্দাবনে ও অন্যান্য স্থানে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

এই আখড়াটি যমুনার তীরে অবস্থিত—কিয়দংশ তাহারই গর্ভে বিলীন হইয়াছে। রামনবমীর দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। লোকে ইহাকে মলুকদাসের আখড়াও বলে।

(২) শ্যামজী-নির্ব্বাণী। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত, এই আখড়াটীও যমুনার তীরে পতনোন্মুখ অবস্থায় রহিয়াছে! এখানকার ঠাকুর রাধাবিহারীজী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণব হরিব্যাসজীর পরিচয় ভক্তমাল গ্রন্থে এইরূপ পাওয়া যায়। ইনি কাহার শিষ্য তাহা অজ্ঞাত। একদিন চটথাবল গ্রামে একটি উদ্যানমধ্যে দেবীমণ্ডপ-সম্মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন গ্রাম্য ইতর লোক আসিয়া দেবীর সম্মুখে ছাগ বলিদান করিল। জীবহিংসা দেখিয়া হরিব্যাসের প্রাণ কাতর ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। ইনি দেবীর উদ্দেশ্যে

নানারূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই বৃক্ষতলেই উপবাসে পড়িয়া রহিলেন। তখন—

দেবী জমিদারের কন্যার রূপ ধরি।
রন্ধনের সামগ্রী তণ্ডুল আদি করি॥
লইয়া গেলেন যথা সাধু আছে পড়ি।
রন্ধন করিয়া খাও কহে হাত জুড়ি॥

ভক্তমাল

সেই কন্যা পরে হরিব্যাসের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া নিজে বৈষ্ণবী হইলেন। এবং কন্যার অনুকরণে—"দীক্ষা করি গ্রাম শুদ্ধ হইল বৈষ্ণব।" তদবধি গ্রামস্থ সকলেই জীবহিংসা বন্ধ করিয়া দিল।

(৩) মালাধারী নির্ম্মোহী। এটিও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের আখড়া। অবস্থান যমুনাতীরে, ঠাকুর—যুগলকিশোরজী। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা মোহান্ত দিবানিশি মালা জপ করিতেন বলিয়া, এই আখাড়াটির নাম 'মালাধারী' হইয়াছে। অন্যে বলেন, ভক্তমালগ্রন্থে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী নামে যে সাধুর আখ্যান আছে, তিনিই এই আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণদাসের জন্ম লাহোরে। ইনি চৈতন্যদেবের খ্যাতি শুনিয়া গৌড়দেশে তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছিলেন। সে সময়ে চৈতন্যদেব বৃন্দাবনে আমলিতলায় অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণদাস গিয়া তাঁহার চরণে পড়িলেন।

মুচকি হাসিয়া প্রভু দয়ার্দ্র হইলা।
নিজকণ্ঠ হইতে গুঞ্জামালা তাঁরে দিয়া॥
অঙ্গে হস্ত বুলাইয়া বহু স্নেহ কৈলা।
গুঞ্জামালী বলিয়া আখ্যান তাঁর দিলা॥

চৈতন্যদেবের আদেশে কৃষ্ণদাস গুঞ্জামালী পাঞ্জাব, লাহোর, মুলতান, এমন কি গুজরাট, সিন্ধু ও সুরাট পর্য্যন্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এত উদার ছিলেন যে—

হিন্দু ত যতেক ছিলা বৈষ্ণব করিলা।
মোছলমান যত ছিল হরিভক্ত হইলা॥
গোসাঞির সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া যবন।
দীক্ষাভাবে সেই নাম করিল গ্রহণ॥
হরিনাম জপে, মালা তিলক ধারণ।
যবনের আচার তেজিল সর্ব্বজন॥

(ভক্তমাল)

গুঞ্জামালী শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

(৪) ঝড়িয়া নির্ম্মোহী। রামানন্দী সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠাতার নাম অজ্ঞাত। গোবিন্দজীর মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে, সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের যে শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে, তাহারই প্রাঙ্গণে ইঁহাদের আখড়া। কেবল ইঁহাদের "সিংহপৌড়" নামক হনুমান-ঠাকুরটি রাস্তার অপর দিকে একটি ছোট মন্দিরের ভিতর রক্ষিত আছেন। রামনবমীর দিন, মেলার সময় হনুমানজীকে এই আখড়ার প্রাঙ্গণে, বেদীর উপর, ঝণ্ডার তলে বার দেওয়া হয়। ব্রজবাসীরা বলেন, এই "সিংহপৌড়" হনুমান-মূর্ত্তিটি মান-সিংহ-নির্ম্মিত গোবিন্দজীর পূর্ব্বদিকের ফটকের উপরে শোভিত ছিলেন। আওরঙ্গজেব মন্দির ভাঙ্গিয়া দিলে, এই মূর্ত্তিটিকে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

(৫) রাধাবল্লভী নির্ম্মোহী। প্রতিষ্ঠাতা হরিবংশ গোস্বামীর সন্তানেরা, ঠাকুর হিতবল্লভ (কৃষ্ণমূর্ত্তি), সম্প্রদায় রাধাবল্লভী। গোবিন্দ ঘাটের উপর এই আখড়া অবস্থিত। এই আখড়ার সম্মুখেই রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের

গোলাকার রাসমণ্ডলের বেদী আছে। তথায় রাধার নাম-লেখা শিলার পূজা হয়।

(৬) বিষণ-স্বামী নির্ম্মোহী। প্রতিষ্ঠাতা বল্লভাচার্য্য, ঠাকুর বিজয়-বিহারী (বালগোপাল মূর্ত্তি), অবস্থান যমুনা পুলিনের নিকট। বৃন্দাবনে ইঁহাদের সম্প্রদায়কে বল্লভকুল বলে। গোবর্দ্ধনে, কাম্যবনে, গোকুলে, মথুরায় ও বারাণসীতে ইঁহাদের মঠ ও মন্দির আছে।

(৭) মহানির্ব্বাণী নির্ম্মোহী। প্রতিষ্ঠাতা মথুরমল্ল, অবস্থান যমুনার তীরে, হুলাসবিহারী নামে রাধাকৃষ্ণ ও গোপাল-মূর্ত্তি এখানকার ঠাকুর।

(৮) রামানন্দ নির্ম্মোহী। সম্প্রদায় রামানন্দী, প্রতিষ্ঠাতা হৃদয়-রাম বাবাজী। যমুনাপুলিনে জ্ঞানগুদরীর পার্শ্বে ইহার অবস্থান। ঠাকুর রামসীতা। তৎসঙ্গে হিন্দী-রামায়ণ-রচয়িতা তুলসীদাসের পিত্তল-নির্ম্মিত মূর্ত্তিরও পূজা হইয়া থাকে। আমরা তুলসীদাসের প্রবন্ধে এই আখড়ার বিবরণ দিয়াছি। কীল্হজী, অগরদাসজী, এবং হিন্দী-ভক্তমাল-রচয়িতা নাভাজী এই আখড়ায় বাস করিতেন। ভক্তমাল গ্রন্থে নাভা-জীর এইরূপ জীবনী আছে। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন তাঁহার জননী, দুর্ভিক্ষে পড়িয়া তাঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া যান। কীল্হজী ও আগরদাসজী নামক দুইজন রামানন্দী সন্ন্যাসী, অসহায় শিশুকে কুড়াইয়া লইয়া গিয়া আহারাদি দিয়া পালন করেন। তাঁহাদের মন্ত্রপূত কমণ্ডলু-জলে নাভাজীর দৃষ্টিসঞ্চার হয়। পরে তিনি তাঁহাদের নিকট বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, বিদ্যা-শিক্ষা করেন এবং গুরুর আদেশে ভক্তমালগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

(৯) রামজী দিগম্বরী। সম্প্রদায় রামানন্দী, ঠাকুর রামসীতা, দেবালয় যমুনাতীরে, ভগ্নপ্রায় অবস্থা।

(১০) শ্যামজী দিগম্বরী। প্রতিষ্ঠাতা অজ্ঞাত, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, ঠাকুর পুলিনবিহারী, তৎসঙ্গে বিষ্ণুমূর্ত্তিও আছেন। অবস্থান পুলিন-পার্শ্বে। এ আখড়াটী বোধ হয় ধনীলোকদিগের ব্যয়ে পরিচালিত। কোনস্থান ভগ্ন বা বিপর্য্যস্ত নহে। স্থানে স্থানে কারুকার্য্যও আছে।

(১১) বলভদ্রী। মধ্বাচারী সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানন্দ-বংশীয় শৃঙ্গারবটের গোস্বামীগণ, বলদেবজী এখানকার ঠাকুর, অবস্থান ধীর-সমীরের নিকট। মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের কোন বিখ্যাত লোক আসিলে এই আখড়ায় থাকেন।

(১২) নিরালম্বরী। রামানন্দী সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠাতা অজ্ঞাত, ঠাকুর রামসীতা, অবস্থান যমুনাতীরে, ভগ্নপ্রায় অবস্থা।

মৌনীদাসের টাটি। এস্থানটিকে আখড়া অথবা দেবালয় বলিলেও চলে। এটী যমুনার তীরদেশে অবস্থিত। যে সকল ঘাট বা সোপানাদি ছিল, সে সমস্তই নদীগত হইয়াছে। এখন কেবল এখানে ললিতকিশোর নামে ঠাকুরের মন্দির ও মৌনীদাসের সমাধি আছে। চারিদিকে উদ্যান। ইঁদারা হইতে জল তুলিয়া নালা দিয়া পুষ্পবৃক্ষে সেচন করা হয়। ব্রজবাসীরা বলেন, আকবর বাদসাহ এইস্থানে বজরা লাগাইয়া হরিদাস স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। হরিদাসস্বামী এখানে স্নান আহ্নিক পূজাদি করিতেন। গ্রাউস্ সাহেব, তাঁহার লিখিত ইংরাজী মথুরা-বিবরণ গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে দিল্লীপতি আকবর, সামন্ত রাজগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, রূপ, সনাতন, হরিদাস, প্রভৃতি সাধু ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট, বৈষ্ণবধর্ম্মের সার তত্ত্ব জানিবার জন্য বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন।

দিল্লীশ্বরের চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া, তাঁহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাঁহাকে অলৌকিক দৈব-প্রভাব সকল দেখান হয়। তিনি এই

স্থানের লোকাতীত মাহাত্ম্য বুঝিয়া, এবং যমুনাবেষ্টিত এই স্থানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, সঙ্গী হিন্দু সামন্তরাজগণকে বৃন্দাবনে মন্দিরাদি করিবার জন্য উপদেশ দিয়া যান। (Growse's Mathura, p. 241)। ব্রজবাসীরা বলেন, সম্রাট এই মৌনীদাসের আখড়া হইতে প্রসিদ্ধ গায়ক তানসেনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এই স্থানেই কোন কায়স্থ ভক্ত হরিদাস স্বামীকে ঠাকুরের জন্য উৎকৃষ্ট আতর উপহার দিলে, তিনি বালুকার উপর সমস্ত আতরটুকু ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ভক্ত পরে মন্দিরে গিয়া দেখেন যে,বাঁকেবিহারী ঠাকুরের অঙ্গ বহিয়া আতর গড়াইয়া পড়িতেছে, মন্দির সৌরভে ভরপুর।

হরিদাস নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এতৎ-সম্প্রদায়ের মৌনীদাস নামক একজন বৈষ্ণব আসিয়া ললিতকিশোরজী ঠাকুরের মন্দিরটি করিয়া দেন। ভাদ্রমাসে রাধাষ্টমী দিনে এখানে সঙ্গীতপ্রিয় গায়কগণের মেলা বসিয়া থাকে। যে-কোন ওস্তাদ বা গায়ক বৃন্দাবনে আইসেন, তিনি অন্ততঃ দুইএক দিনও এখানে কণ্ঠসাধনা করিয়া যান।

জ্ঞানগুদরী। কাশীতে যেমন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরপার্শ্বে জ্ঞান-কূপ আছে, বৃন্দাবনেও তেমনি জ্ঞানগুদরী নামক ক্ষুদ্র দেবালয়, যমুনা-পুলিনপার্শ্বে অবস্থিত। এই একতালা ছোট দেবালয়ে জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পূজা হইয়া থাকে। ব্রজবাসীরা বলেন, উদ্ধব এইস্থানে ব্রজগোপীগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে আসিয়া নিজেই, তাঁহাদের নিকট প্রেমভক্তি-সাধন শিখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এখানে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম জ্ঞানগুদরী হইয়াছে। গুদরী হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ কাঁথা, বা আচ্ছাদন। তাঁহারা আরও বলেন যে,

এই স্থান হইতেই "ভ্রমরগীতা" নামক গ্রন্থের উৎপত্তি। এ মন্দিরে দর্শনীয় শিল্প কিছুই নাই।

যমুনা-পুলিন। রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামিপাদেরা পঞ্চ-ক্রোশ পরিধি-বিশিষ্ট আধুনিক সমস্ত বৃন্দাবনকেই রাসস্থলী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। আজকাল ব্রজবাসীরা যমুনাপুলিন নামক ২০।২৫ বিঘা মাত্র বালুকাকীর্ণ ভূমিকে, রাসস্থলী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। * এ স্থানের চারিদিক, ধনী লোকদিগের উচ্চ অট্টালিকা-সদৃশ দেবালয়ে পরিবেষ্টিত। বর্ষাকালে যখন যমুনা উদ্বেলিত হইয়া, এ মাঠের উপর জল আইসে, তখন নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসিয়া সেই অল্প জলে গড়াগড়ি দিয়া, স্নান করিয়া পবিত্র হয়েন। জলপ্লাবন সময়ে এখানে অতিশয় জনতা হইয়া থাকে।

---

* স্কন্দপুরাণে মথুরাখণ্ডে লিখিত আছে—

"অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ।"

আবার পাতালখণ্ডে—

"পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।"

ভাগবতের ১০ম স্কন্দে বৃন্দাবন-বর্ণনায়—

"পুণ্যাদ্রি-তরু-বিরুধং"—১১ অ, ১৮ শ্লোক।

অন্যত্র— "প্রেক্ষাদ্রি সান্বয়পর"—২১ অ, ১০ শ্লোক।

ব্রজপরিক্রমাকারও লিখিতেছেন—

"বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ লোকে এ প্রচার।
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ পঞ্চ যোজন বিস্তার॥"

পুণ্যাদ্রি গোবর্দ্ধন, বর্ত্তমান বৃন্দাবন হইতে নয় দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পৌরাণিক যুগে পঞ্চ যোজন (৬০ ক্রোশ)-ব্যাপী গোবর্দ্ধন-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমিকে, বা সমস্ত ব্রজমণ্ডলকে বৃন্দাবন আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান পঞ্চ-ক্রোশী বৃন্দাবন তাহারই 'রাসস্থলী' নাম্নী অংশ মাত্র।

চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ। গোবিন্দজীর মন্দিরের অপর দিকে, শেঠেদের মন্দিরের পার্শ্বে, এই প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিক্ষেত্র অবস্থিত। এখানে চৈতন্যদেবের শিষ্য ও পার্ষদ—রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীবাস, মুরারিগুপ্ত, শিবানন্দ সেন, জগদীশ পণ্ডিত, বৃন্দাবন দাস, সুন্দরানন্দ ঠাকুর, রায় রামানন্দ, পরমানন্দ সেন (কবিকর্ণপুর) প্রভৃতি বিখ্যাত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সমাধি আছে। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস, ইহাঁরা সকলে কৃষ্ণ-লীলার সখা বা সখী। তাঁহাদের সকলেই সশরীরে বৃন্দাবনধাম লাভ করিয়াছিলেন কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কেননা, বৈষ্ণবগণের মধ্যে শবদেহ, অথবা চিতাভস্ম, উভয়ই সমাহিত করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। আজি কালিকার দিনেও, নানা দূরদেশে লোকান্তরিত বৈষ্ণবগণের চিতাদগ্ধ অস্থি, ব্রজধামের নানা কুঞ্জে আনীত ও প্রোথিত হইয়া থাকে। তদুপরি কেহ ছত্রী, কেহবা তুলসীমঞ্চ স্থাপনা করিয়া থাকেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

আওরঙ্গজেবের উপদ্রব, জয়সিংহ, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী,
বলদেব বিদ্যাভূষণ, জয়পুর, ভরতপুর ও
অহল্যা বাইয়ের দেবালয়।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া, নানা-দেশীয় বৈষ্ণবগণ, অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অবিচলিত ভক্তিভরে,—বাবর, হুমায়ূন, সেরসাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং সাজাহানের রাজত্বকালে, প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া,যে বৃন্দাবনধাম দিন দিন বৈষ্ণব,সাধু, ভক্তগণ, ও অধিবাসিবৃন্দে, এবং নয়ন-মন-বিলোভন হর্ম্ম্য ও মন্দির-রাজিতে সুশোভিত করিয়া আসিতেছিলেন, সেই পবিত্র ব্রজমণ্ডল, সঙ্কীর্ণ-হৃদয় দেবদ্বেষী



চৌষট্টি মোহান্তের সমাজ

আওরঙ্গজেবের কুটিল কঠোর কটাক্ষপাতে, ১৬৭০ খৃঃ অব্দে অতি অল্প দিনের মধ্যেই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আওরঙ্গজেবের উপদ্রব।

ব্রজবাসীরা বলিয়া থাকেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেব আগ্রার সমুন্নত প্রাসাদ শিখর হইতে, বৃন্দাবনে মানসিংহ-বিনির্ম্মিত গোবিন্দজীর গগনচুম্বী পুরাতন মন্দিরের চূড়ার উপর, সওয়া মণ ঘৃতের সমুজ্জ্বল আলোকমালা দেখিয়া, ঈর্ষাবশে বা আক্রোশভরে মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া দিবার আদেশ দিয়াছিলেন। এ কথাটা বিচারসহ নহে। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মহাশয়-বিরচিত History of Aurangzib (Vol III Chapter 34) পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মান্ধ (গোঁড়া) পাতশাহ কেবল বৃন্দাবনেরই দুর্দ্দশা করেন নাই; উত্তরে পাঞ্জাব হইতে, দক্ষিণে আমোদনগর, এমন কি কটক ও মেদিনীপুর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে কুচবিহার হইতে পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত, তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য মধ্যে, যেখানে যে প্রাচীন প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবালয় পাইয়াছেন, সেই সমস্তই ভাঙ্গিয়া, অধিকাংশ স্থানে মস্‌জিদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র, রাজপুতানা, আজমীর, মথুরা, প্রয়াগ, অযোধ্যা, বারাণসী, মুঙ্গের, আরা প্রভৃতি নগরে, পুরাতন হিন্দুমন্দির ভাঙ্গিয়া, সেই দেবমন্দিরের স্থানে, যে সকল মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে। আওরঙ্গজেব সিংহাসন-আরোহণের পূর্ব্ব হইতেই, (১৬৪৫ খৃঃ অঃ) আমেদাবাদে প্রথম এইরূপ হিন্দুধর্ম্ম-নিগ্রহ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল দেবমূর্ত্তি বা মন্দির ভাঙ্গিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; লেখনীর একমাত্র সঞ্চালনেই, তাঁহার অধীনস্থ সমগ্র হিন্দু-লিপিকারগণকে (clerks) কর্ম্মচ্যুত

করিয়া, তৎপদে মুসলমানগণকে নিযুক্ত করেন। মুসলমানগণকে পণ্যশুল্ক (চুঙ্গী) হইতে অব্যাহতি দিয়া, হিন্দুদিগের নিকট দ্বিগুণ শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। সে সময় মুসলমান ও কেবল্ রাজপুত ভিন্ন, অপর কাহারও, উৎকৃষ্ট আরবী ঘোটক, বা মদমত্ত মাতঙ্গ, বা বিচিত্র যানারোহণের অধিকার ছিল না। হিন্দুদিগের টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি যে সকল স্থানে, হিন্দুধর্ম্মসংক্রান্ত বিদ্যা ও আচার-ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হইত, সেগুলিও লোপ করেন। সর্ব্বোপরি "কাফের"দিগের উপর জিজিয়া নামক ট্যাক্স বসাইয়াছিলেন। এ সকল গুলি লক্ষ্য করিলে, স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ছলে বলে কৌশলে, তাঁহার স্বধর্ম্ম (ইস্লাম ধর্ম্ম) বিস্তারের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই, তাঁহাকে এই সাধুজন-বিগর্হিত পথে লইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সাপক্ষে, এই কথামাত্র বলা চলে যে, তিনি সুলতান মামুদ, সেকেন্দর লোদী, নাদীর সা বা আমেদ সা আবদালীর ন্যায়, ধন-রত্ন লোভে মন্দিরাদি চূর্ণ করেন নাই। তিনি, কোরাণবিরোধী সাকার-উপাসনার স্থানগুলি (দেবমন্দিরাদি) ভাঙ্গিয়া,তত্তৎ স্থানেই কোরাণ-সম্মত নিরাকার-ভজনাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

আওরঙ্গজেব হয়ত মনে করিয়াছিলেন যে, এইরূপ উৎপীড়ন ও বল-প্রয়োগ করিয়া, মহম্মদীয় ধর্ম্ম বিস্তার করিতে পারিলে, মোগল-সাম্রাজ্য দৃঢ়তর হইবে। ফলে কিন্তু বিপরীত ঘটিল। এইরূপ সংকীর্ণ কুটিল-নীতি প্রয়োগ করিয়া, তিনি উদারচেতা মহামতি আকবর প্রতিষ্ঠিত সুদৃঢ় মোগল-সাম্রাজ্য-সৌধের ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার লোকান্তর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়া-ছিল। তাঁহার পর-ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতা (Religious toleration) বিন্দুমাত্র ছিল না। তবে পাঠকগণ মনে করিবেন না যে,কেবল ধর্ম্মান্ধ আওরঙ্গজেব, বা ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার কালাপাহাড়, প্রতিমা ভগ্ন ও মন্দির ধ্বংস করিয়া

গিয়াছেন। ইহাঁদের বহু পূর্ব্বে ফিরোজসা তোগলক, সেকেন্দর লোদী প্রভৃতি পাঠান-নরপতিরা মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এবং তদধীন জনগণকে কশাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেন। তাঁহারাই ত প্রথমে জিজিয়াকর প্রবর্ত্তন করিয়া যান। সমদর্শী আকবর সাম্যনীতি বলে তাহা উঠাইয়া দেন।

বল প্রয়োগ করিয়া, এইরূপে নিজধর্ম্ম প্রচার, বা পরধর্ম্ম নির্য্যাতন জন্য কেবল মুসলমান বাদশাহেরাই দোষী নহেন। সত্যের অনুরোধে, দুঃখিত চিত্তে বলিতে হইতেছে যে,ভারতে মুসলমান দিগের আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব্বেই, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুনামধারী কয়েকজন ভারত-সন্তানও এইরূপ কলঙ্ক হইতে বিমুক্ত ছিলেন না। ইঁহাদের দুই চারি-জনের বিবরণ এখানে দিতেছি। অনুসন্ধান করিলে আরও পাওয়া যাইতে পারে।

(১ম) মগধরাজ পুষ্যমিত্র (খৃঃ পূর্ব্ব ১৮১-১৫০) ঘোর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন, তিন চারিবার বৌদ্ধগণকে নির্য্যাতিত করিয়া, সমূলে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বৌদ্ধেরা পলাইয়া অন্য রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার নাম শুনিলে ভয়ে কাঁপিত।

(২য়) ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদে, পঞ্চনদের রাজা শৈব মিহিরকুল ১৬০০ সঙ্ঘারাম ও বিহার ধ্বংস করিয়া, অগণিত সংখ্যক বৌদ্ধ নরনারীর প্রাণবিনাশ করেন।

(৩য়) খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে, মাধবাচার্য্য-বিরচিত "বৌদ্ধ নিগ্রহ" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—মহারাজ সুধন্বা, কুমারিল্ল ভট্টের উত্তেজনায়, আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন যে, "রাজভৃত্যেরা হিমাচল হইতে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত, যেখানেই হউক 'বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্' পাইলেই হত্যা করিবে। যদি কেহ অন্যথা করে, তবে সেই রাজানুচরের প্রাণদণ্ড হইবে।"

(৪র্থ) একাদশ শতাব্দীতে, কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের রাজত্বকালে,কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নামক নাটকে পঞ্চম অঙ্কে, শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তিকে বলিতেছেন !!!—

"অজস্র নরশোণিত পাত করিয়া, ভীষণ সমরের পরে অস্মদীয় পক্ষ, সৌগত (বৌদ্ধ), গণকে সিন্ধু, গান্ধার, পারসিক, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গাদি দেশে দূর করিয়া দিয়াছে। এবং পাষণ্ড দিগম্বর (জৈন), কাপালিক (শাক্ত) ও সোমসিদ্ধান্তগণ পলাইয়া, পামর-বহুল পাঞ্চাল, মালব, আভীর-দেশে যাইয়া, গুপ্তভাবে বাস করিতেছে।"

(৫ম) চৈনিক পরিব্রাজকগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, কর্ণসুবর্ণপতি শৈবরাজা শশাঙ্ক, উরুবিল্বের (বুদ্ধগয়ার) পবিত্র বোধিদ্রুম উৎপাটিত করিয়া দেন। এবং তথাকার অশোক-নির্ম্মিত শিল্পকলা-বিভূষিত প্রসিদ্ধ বুদ্ধদেবের মন্দির-মধ্যস্থ মূর্ত্তিটীকে ভগ্ন করিয়া, তথায় শিবলিঙ্গ স্থাপন করিবার জন্য, সেনাপতিকে আদেশ দিয়াছিলেন। সেনাপতি, লোকনিন্দা বা ধর্ম্মভয়ে, মূর্ত্তি ভগ্ন না করিয়া, প্রাচীরাভ্যন্তরে, মূর্ত্তিটীকে প্রছন্ন রাখিয়া, প্রভুর আদেশমত শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। পাটলীপুত্র নগরে অশোক-প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মর-প্রস্তরোপরি বুদ্ধদেবের যে পদাঙ্ক ছিল, তাহাও রাজা শশাঙ্কের আদেশে চূর্ণ করা হয়।

(৬ষ্ঠ) পাঠকগণের মধ্যে হয়ত অনেকেই অবগত আছেন যে, তীর্থক্ষেত্র হরিদ্বারে কুম্ভমেলার শুভযোগ সময়ে, পুণ্যসলিলা সুরধুনীতে অগ্রে স্নানোপলক্ষে, শৈব ও বৈষ্ণবেরা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া কতই না নরহত্যা করিতেন।

(৭ম) উজ্জয়িনী-নিবাসী শৈব-সন্ন্যাসী লছমন গিরি, (ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি) বৈষ্ণব-হত্যা ব্রত গ্রহণ করিয়া, প্রতিদিন অন্ততঃ একজন বৈষ্ণবের প্রাণ সংহার না করিয়া, জলগ্রহণ করিতেন না।

প্রবন্ধ-বাহুল্য ভয়ে সংক্ষেপে বলিতেছি যে, মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সিয়া ও সুন্নিগণের মধ্যে, অথবা খৃষ্টানদিগের ক্যাথলিক ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে, যে সকল ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া, কত রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন।

হায়! ধর্ম্ম বা রণোন্মাদে মানুষেরা বিবেকশূন্য হইয়া, শ্বাপদ পশুরও অধম হইয়া পড়ে! যাক্ সে কথা।

১৬৬০ খৃঃ অব্দে—আওরঙ্গজেব আবদন্ নবী নামক একজন ধর্ম্মধ্বজী সেনাপতিকে, মথুরার ফৌজদার করিয়া পাঠান। তিনি মথুরায় আসিয়া, অচিরকাল মধ্যে বাজারের মধ্যস্থলে, একটি ভগ্ন হিন্দু-মন্দিরের ভিত্তির উপর ১৬৬১—৬২ খৃঃ অব্দে মিনার-চতুষ্টয়-শোভিত, সুবৃহৎ সুন্দর জমা-মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহা এখনও মথুরা সহরে বিদ্যমান আছে। এই ফৌজদারের কর্ম্মকালে, ১৬৬৯ খৃঃ অব্দে, কোকিল বা গোকুল নামক জাঠ-সর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া, মথুরার সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহে উপদ্রব করিতে লাগিল। তাহাকে দমন করিতে যাইয়া, আবদন্ নবী নিহত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া, সম্রাট আরও ২।৩ জন সেনানীকে, পরে পরে পাঠাইলেন। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় বিশ হাজার ছিল। তাহাদের দ্বারা বিদ্রোহ নিবারিত হইল না দেখিয়া, সম্রাট দিল্লী হইতে স্বয়ংই বিপুলবাহিনী লইয়া আসিলেন। কয়েকদিন যুদ্ধের পর বিদ্রোহীগণের 'তিলপট' নামক দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া, সাত হাজার বন্দী সহ, কোকিল ও তাহার স্ত্রীপুত্রগণ ধৃত হইল। এই যুদ্ধে সম্রাট-পক্ষে চারি হাজার, এবং বিদ্রোহী পক্ষের পাঁচ হাজার লোক নিহত হয়। গোকুলকে আগ্রায় পুলিশ ফাঁড়িতে লইয়া গিয়া, বল-পূর্ব্বক তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করিয়া, প্রাণদণ্ড করা হইল।

এবং তাহার স্ত্রীপুত্রগণকে মুসলমান ধর্ম্মে-দীক্ষিত করা হইল। এই বিদ্রোহের অছিলা পাইয়া, আওরঙ্গজেব, ১৬৭০ খৃঃ অব্দে, জানুয়ারী মাসে, মুসলমানগণের পবিত্র রমজান পর্ব্বাহে, স্বয়ং মথুরায় আসিয়া, বুন্দেল-রাজ বীরসিংহদেব কর্ত্তৃক তেত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিনির্ম্মিত, তখনকার অপূর্ব্বদৃশ্য (Wonder of the age) কেশব-দেবের সুবিশাল সুরম্য মন্দির ধ্বংস করিয়া, তদুপরি একটি মস্‌জিদ করিয়া দেন, এবং মথুরার হিন্দুনাম ঘুচাইয়া 'ইস্‌লামাবাদ' নাম রাখেন। মসির-ই-আলমগিরি নামক, তাঁহার সময়ের ইতিহাসে, দম্ভভরে লিখিত হইয়াছে যে, "এই প্রতিমা-ধ্বংসকারী ধর্ম্মভীরু পাতশাহের শুভ রাজত্ব কালে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই, ধর্ম্মমূঢ় কাফেরগণের অসংখ্য মন্দির ও পুত্তলিকা ভগ্ন করা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতকগুলা মণিমাণিক্য-বিজড়িত ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুতুলগুলা আগ্রায় আনিয়া, ইসলাম-ধর্ম্মবিশ্বাসীরা পদদলিত করিবে বলিয়া, জাহানারা-বেগম-বিনির্ম্মিত মসিদের সোপানতলে প্রোথিত করা হইয়াছিল। অন্তরে অন্তরে ক্ষুব্ধ হইলেও গর্ব্বিত হিন্দুরাজারা, প্রাচীর-গাত্র-সংলগ্ন চিত্রাবলীর ন্যায়, কোনরূপ বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই।" সত্য বটে, হিন্দুরাজগণ প্রকাশ্য-ভাবে বা বলপ্রয়োগে, কোনরূপ বাধা দিতে পারেন নাই; কিন্তু তাঁহারা, পূর্ব্বাহ্নে পূজারিগণকে সংবাদ পাঠাইয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, মহাবন, গোকুল প্রভৃতি স্থান হইতে, প্রধান প্রধান দেববিগ্রহ-গুলিকে, নিরাপদ প্রদেশে স্থানান্তরিত করাইয়া দিয়াছিলেন।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে, বা যদুনাথ বাবুর ইতিহাসে, বৃন্দাবন সম্বন্ধে কোন কথাই পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী, মদনমোহনজী, রাধাবল্লভজী এবং যুগলকিশোরজীর লাল-প্রস্তর-নির্ম্মিত কারুকার্য্য-শোভিত পুরাতন মন্দির-গুলির অঙ্গহীন

ভগ্নদশা দেখিলে, আওরঙ্গজেবের দেবস্থান ও প্রতিমা-ধ্বংকারী হস্তের কঠোর পরিচয় আজিও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই সময়েই (১৬৭০ খৃঃ অঃ) বৃন্দাবন হইতে গোবিন্দদেব, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধাদামোদর, রাধাবিনোদ ও রাধামাধব প্রভৃতি গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত দেবমূর্ত্তিগুলি জয়পুরে, মির্জ্জারাজা ১ম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহের আশ্রয়ে লইয়া যাওয়া হইল। এবং তদবধি জয়পুরে বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের বাস আরম্ভ হইল। বিগ্রহগুলি নিশীথ সময়ে বস্ত্রাচ্ছাদিত শকটে করিয়া জয়পুরে গুপ্ত ভাবে প্রেরিত হইয়াছিল। বৃন্দাদেবী কাম্যবনে নীতা হইলেন। মন্দির-ভঙ্গের পূর্ব্বেই, মথুয়ার কেশবদেবকে লইয়া উদয়পুরের সন্নিহিত নাথদ্বারে স্থানান্তরিত করা হয়।

কৌপীনধারী বৈষ্ণবদিগকে দেখিয়া, আকবর বৃন্দাবনের নাম 'ফকিরাবাদ' দিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তৎপরিবর্ত্তে এস্থানের নাম 'মুমিনাবাদ' (মহম্মদীয় ধর্ম্মে বিশ্বাসিগণের বাসস্থান) নাম দিয়া, দেশটাকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদেবের মন্দির ভাঙ্গিয়া, সেটিকে যে মসীদে পরিণত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বৃন্দাবন পুনরায় দেবশূন্য ও জনশূন্য-প্রায় হইয়া পড়িল। এখানকার বৈষ্ণবেরা পলাইয়া রাধাকুণ্ড, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি দূর গ্রামে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেবল গোপালভট্টের রাধারমণজী ও হরিদাস স্বামীর বাঁকেবিহারী, এবং হিত হরিবংশের রাধাবল্লভজী নিকটবর্ত্তী কোন গুপ্ত স্থানে, নিভৃতে পূজা পাইতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ গোলযোগে চলিল। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেব, দাক্ষিণাত্যে নির্ব্বান্ধব দেশে ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তিনজন উত্তরাধিকারী—বাহাদুর সাহ,

জাহাঙ্গীর সাহ, ফারুক সিয়র, গৃহবিবাদে স্বল্পকাল মধ্যেই জীবলীলা শেষ করিলেন। ইহার পর ১৭১৯ খৃঃ অঃ হইতে ১৭৪৮ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত মোহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া ২৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহাঁর সময়ে "সওয়াই জয়সিংহ" (১৭২১-১৭২৮খৃ অঃ) মথুরামণ্ডলে শাসন-কর্ত্তা হইলে, বৃন্দাবনে পুনরায় সংস্কার হইতে আরম্ভ হইল। ইহাঁর এইরূপ জীবনী পাওয়া গিয়াছে।

সওয়াই জয়সিংহ ২য়—অম্বররাজ মীর্জা জয়সিংহের পৌত্র, ও বিষ্ণুসিংহের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার প্রতি অতিশয় অনুরাগ ছিল। ইনি নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৬৯৯ খৃঃ অব্দে ইনি জয়পুরের রাজা হইয়াছিলেন। অম্বর হইতে ইনি ইহাঁর নবনির্ম্মিত জয়পুর সহরে রাজধানী তুলিয়া আনেন। জয়পুর সহরটী দেখিতে এত সুন্দর যে, লোকে ইহাকে ভারতের 'প্যারিস' বলিয়া থাকে। জয়সিংহ কেবল নিজ সহর নির্ম্মাণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইনি পঞ্জিকা-সংস্কারের জন্য দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, আগরা, মথুরা ও বারাণসী ধামে, নানাদেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে, অজস্র অর্থব্যয়ে ছয়টী মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় গ্রহ-নক্ষত্র-পর্য্যবেক্ষণোপযোগী জ্যোতিষিক যন্ত্র সকল স্থাপিত হইয়াছিল। বিদ্যাধর ভট্টচার্য্য নামে একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালী, ইঁহার নগর ও মানমন্দির-নির্ম্মাণের পরামর্শদাতা ও সাহায্য-কারী ছিলেন। তাঁহার নামে একটি রাস্তা আজিও জয়পুরে আছে। রাজা স্বয়ং জ্যোতির্ব্বিদ্, রাজনীতিজ্ঞ এবং ঐতিহাসিক ছিলেন। মোহম্মদ সাহ ইঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দেখিয়াই, ইঁহাকে 'সওয়াই' অর্থাৎ 'সকল রাজার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ' এই সম্মানিত উপাধি দান করিয়াছিলেন।

মহারাজ জয়সিংহের আদেশে জগন্নাথ নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত, আরবীভাষায় রচিত মিজাস্তি নামক পুস্তক হইতে, রেখা গণিত



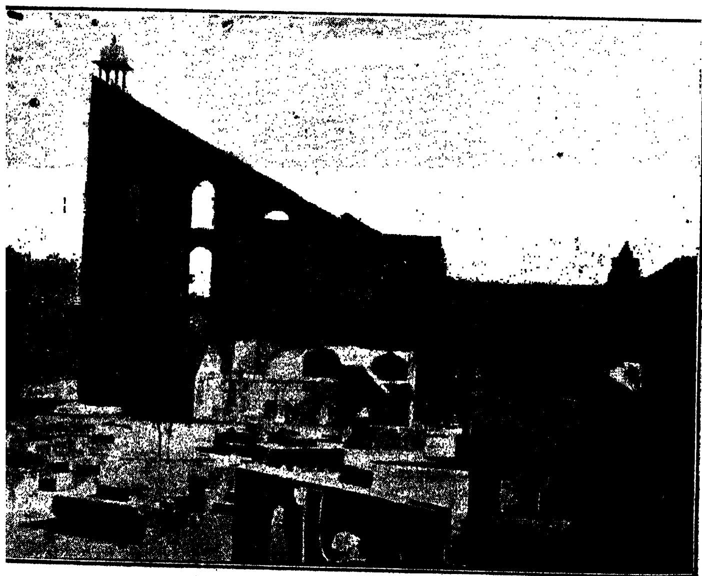
সওয়াই জয়সিংহ, দ্বিতীয়

ও সমাজ সিদ্ধান্ত নামক দুইখানি জ্যামিতি পুস্তক, সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

জয়সিংহ নিজ রাজধানীতে রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই, রূপগোস্বামী-আবিষ্কৃত, ও বৃন্দাবন হইতে প্রেরিত, গোবিন্দদেবের জন্য একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি যখন মথুরায় থাকিতেন, তখন সেখানকার পুরাতন দুর্গটীকে সুদৃঢ়রূপে মেরামত করাইয়া, তাহার ভিতর নিজ নির্ম্মিত প্রাসাদে বাস করিতেন। বৃন্দাবনে চীর বা চৈন ঘাটের পার্শ্বে, ইঁহার একটি সুবিস্তৃত প্রাসাদ আছে। সেটীকে লোকে 'সওয়াই জয়সিংহের ঘেরা' বলে। তথায় প্রশস্ত প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে জয়সিংহের পাষাণ-রচিত, খিলান-বিশিষ্ট, কারুকার্য্য-খচিত-স্তম্ভ-শোভিত, সুবৃহৎ দরবার-গৃহ আছে। সেটী এখন সংস্কারাভাবে জীর্ণশীর্ণ ও নানা স্থানে ভগ্ন। এখন সেটী সন্ন্যাসী ও সাধুগণের ধর্ম্মশালারূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও পুরুষদিগের জন্য, পৃথক্ যে দুইটী ঘাট আছে, তাহাদের নাম হনুমান ও ভ্রমর ঘাট। যমুনা দূরে অপসৃত হওয়ায় তথায় কেহ স্নান করিতে আইসে না। ইহার পার্শ্বে দেবালয় মধ্যে, নৃত্যগোপাল নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন; সেবার ততটা শৃঙ্খলা নাই। সমস্তই যেন জনশূন্য, পড়িয়া খাঁ খাঁ করিতেছে।

ইঁহার রাজত্বকালে জয়পুরে শ্রীরাধা ও গোবিন্দদেবকে লইয়া একটী গোলযোগ হইয়াছিল। আমি বাঘ্‌নাপাড়ার গোস্বামীবংশীয়, কুমার-টুলিনিবাসী, পূজ্যপাদ প্রবীণ সুপণ্ডিত স্বর্গীয় বিপিনবিহারী গোস্বামী মহাশয়ের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা এইখানে বিবৃত করিতেছি। ঘটনাটা এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বর্ণনাত্মক যে সকল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ,—যথা মহাভারত, হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রামাণ্য





পুরাণ আছে, তাহার মধ্যে শ্রীরাধার নাম নাই। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, পদ্ম, বরাহ প্রভৃতি পুরাণ ও জয়দেবাদির গ্রন্থ হইতে রূপ ও সনাতন প্রভৃতি, তাৎকালীন গোস্বামীগণ রাধিকা নাম গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের প্রেমভক্তি-মূলক লীলাগ্রন্থ-সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে, ৩০ অঃ, ২৪ শ্লোক—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নোবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

এই শ্লোক হইতে তাঁহারা, রাধানাম শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। টীকাকার শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায়, বা সমগ্র টীকার মধ্যে অন্য কোথাও, রাধার নাম উল্লেখ করেন নাই। তবে সনাতন গোস্বামীলিখিত "বৈষ্ণবতোষিণী" এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী-রচিত সারার্থদর্শিনী টীকায়, 'আরাধিত' শব্দ হইতে রাধার নাম আছে বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁরা এটি 'রাধিতঃ' পদ বলেন, এবং 'রাধয়া ইতঃ, প্রাপ্তঃ বা যুক্তঃ', অর্থ করেন। ব্যাকরণদুষ্ট কষ্টকল্পিত সাম্প্রদায়িক এ ব্যাখ্যা সর্ব্বসাধারণে স্বীকার করেন না। আমরাও যতদূর জানিতে পারিয়াছি, বৃন্দাবনে কোথাও রাধামূর্ত্তি আবিষ্কারের কথা শুনি নাই; অথবা কোন গ্রন্থেও পাই নাই। প্রধান বিগ্রহ গোবিন্দ-দেব, মদনমোহন ও গোপীনাথের সঙ্গিনী, রাধমূর্ত্তিগুলি যে ভিন্নদেশ হইতে আসিয়াছিল, তাহা সেই সেই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। যাঁহারা এ বিষয়ে আরও জানিতে চাহেন, তাঁহারা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়-প্রণীত "উপাসক-সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থের রাধাবল্লভী প্রবন্ধ, ও বঙ্কিমবাবু-বিরচিত কৃষ্ণচরিত্রের শ্রীরাধা প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন। বৃন্দাবনে গৌড়ীয়, রাধাবল্লভী ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ শ্রীরাধার মূর্ত্তি

পূজা করিয়া থাকেন। শ্রী, রুদ্র, রামানন্দী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত, রাধা পূজা করাকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করেন। (১)

---

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, স্কন্দ, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে এবং গীতগোবিন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কাব্যে, ও চৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও কোন কোন গ্রন্থে, শ্রীরাধার নাম থাকিলেও, তাঁহার মূর্ত্তি বা প্রতিমার পূজা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বে ভারতের কোথাও প্রচলিত ছিল কি না, তাহা ঠিক বলা যায় না।

চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণ দেশে তীর্থভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন মধ্বাচারি-মঠে উড়ুপী কৃষ্ণের সহিত, রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথের সহিত, কটকে সাক্ষী-গোপালের সহিত, অথবা পুরীধামে জগন্নাথ-দেবের সহিত, কোথাও রাধা মূর্ত্তির পূজা ছিল না, বা আজিও নাই। তিনি যখন ব্রজধাম দর্শন করিতে যান, তখন তথায় ৩টি মাত্র কৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখেন—(১) গোপাল বা গোবর্দ্ধননাথ, (১) হরিদেব, ও (৩) নন্দীশ্বর পর্ব্বতগুহায় শিশুকৃষ্ণ। ইঁহাদের কাহারও সমিত রাধামূর্ত্তি ছিল না। এই কয়টি ছাড়া, অপর কোথাও কৃষ্ণ-মূর্ত্তির বিবরণ চরিতামৃতে পাই নাই, অন্য কোথাও রাধামূর্ত্তি থাকিলে, রাধাকৃষ্ণোপাসক—কৃষ্ণদাস কবিরাজ, তাহার উল্লেখ করিতে বিরত থাকিতেন না। বারাণসীর যে বৈদান্তিক পণ্ডিত প্রকাশানন্দ স্বামীকে চৈতন্যদেব তর্কে পরাস্ত করিয়া, বৈষ্ণব মতে আনিয়াছিলেন,এবং যাহাকে প্রবোধানন্দ সরস্বতী নাম দিয়াছিলেন, তিনি চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে ১৩০ শ্লোকে, কি বলিতেছেন শুনুন—"প্রেম নামক পরম পুরুষার্থ, যাহা পূর্ব্বে কাহারও শ্রবণ-পথে যায় নাই ; নাম-মহিমা, যাহা পূর্ব্বে কেহ জানিত না ; বৃন্দাবনের পরম মাধুরী, যাহাতে কেহ পূর্ব্বে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এবং পরমাশ্চর্য্য মাধুর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা-স্বরূপা শ্রীরাধা, যাহা কেহ অবগত ছিলেন না, কেবল চৈতন্যচন্দ্র প্রকটিত হইয়া, এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।"

চরিতামৃতের মতে শ্রীকৃষ্ণ,—সচ্চিৎ, ও শ্রীরাধা—আনন্দ বা হ্লাদিনী শক্তি, সুতরাং "না সো রমণ, না হাম রমণী।" (মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ দেখুন।)

চৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীরাই যে, রাধার মূর্ত্তি-পূজা প্রচলন করিয়াছেন তাহা দেখাইবার জন্য, এই সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে। নতুবা গ্লানি, বিদ্বেষ বা অন্য কোনরূপ নীচ অভিপ্রায়ে নহে।

সওয়াই জয়সিংহের সময়ে, কয়েকজন শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব জয়পুরে যাইয়া, গোবিন্দজীর সহিত শ্রীরাধার পূজা হইতেছে দেখিয়া, মহারাজকে বুঝাইলেন যে, প্রথমে শিলারূপা নারায়ণের পূজা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের পূজা করা অবৈধ, এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপকন্যা রাধাকে এক-সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করা অনুচিত, কেননা, প্রাচীন পুরাণাদিতে রাধার নাম-মাত্র নাই। অতএব রাধাকে ফেলিয়া দেওয়া হউক, এবং মৎস্যভোজি-বংশীয় অশুচি বাঙ্গালী পূজারি-দিগকে বিদায় দেওয়া হউক। তৎকালে যে সকল বাঙ্গালী পূজারীরা গোবিন্দদেবের সেবা করিতেন, তাঁহারা শাস্ত্রদর্শী বা পণ্ডিত ছিলেন না। সুতরাং শ্রীসম্প্রদায়ের লোকদিগের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া, তাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মহারাজ জয়সিংহ হিন্দু হইয়া কি করিয়া রাধাদেবীকে ফেলিয়া দিবেন? তাঁহাকে অন্য গৃহে রাখিয়া, পৃথক পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, এবং গোবিন্দজীর পূর্ব্বে নারায়ণ-শিলার পূজা চলিতে লাগিল। এই সংবাদ বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলে, তথায় হাহাকার পড়িয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, এবার বুঝি চৈতন্য-দেব-প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মত উঠিয়া যাইবে।

বৃন্দাবনে তৎকালে যে কয়েকজন পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া, রাধাকুণ্ডবাসী ভাগবতের টীকাকার প্রবীণ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উপায়-নির্দ্ধারণ জন্য ধরিয়া বসিলেন! বিশ্বনাথ তখন বার্দ্ধক্য বশতঃ জরাজীর্ণ, স্থানান্তরে যাইতে অক্ষম। তিনি বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের উপর শ্রীরাধার মান হইয়াছে; সেইজন্যই এইরূপ অঘটন ঘটিতেছে। যাহা হউক, আমি ত যাইতে অক্ষম, তোমরা বলদেব বিদ্যাভূষণকে জয়পুরে লইয়া যাও, রাধা-কৃষ্ণের চরণ-প্রসাদাৎ, তাঁহার দ্বারাই তোমাদের মনোরথ সফল হইবে।" বলদেব বিদ্যাভূষণ সে সময়ে ভেক লইয়া, গোবিন্দদাস নাম গ্রহণ

করিয়া, গোবর্দ্ধনের কোন গুহায় নির্জ্জনে ভজনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। কেহই তাঁহার সন্ধান জানিতেন না। বহু অনুসন্ধানের পর, তাঁহাকে বাহির করিয়া জয়পুরে লইয়া যাওয়া হইল। জয়পুরে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষীয় শ্রী-বৈষ্ণবগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া দিলেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বে যেরূপভাবে সেবা চলিতেছিল, সেই ভাবেই পূজা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল,এবং তাড়িত বাঙ্গালী পূজারিগণকে স্ব স্ব পদে পুনঃ স্থাপিত করা হইল। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া গোবিন্দদাস বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ঐ সময়েই "গোবিন্দভাষ্য" নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মতান্তরে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রী ও রুদ্রাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রচিত, বেদান্তের কোন ভাষ্যগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত ছিল না। চৈতন্যদেব ও তাঁহার মতাবলম্বী রূপ, সনাতন প্রভৃতি গৌড়ীয় গোস্বামিপাদেরা, শ্রীমদ্ভাগবতকেই আপনাদের ভাষ্যগ্রন্থ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এ জন্য তাঁহারা অপর কোন নবীন ভাষ্যগ্রন্থ বিরচন করেন নাই। শ্রী ও রুদ্রাদি সম্প্রদায়ের, বিরুদ্ধ পক্ষীয় কয়েকজন পণ্ডিত, জয়পুর রাজ্যে বাঙ্গালীগণের সমাদর ও প্রভুত্ব দেখিয়া, ঈর্ষাবশে মহারাজ জয়সিংহের নিকট অনুযোগ করেন যে, ভাষ্যহীন, অর্ব্বাচীন, অবজ্ঞাস্পদ গৌড়ীয়গণের মতে,শ্রীগোবিন্দদেবের সহিত প্রাচীন পুরাণে অনুল্লেখিতা শ্রীরাধার একত্র পূজা, সম্পূর্ণ শাস্ত্র-বিরোধী। সেই ভাষ্যহীনতা অপবাদ মোচন জন্যই, বলদেব (তখন গোবিন্দদাস) জয়পুরে গোবিন্দ-মন্দিরে থাকিয়া, সপ্তাহ মধ্যে গৌড়ীয়গণের মতানুযায়ী "গোবিন্দ-ভাষ্য" রচনা করেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে বিপক্ষেরা পরাস্ত হইলে, মহারাজ ইঁহাকে পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে বলেন। বলদেব, বৃন্দাবনে পুনরায় শ্রীগোবিন্দ-দেবকে আনিবার প্রার্থনা জানাইলেন। দূরদর্শী মহারাজ মুসলমান-রাজধানী আগ্রার

সন্নিকটে এ অতুল্য দেবমূর্ত্তি রাখিলে, ভবিষ্যতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে ভাবিয়া, এবং নিজরাজ্যে তাঁহার সেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, তৎপরিবর্ত্তে বৃন্দাবনে প্রতিভূ দেবমূর্ত্তি স্থাপনের উপদেশ দিলেন। "ভক্তকল্পদ্রুম" নামক হিন্দী পুস্তকে লিখিত আছে যে, মোহম্মদ সাহের সময়ে, বৃন্দাবনে প্রতিনিধি দেবমূর্ত্তিসকল স্থাপন করা হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—নদীয়া জেলার দেবগ্রামে ১৫৭৬ শকাব্দায় (১৬৬৪ খ্রীঃ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা তিন সহোদর—রামভদ্র, রঘুনাথ ও বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ বাল্যকালে দেশে থাকিয়া,কাব্য-ব্যাকরণাদি পাঠ করেন, এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত সৈয়দাবাদে যাইয়া, তথাকার,নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য—রামকৃষ্ণের নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করেন ; পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা লইয়া "হরিবল্লভ" নামে ভণিতা দিয়া, গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। যৌবন কালেই বৃন্দাবনে যাইয়া, গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ আরিট গ্রামে, রাধাকুণ্ডতীরে বাস করিতেন। তথায় গোকুলানন্দ নামে একটী ঠাকুরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, গুণামৃত-লহরী, প্রেমসম্পূট, স্বপ্নবিলাসামৃত, অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম, সুরথ-কথামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, চমৎকার-চিন্তামণি, উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ, গৌরাঙ্গ-স্মরণৈকাদর্শক, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-বিন্দু, রাধামাধব-রূপচিন্তামণি, সাধ্যসাধন-কৌমুদী, স্মরণ-ক্রমমালা প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এতদ্ভিন্ন ভাগবতের সারার্থ-দর্শনী নামক টীকা ১৬২৬ শকে রচিত হয়। ইঁহার রচিত স্বতন্ত্র গীতার টীকাও আছে। ইনি ব্রহ্ম সংহিতা, গোপালতাপনী, অলঙ্কার-কৌস্তভ, চৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধ-মাধব, হংসদূত প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের লিখিত গ্রন্থ গুলিরও টিপ্পনী লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি শ্রীরাধাকে পরকীয়া নায়িকা রূপে প্রতিপন্ন

করিয়াছিলেন। ইঁহার শেষ-জীবন বৃন্দাবনে সমাপ্ত হয়। শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয়ের মতে, অনুমান ১৫৫০ শক হইতে ১৬৩০ শক পর্য্যন্ত ইহাঁর জীবন কাল। আমরা ইহাঁর পরকীয়া মতের একটি আখ্যান রাধাবিনোদ ও গোকুলানন্দ প্রবন্ধে (৭ম পরিচ্ছেদে) দিয়াছি। কাঙ্গলের শ্রীবর্দ্ধন নামক স্থানে ইহাঁর নামে একটি মঠ আছে।

বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইঁহাকে অনেকেই উৎকলদেশীয় লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে, ইনি পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছিলেন। প্রথম-জীবনে ইনি শৈব ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম্মে ইঁহার মতি হয়। ইঁহার রচিত সিদ্ধান্তরত্ন বা গোবিন্দপীঠক, গীতাভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য, প্রমেয়-রত্নাবলী, বেদান্ত-সমন্তক, দশোপনিষদ্-ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, এবং জীব গোস্বামীকৃত তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা প্রভৃতি অনেকগুলি টীকা গ্রন্থ আছে। গোবিন্দ-ভাষ্যই সর্ব্বত্র প্রচলিত। প্রমেয়-রত্নাবলী গ্রন্থের কান্তিমালা নাম্নী টীকায় লিখিত আছে যে, বলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্যামানন্দ গোস্বামীর শিষ্য মুরারির অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার প্রতিষ্ঠিত 'গল্‌তার গাদী' নামে একটি সম্প্রদায় জয়পুরে আছে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর বা বলদেব বিদ্যাভূষণের, ইহার অধিক পরিচয় পাই নাই। লোকপরম্পরায় শুনিতে পাওয়া যায় যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ ও পরমানন্দ বা রাধারমণ-দাস গোস্বামী নামক একজন অজ্ঞাত-বংশীয় পরম সাধু বৈষ্ণবের আগ্রহে, মহারাজ জয়সিংহের অনুরোধে, মোহম্মদ সাহের সম্মতিতে, পুনরায় গোবিন্দজী, গোপীনাথজী প্রভৃতির প্রতিনিধি দেবমূর্ত্তিগুলি, বৃন্দাবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মহারাজ সওয়াই জয়সিংহ দীর্ঘ ৪৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭৪৩

খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গারোহণ করেন। ইঁহারই পরামর্শে মহম্মদ শাহ, হিন্দুগণের উপর প্রবর্ত্তিত জিজিয়া কর রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থে দেখিতে পাই, বৃন্দাবনে সেকালে কোনও বিরোধ বা তর্ক উপস্থিত হইলে জয়পুরের রাজারাই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন, ও তাঁহাদের এখানে বিলক্ষণ কর্ত্তৃত্বও ছিল।

ভরতপুরের রাজাদিগের কীর্ত্তি। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর হইতেই, ভরতপুরের জাঠবংশীয় রাজারা মাথা তুলিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বদনসিংহ নামে একজন জাঠ-সর্দ্দার, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চূড়ামণিকে পরাস্ত করিয়া, ভরতপুরের রাজা হইয়াছিলেন। ইনি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরের প্রসিদ্ধ দুরাক্রম্য দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তিনি মথুরা-মণ্ডলের সহর গ্রামে, বহুব্যয়ে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। বৃন্দাবনে "ধীর সমীরের" পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ দেবালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই দেবালয়ের প্রশস্ত উঠানের দুই পার্শ্বে রাজা ও রাণীদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দরবারগৃহ আছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকেই নানা কারুকার্য্য-খচিত পাষাণ-ফলকের উপর তরুলতা ও ফুল ফল অঙ্কিত আছে। তাহার উপর পক্ষীরা বসিয়া গান করিতেছে। এ সকল এখন বিনা-সংস্কারে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বাটী বারমাস তালা-বন্ধ থাকে। কেবল মেলার সময় যাত্রিগণ আসিলে কখনও ব্যবহৃত হয়। এ বাটীটি দেখিবার উপযোগী। অনেকে জানেন না বলিয়া ইহা দেখিতে পান না। এ বাটীর বাহিরের উঠানে, ছোট একটি দেবালয়ের ভিতর, বদনসিংহ-প্রতিষ্ঠিত রাম-সীতা বিগ্রহের সেবা চলিয়া আসিতেছে। বদনসিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ, বৃন্দাবনে কোনরূপ কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছিলেন কি না, বলিতে পারিলাম না।

প্রতাপের পুত্র স্বরজমল, বড়ই পরাক্রান্ত জাঠ-সর্দ্দার ও বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ওয়াল্‌টার রিণ্‌হার্ডকে (সমরু সাহেব) সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া, প্রবলবাহিনী লইয়া, দিল্লীশ্বর আহম্মদ সাহের আমন্ত্রণে, রোহিল্লাগণকে দমন করিয়াছিলেন। এবং পরে ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পাণিপথের যুদ্ধের পর মহারাষ্ট্রগণের গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া, আগরা দখল করিয়াছিলেন। ইনি বহু কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, ভরতপুরের দিগ্‌ নামক গণ্ড শৈলময় স্থানে সূর্য্যভবন, গোপালভবন, মচ্ছিভবন,শ্রাবণভবন,দোলমঞ্চ ও ফোয়ারা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রাবণভবনের ছাদ ও স্তম্ভাদি হইতে বরিষার ন্যায় জলধারা ঝরে। এস্থানের অপর নাম লাঠাবন ; এখানকার কারুকার্য্যসকল বড়ই মনোরম ও দর্শনোপযোগী। শ্রাবণমাসে বনযাত্রা-কালে, এখানে মেলা বসে। ইনি দিল্লী দখল করিবার উদ্দেশ্যে তথা হইতে ছয় মাইল দূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু একদিন অল্পসংখ্যক লোক লইয়া মৃগয়া করিতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইয়া (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) নিহত হইলেন। মুসলমানেরা তাঁহার মস্তক ছিন্ন করিয়া, তাঁহার পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিল। স্বরজমলের পত্নী কিশোরী রাণী বৃন্দাবনে ভ্রমরঘাটের নিকট কিশোরী-মোহন ঠাকুরের যে মন্দির ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে লাল পাথরেরর উপর অতি সুন্দর সুন্দর কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যে গবাক্ষে বসিয়া রাজা ও রাণী যমুনা দর্শন করিতেন, তাহা মার্ব্বেল-মণ্ডিত। কিন্তু হায়! এ সকলই এখন কাল-দন্তে চর্ব্বিত হইয়া, কিয়দংশ পড়িয়া গিয়াছে ; কোনটী বা পড়িবার উপক্রম হইতেছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জবাহির সিংহ পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু দেখিয়া, দিল্লী হইতে সসৈন্যে দেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি গোবর্দ্ধনের নিকট কুসুম-সরোবর-তীরে,স্বরজমলের একটি পরম সুন্দর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। জবাহির বা জোহর সিংহ, বৃন্দাবনে শৃঙ্গার-বটের পার্শ্বে একটী সুবৃহৎ দেবালয় স্থাপিত

করিয়াছিলেন। তাহাতেও কারুকার্য্য-খচিত সুবিস্তীর্ণ দরবারগৃহ রহিয়াছে, এবং তাহার নিকটেই একটী ছোট দেবালয়-মধ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। এখানেও দেখিবার মত কারুকার্য্য আছে। তবে সংস্কারাভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। জবাহির সিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ভ্রাতা রতন সিংহও বৃন্দাবনধামে মদন-মোহনের বাটীর নিকট একটী সুবৃহৎ ছত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি অসমাপ্ত ও ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। রতন সিংহের পর নবল সিংহ জাঠ-সর্দ্দার হইয়াছিলেন। তাঁহার কোন কীর্ত্তি দেখি নাই। ইহাঁর ভ্রাতা রণজিৎ সিংহের পত্নী লক্ষ্মীরাণীর কুঞ্জটি, কেশীঘাটের অপর দিকে সংস্থাপিত। এখানেও পরম সুন্দর কারুকার্য্য সকল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রশস্ত প্রাঙ্গন ও দালানে রাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি বিরাজিত। এ মন্দিরটী বরাবর মেরামত হইয়া আসিতেছে বলিয়া, কোথায়ও ভগ্ন বা বিশৃঙ্খল নহে। দালানে উঠিবার জন্য দুই পার্শ্বে অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত যে দুইটী সোপান রচিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই রণজিৎ সিংহ ১৮০৩ খ্রীঃ অঃ ইংরাজ-পক্ষে, মহারাষ্ট্রগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে রণজিতের বিবাদ হয়। এতদ্‌ভিন্ন ভরতপুরের রাজগণের ও রাজপুতনার অন্যান্য রাজপুতগণের নানা মন্দির আছে। তাহা উল্লেখ করিতে হইলে গ্রন্থ-বাহুল্য হইয়া পড়ে। তবে সেগুলির অধিকাংশই সংস্কারাভাবে ভগ্নপ্রায়। *

* খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে. মুসলমান সেনাদিগের দ্বারা ব্রজমণ্ডল আরও দুইবার উৎপীড়িত হইয়াছিল।

১ম—দিল্লীশ্বর আহম্মদ সাহের আজ্ঞায় (১৭৫২ খৃ) সেনাপতি জাহান্ খাঁ, পরাক্রান্ত জাঠগণকে দমন করিবার জন্য, ভরতপুরে যাইয়া, তাহাদের হস্তে পরাজিত ও



স্থরজমল



লক্ষ্মীরাণী-বিনির্ম্মিত কেশীঘাট

অহল্যা বাই। এবার আমরা ভারত-প্রখ্যাতা ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাইয়ের ঠাকুরবাটীর কথা বলিব। চীর বা চৈন ঘাটের উপর অহল্যাবাইয়ের কুঞ্জ আছে। আমরা প্রথমে এই প্রাতঃস্মরণীয়া ভারত-মহিলার চরিতকথা বলিয়া, পরে কুঞ্জের কথা বলিব। ইনি মালব-প্রদেশের অধিপতি মলহর রাওয়ের পুত্র খণ্ডেজী বা কুণ্ডজী রাওয়ের মহিষী। মালব-প্রদেশের অন্তর্গত পাথরডি গ্রামে, ১৭৩৫ খৃঃ অব্দে, ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা আনন্দ রাও শিন্দে, একজন কৃষিজীবী সামান্য গৃহস্থ ছিলেন। অল্পবয়স হইতেই অহল্যার ধর্ম্মকর্ম্মে রতিমতি দেখা গিয়াছিল। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। মল্‌হর রাওয়ের একমাত্র পুত্র খাণ্ডে রাওয়ের সহিত পুনা নগরে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার মালিরাও নামে পুত্র ও মুক্তাবাই নামে কন্যা জন্মিয়াছিল। ভাগ্যদোষে ১৮ বৎসর বয়সে ইনি বিধবা হইয়াছিলেন। শ্বশুর মল্লারাও বা মল্‌হর রাও বাল্যে মেষ চরাইতেন। পরে নিজ সুদৃঢ় ভুজ ও সুপ্রসন্ন ভাগ্যবলে, সুবিশাল ইন্দোর রাজ্য স্থাপনা করেন। তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ে, বিদেশে অবস্থানকালে, অহল্যার উপর রাজ্য-চালনার ভার দিয়া যাইতেন। সেই সূত্রে কিশোর বয়স হইতেই, অহল্যা রাজকার্য্যে নিপুণা হইয়াছিলেন। মল্‌হর রাওযের জীবিত কালে কুণ্ডজী লোকান্তর গমন করেন। ১৭৬৫

বিতাড়িত হইয়াছিলেন। তাহাদের কিছু করিতে না পারিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন-পথে মথুরা লুণ্ঠন ও নিরীহ অধিবাসিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া,গাত্রদাহ মিটাইলেন।

২য়—সাহ আলমের উজীর—নজফ খাঁকে তাড়াইবার জন্য, জাঠরাজ রণজিৎ উদ্যোগ করিতেছিলেন। নজফ খাঁ তাহা দেখিয়া সসৈন্যে হোদাল, কোটাল, কোশী, প্রভৃতি স্থানে আসিয়া, জাঠগণকে পরাস্ত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন। সে সময়ে অনেক ধনী লোকেরা, মথুরা হইতে পলাইয়া আসিয়া, শ্রীরাধার পিত্রালয় বর্ষাণা গ্রামে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, নিরুপদ্রবে বাস করিতেছিলেন। ১৭৬৮ খ্রীঃঅঃ নজফ খাঁর লোলুপ দৃষ্টি সেইদিকে পড়িল, ও অচিরাৎ তাহা ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

খ্রীঃ অব্দে মলহর রাও হোলকারের মৃত্যু হইলে, অহল্যার পুত্র মালিরাও, পিতামহের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। মালিরাও দুর্ব্বৃত্ত উন্মত্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। নয় বা দশ মাস মাত্র বিশৃঙ্খল ভাবে রাজত্ব করিয়া, তাঁহার লোকান্তর ঘটিল। সুতরাং পুত্রাভাবে জননী অহল্যাবাই সিংহাসনের অধিকারিণী হইলেন। ইনি উত্তমরূপ লেখাপড়া জানিতেন। হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থ ও পুরাণাদি সকল কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। মৎস্য-মাংসাদি পরিত্যাগ করিয়', বিধবাজনোচিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, জীবন অতিবাহিত করিতেন। ইহাঁদের কুল-পুরোহিত গঙ্গাধর, একজন দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি—রাঘবদাদার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু রাজনীতি-কুশলা বুদ্ধিমতী তেজস্বিনী অহল্যাবাই, চরমুখে তাহা অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলেন। তাহাতে গৃহ-বিপ্লবও মিটিয়া যায়। তিনি তুকাজী হোলকার নামক একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও কর্ম্মপটু মহারাষ্ট্রকে, সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করিয়া, সমস্ত রাজ্যই সুশৃঙ্খলায় রাখিয়াছিলেন। তিনি রাজবেশে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া, রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন, এবং আবশ্যক হইলে বিপদের সময়, সৈন্য পরিচালনা করিতেও পশ্চাৎ-পদ হইতেন না। একবার রাজপুতগণ ইহাঁকে বলহীনা রমণী মনে করিয়া, ইহাঁর রাজ্যের একটি দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। ইনি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রই, সেনাপতি তুকাজির সহিত সৈন্য পাঠাইয়া, রাজপুতগণকে নিজরাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী অপরাপর রাজসভায় ইঁহার দূত থাকিত। ইহাঁর সভাতেও ঐ সকল রাজাদের দূত ছিল। এই কৌশলে তিনি চারিদিকে, কোথায় কি হইতেছে জানিতে পারিতেন, এবং বিপদ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রতিকার করিতে পারিতেন। ইনি যে কেবল বীর-রমণী ছিলেন, তাহা নহে; ইনি



মলহর রাও হোলকার

প্রজাপালনেও পরম যত্নবতী ছিলেন। লোকমুখে শুনা যায় যে, সে সময়ে রাজপুতানার নানা রাজ্যে,ও ইঁহার রাজ্যে, দস্যু,তস্কর ও ঠকদিগের বড়ই উপদ্রব ছিল। তাহাদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাদিগের অতিশয় ক্ষতি ও ক্লেশ হইত। অহল্যাবাই, তাঁহার পরমাসুন্দরী কন্যা মুক্তাবাইকে, প্রকাশ্য রাজসভায় আনিয়া, জনসাধারণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যে বীরপুরুষ, আমার প্রজাগণকে, দস্যু তস্করের হাত হইতে রক্ষা করিয়া, দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাকেই আমি কন্যা দান করিব।" যশোবন্ত রাও নামক একজন সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যুবা, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অসীম সাহসে, রাণীর আজ্ঞা পালন করিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞা-মত মুক্তাদেবীকে কণ্ঠরত্ন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! জামাতার অকালে মৃত্যু হইলে, তাঁহার কন্যারত্নও স্বামীর চিতায় জীবন শেষ করিয়া-ছিলেন। তিনি এইরূপে পুত্র, জামাতা, ও কন্যা হারাইয়াও, প্রজাপালনে একদিনের জন্যও অমনোযোগিনী হন নাই। তিনি এক পুত্র হারাইয়া, শত সহস্র পুত্রের জননী-স্বরূপা হইয়াছিলেন। দুই একজন কর্ম্মচারী, তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত দুই একটী অপুত্রক বিধবার বিষয়-সম্পত্তি, রাজকোষভুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। অহল্যা তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া, বিধবাগণকে ডাকাইয়া, সেই সকল অর্থ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিতে উপদেশ দেন। নিজেও যে অতুল সম্পত্তি পাইয়াছিলেন,তাহা ও অকাতরে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়া দেবমন্দির, ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, রাজপথ প্রভৃতি নিশ্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করিতেন। ইনি কেবল নিজ রাজ্য-মধ্যেই কীর্ত্তি-স্থাপনা করিয়া যান নাই; মথুরা, বৃন্দাবন, বিন্ধ্যাচল, কাশী, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানেও, তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ তাঁহাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ৩০ বৎসর কাল সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্যশাসন করিবার পর,১৭৯৫ খৃঃ অব্দে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বর্গলাভ করেন।



শিব-পূজা নিরতা অহল্যা বাঈ
(প্রাচীন চিত্র হইতে)



অহল্যা বাঈ-নির্ম্মিত চীর বা চৈন ঘাট

আমরা এখানে, কেবল তাঁহার বৃন্দাবনের কীর্ত্তি-কথাই বলিব। চীর ঘাটের দুইটি নাম—চীর ও চৈন। শ্রীকৃষ্ণ এখানে চীর বা বস্ত্রহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া, এই স্থানের নাম চীরঘাট, এবং কেশী-দানবকে বিনাশ করিয়া এইস্থানে চৈন (বিশ্রাম) করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম চৈনঘাট হইয়াছে। এ ঘাটটি অহল্যা বাইয়ের অর্থে বিনির্ম্মিত। ঘাটের উপর ৫।৬ মহল-বিশিষ্ট দেবালয় ও সদাব্রত রহিয়াছে। সেখানে প্রতিমাসে ১০০ শত জন অতিথির সেবা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আরও অধিক অতিথি-সেবা হইত, এখন দ্রব্যাদির মূল্য অধিক হওয়াতে, লোকসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। এখানকার ঠাকুরের নাম চৈনবিহারী। ঠাকুরের দক্ষিণদিকে বিমল-ধবল বসন বিভূষিতা অমলধবল-পাষাণ-বিনির্ম্মিতা, অহল্যাবাইয়ের যে পরম সুন্দর মূর্ত্তিটি আছে, তাহা দেখিয়া, ও এই দয়াময়ী রমণীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণে ভক্তির উদয় হয়। এতদ্‌ভিন্ন, নানা দুর্গম তীর্থস্থানে যাইবার পথও, তিনি করিয়া দিয়াছিলেন। হরিদ্বার হইতে বদরিকাশ্রমে যাইবার পার্ব্বত্যপথ, তাঁহার বহুসংখ্যক পথের অন্যতম।

বিংশ পরিচ্ছেদ

ইংরাজ-রাজের আমলে প্রতিষ্ঠিত দেব-মন্দিরাদি।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে মথুরামণ্ডল ইংরাজ-শাসনাধীনে আইসে। তদবধি বৃন্দাবনে যে সকল প্রসিদ্ধ সুরম্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবার তাহাদেরই কথা বলিব।

১ম—লালাবাবুর কুঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত, কান্দীগ্রাম-নিবাসী সিংহবংশে, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনের লোকেরা ইহাঁকে লালাবাবু বলে। বংশ-পরিচয়—হরেকৃষ্ণ সিংহের পুত্র মুরলীমোহন, একজন ধনী জমিদার ও মহাজন ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র,—রাধাগোবিন্দ, গঙ্গাগোবিন্দ ও রাধাচরণ। পিতার মৃত্যুর পর, রাধাচরণ বিষয়-ভাগ করিয়া লইয়া, কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন, তাহা জানা যায় নাই। রাধাগোবিন্দ মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ও সিরাজউদ্দৌলার অধীনে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নবদ্বীপে রাধাবল্লভ ঠাকুরের একটী মন্দির ও তৎসঙ্গে অতিথিশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি না থাকায়, মধ্যম গঙ্গাগোবিন্দ, সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। গঙ্গাগোবিন্দ ১৭৭৬ খৃঃ অঃ কলিকাতায় গবর্ণর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, বলিয়া, জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তিনি অন্য অনেক সৎকার্য্যও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রাণকৃষ্ণ সিংহ, ব্যবসায় করিয়া অনেক টাকা রাখিয়া যান। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম কৃষ্ণচন্দ্র, বা লালা বাবু। ইনি বাল্যাবধি অতি তেজস্বী-স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। কিশোর বয়সেই পিতার সহিত কলহ করিয়া, বর্দ্ধমানে যাইয়া তথাকার সেরেস্তাদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পরে ১৮০৩ খৃঃ অঃ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে, উড়িষ্যায় দেওয়ানি-কর্ম্ম অতি দক্ষতার সহিত নির্ব্বাহ করেন। কিছু দিন সেখানে কর্ম্ম করিয়া, পিতার মৃত্যু হইলে কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। কলিকাতায় কয়েক বৎসর অবস্থানের পর, একদিন সন্ধ্যাকালে কোন রাজপথচারী 'রাত-ভিখারী' পথিকের মুখে, দেহ ও ধনৈশ্বর্য্যের অনিত্যতা-বিষয়ক করুণগীতি শুনিয়া, তাঁহার মনে অকস্মাৎ বৈরাগ্য-সঞ্চার হইল। তিনি নিজ অতুল ঐশ্বর্য্য, ও রূপগুণবতী পত্নী রাণী-

কাত্যায়নীকে পরিত্যাগ করিয়া, পদব্রজে ভিক্ষুকবেশে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একটী কপর্দ্দকও সঙ্গে লইয়া যান নাই। তখন তাঁহার বয়স কেবল ৩০ বৎসর মাত্র। ভিক্ষান্নে নির্ভর করিয়া, সমস্ত পথ অতিক্রম করিয়া, অতি ক্লেশে তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, রূপ, সনাতন প্রভৃতি গোস্বামীরা যে সকল মন্দিরাদি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং জয়পুর, ভরতপুর প্রভৃতি দেশের রাজারাও যে সকল দেবালয় স্থাপনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা।

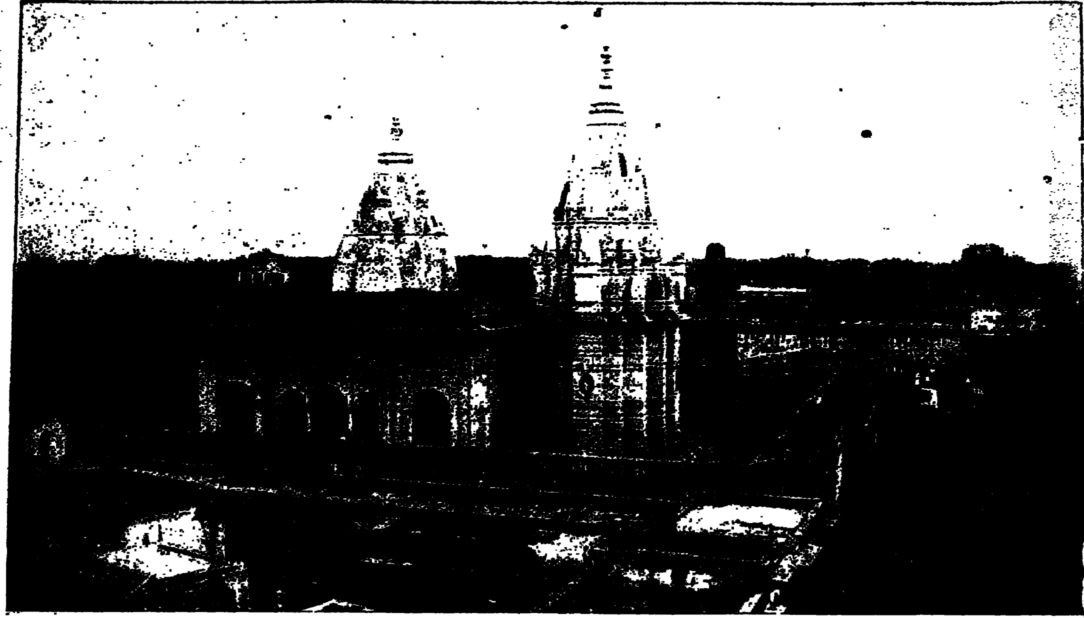
ইংরাজরাজের অধিকারে আসিলেও, তখন দেশ সম্পূর্ণ শান্ত ও নিরুপদ্রব হয় নাই। লোকে অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। বৃন্দাবনের এইরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া, তিনি নিজে ১৮১০ খৃঃ অঃ, ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া, একটী মন্দির ও তৎসঙ্গে অতিথিশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। ইহার ব্যয় জন্য, অবশ্যই কলিকাতা হইতে অর্থ গিয়াছিল। এই মন্দির ও অতিথিশালার ব্যয়-সঙ্কুলান জন্য, তিনি মথুরামণ্ডলে বাৎসরিক ২০৷২২ হাজার টাকা আয়ের জমিদারী ক্রয় করিয়া, দেবকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। সেই জমিদারীর উপসত্ত্ব হইতে, আজিও দেব ও অতিথি সেবা চলিতেছে। লালাবাবুর মন্দিরের পার্শ্বে, মথুরার ধনকুবের শেঠ-বংশীয়েরা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। উভয় মন্দিরের মধ্যবর্ত্তী একটী অপ্রশস্ত গলি-পথ লইয়া, বিবাদ বাধে; পরে তাহার মীমাংসার জন্য আদালত পর্য্যন্ত যাইতে হয়। ব্রজবাসিগণের মুখে শুনিতে পাই, সেই সময়ে লালাবাবু গোবর্দ্ধন-নিবাসী উড়িয়া কৃষ্ণদাস নামক পরমবিরক্ত সাধুর নিকট দীক্ষা লইতে গিয়াছিলেন। ইঁহার মনে এখনও "তমোভাব আছে বলিয়া, তিনি দীক্ষা দিতে অসম্মত হইলেন।

পরদিন লালাবাবু, শেঠেদের মন্দিরে যাইয়া কাঙ্গালী ও ভিখারী-গণের সহিত, এক পংক্তিতে ভোজনে বসিয়া গেলেন। শেঠেদের কর্ম্মচারীরা লালাবাবুর এইরূপ অমানুষিক দৈন্য দেখিয়া, সেই দিনই মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইল, ও উক্ত গলিপথ ছাড়িয়া দিল। ইহার পর হইতে, উভয় দলে বিবাদ মিটিয়া গিয়া, সদ্ভাব স্থাপিত হইল। কৃষ্ণদাস-বাবাজীও লালা বাবুর অনুপম বিনয় দেখিয়া, সানন্দে তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তখন লালা বাবুর বয়স ৪০।৪৫ বৎসর হইবে। এরূপ ভেক বা দীক্ষা লইবার পর হইতে, তিনি আর গৃহে বা মন্দিরে, কোথাও থাকিতেন না। বৃক্ষতলে বা পর্ব্বত-গুহায় বসিয়া দিবানিশি নিভৃতে নাম জপ এবং মাধুকরী করিয়া জীবনযাপন করিতেন। প্রবীণ বয়সে একদিন গোবর্দ্ধন-সন্নিহিত-পথে যাইবার সময়, অশ্ব-পদাঘাতে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়। ১৮৪২ খৃঃ অঃ সেই স্থানেই তাঁহার সমাধি দেওয়া হইয়াছিল। সমাধির উপর, ব্রজবাসী ও ভক্তগণের পদধূলি পড়িবে বলিয়া, কোন রূপ মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই। কেবল একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত বেদী-মাত্র গাঁথান হইয়াছে।

এখন মন্দিরের কথা বলিব। যমুনা-পুলিন-পার্শ্বে, চারিদিকে প্রাচীর-বেষ্টিত লালা-বাবুর কুঞ্জ। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুইটা দ্বার, পশ্চিম দিকের ফটকটি প্রত্যহ খোলা থাকে। ইহার উভয় পার্শ্বে কর্ম্মচারীদিগের আবাস গৃহ, এবং প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে কৃষ্ণচন্দ্রমা নামক ত্রিভঙ্গ মূরলীধর কৃষ্ণমূর্ত্তি ও রাধা বিরাজমান। উচ্চতায় মূর্ত্তিটি ৬।৭ ছয় সাত বৎসরের বালকের মত। বোধ হয়, এত বড় কৃষ্ণমূর্ত্তি বৃন্দাবনে আর দ্বিতীয় নাই। মন্দির, গৃহ, স্তম্ভ, প্রাচীরাদি সমস্তই ভরতপুর হইতে আনীত, ঈষৎ পীতাভ পাষাণে বিরচিত;

কেবল শিখর-দুইটি শ্বেত প্রস্তরে গঠিত। এ দুইটি দেখিতে বারাণসীর মন্দিরগুলির শিখরের ন্যায়। একটী শিখরের গায়ে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর সংলগ্ন আছে। চারিদিকে নানাবিধ কারুকার্য্য করা, তাহাতে নৃসিংহ, বামন, বরাহ প্রভৃতি অবতার গুলির মূর্ত্তিও সুনিপুণ ভাবে খোদিত। মন্দিরতল ও নাট-মন্দির-তলে মার্ব্বেল বিছান। পূর্ব্ব দিকের ফটকে অধিকতর কারুকার্য্য করা, সে দ্বার কেবল পর্ব্বোপলক্ষে খোলা হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের সম্মুখে পুষ্পোদ্যান। পশ্চিম দিকের ফটকের পার্শ্বে, রাণী কাত্যায়নীর 'সমাজ' (সমাধি) দেওয়া হইয়াছে। ইনি স্বামীর অনুমতি-ক্রমে প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ দুই জনকে পোষ্যপুত্র লইয়াছিলেন। লালা-বাবু রাধাকুণ্ডের চারিদিক পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। লালা-বাবুর ভগিনী কাঞ্চনমণি দাসীর, একটী স্বতন্ত্র ছোট দেবালয় বৃন্দাবনে আছে।

২য়—হাড়াবাড়ী—অনুমান ১৮২০ হইতে ১৮২৫ খৃঃ অঃ মধ্যে, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত, বহড়ু বা বড়ুগ্রাম-নিবাসী স্বর্গীয় নন্দকুমার বসু মহাশয়, বৃন্দাবনে গোপীনাথ বাজারের প্রবেশ-পথে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দদেব নামে, নূতন একটী বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহার জন্য বিস্তৃত দেবালয় করিয়া দেন। নন্দকুমার বাবু পূর্ব্বে হিজলি প্রদেশে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে, নিমকীর দেওয়ান ছিলেন। তিনি রাজকার্য্য উপলক্ষে, একবার জয়পুর সহরে গিয়াছিলেন। জয়পুরের রাণী তাঁহাকে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেন। তিনি সেই টাকা নিজে না লইয়া বৃন্দাবনে গোবিন্দজী, গোপীনাথজী ও মদনমোহনজীর তিনটী দেবালয় করিয়া দিয়াছিলেন। আসল বিগ্রহগুলি রাজপুতানায় রহিয়াছেন। তাঁহাদের



লালাবাবুর মন্দির

প্রতিভূস্বরূপ নূতন বিগ্রহ সকল মহম্মদ সাহের রাজত্বকাল হইতে বৃন্দাবনে স্থাপিত হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের উপদ্রবে ভগ্ন ও অপবিত্র হওয়াতে, পুরাতন মন্দিরগুলির ভিতর ঠাকুরের স্থান অশোভন ভাবিয়া, নন্দকুমার বাবু এই সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। অধুনা তাঁহার নির্ম্মিত দেবালয়েই উক্ত ঠাকুরগুলি বিরাজ করিতেছেন। তিনি এতদ্‌ভিন্ন হাড়াবাড়ী নামে, যে দেবালয়টী করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে ৪।৫ টী মহল আছে। পূর্ব্বে তথায় অতিথিসেবার উত্তম বন্দোবস্ত ছিল। এখন কালবশে ও অর্থাভাবে, সে দেবালয়টী নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেবাকার্য্যও তত সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন হয় না। নন্দকুমার বাবু, জন্মভূমি বড়গ্রামেতেও শ্যামসুন্দর নামক ঠাকুরের একটী সুন্দর দেবালয় করিয়া দিয়াছেন। আজিও তথায় অতিথি-সেবা এবং পর্ব্বাদি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে যে স্থানে এখন ইঁহার দেবালয় হইয়াছে, পূর্ব্বে সেই স্থানে, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশ হইতে, মৃত ধনী লোকের অস্থি লইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিতে যাইবার পথে, বাহকেরা বিশ্রাম করিত ; সেই জন্য ইহার নাম হাড়াবাড়ী হইয়াছে। নন্দকুমার বসুর পিতা—রামচরণ বসু, কাশীমবাজারের, কান্ত বাবুর জমিদারীতে নায়েব ছিলেন। নন্দ-কুমার বসুও, প্রথমে কোম্পানীর আড়ঙ্গে সামান্য গোমস্তা নিযুক্ত হইয়া, নিজ দক্ষতা গুণে, প্রথমে পাটনায় রেশম কুঠির দেওয়ান, পরে হিজলীতে নিমক-মহলের দেওয়ান হইয়াছিলেন।

৩য়—শ্রীজীর মন্দির—ইংরাজী ১৮২৬ খৃঃ অঃ জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের বড় ভগ্নী (পাটরাণী) আনন্দকুমারী দেবী, রেতিয়া বাজারে এই মন্দিরটী করিয়া দিয়াছেন। সুবৃহৎ ফটক পার হইয়া, প্রথম প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। ইহার সম্মুখেই কয়েক ধাপ

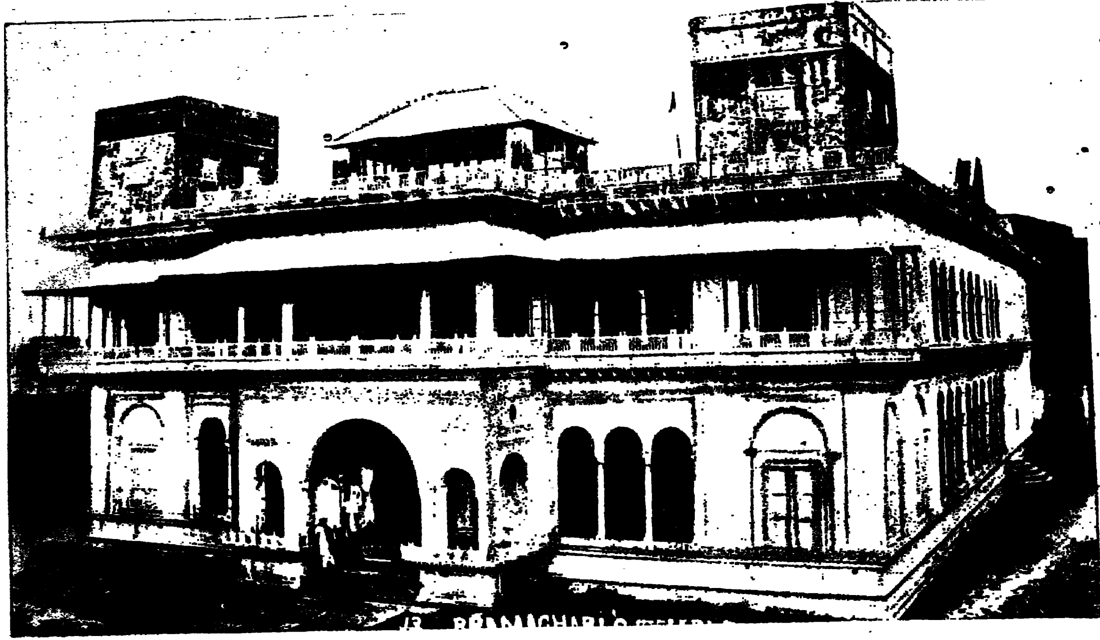
সিঁড়ি উঠিয়া দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে গেলে,সম্মুখেই ঠাকুর-দালান। তথায় 'আনন্দ মনোহর-বৃন্দাবনচন্দ্র' নামে যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বাহিরের নানাস্থানে ও ঠাকুর-দালানের চারিদিকে প্রাচীরগাত্রে শ্বেত মার্ব্বেল প্রস্তর বসান। কিন্তু সংস্কারাভাবে তাহাতে এত ময়লা পড়িয়াছে যে, সহসা মার্ব্বেল বলিয়া বোধ হয় না। পূর্ব্বোক্ত সোপানের দুই পার্শ্বে ৪।৫ ফুট উচ্চ দুইটা শ্বেত পাথরের হস্তী রহিয়াছে। অনেক স্থান অসংস্কৃত। এই মন্দিরের পার্শ্বেই, দোতালা মার্ব্বেল-মণ্ডিত ঘরের ভিতর, আনন্দ-কুমারীর সখী—রূপকুমারীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর আছেন। এখানেও দুইটা শ্বেত পাথরের হাতী আছে। কিন্তু রীতিমত মেরামত হয় না বলিয়া এই সকলই যেন ম্লান-ভাব ধারণ করিয়াছে। রূপকুমারীর ঠাকুরের নাম রূপ-মনোহর-বৃন্দাবনচন্দ্র। এই সকল মন্দির-পার্শ্বে রাণীদিগের যে আবাসগৃহ আছে, তাহা নানাস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

৪র্থ—বর্দ্ধমানের রাজাদিগের কীর্ত্তি—শ্রীজীর মন্দিরের সম্মুখে, রাস্তার অপরপার্শ্বে, বর্দ্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজ কীর্ত্তিচাঁদ বাহাদুরের রাণী—রাজরাজেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-বাড়ী আছে। এটী দেখিতে তত সুন্দর না হইলেও এখানে প্রতিদিন কয়েকজন করিয়া অতিথির সেবা হয়। সেই সেবাও সুশৃঙ্খলায় চলে। রাজরাজেশ্বরী দেবী, নন্দগ্রামের পাবন-সরোবরটীকে পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন।

৫ম—ব্রহ্মচারীর ঠাকুরবাড়ী—গোয়ালিয়র-পতি মহারাজ জিয়াজি সিন্ধিয়া ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চারি লক্ষ টাকা ব্যয়ে, বংশীবটের নিকট এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার গুরু গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারীকে ইহা দান করিয়াছেন। এখানে রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নৃত্যগোপাল নামে তিনটি বিগ্রহ পাশাপাশি গৃহে আছেন।

সমস্ত দেবালয়টী ভরতপুরের পাথরে নির্ম্মিত। এখানকার ফটক ও বাহিরের বারান্দাগুলিতে কারুকার্য্য বড়ই সুন্দর। ভিতরের গৃহগুলি এত সুবিন্যস্ত যে, তথায় আলোক ও বায়ু-সঞ্চালনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। নাটমন্দিরে রাজা ও তাঁহার গুরুর চিত্র বিলম্বিত রহিয়াছে। রাজা হইবার পূর্ব্বে, জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ—মাধো সিংহ এই মন্দিরে থাকিতেন। তিনি এখানকার মোহান্তের শিষ্য হইয়াছিলেন।

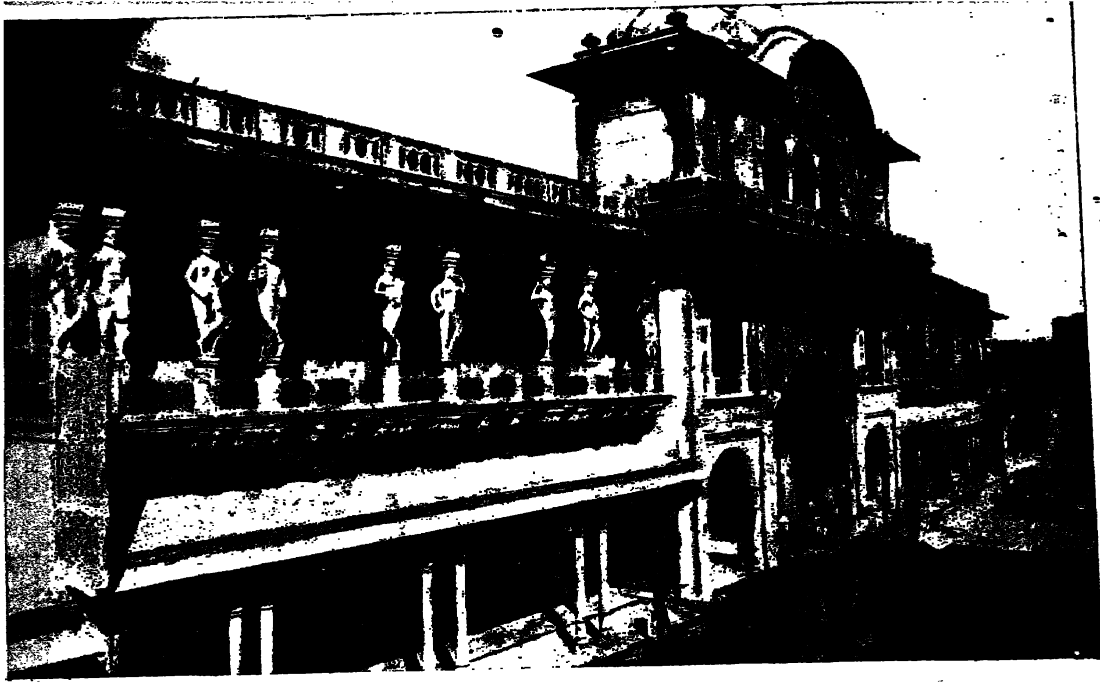
৬ষ্ঠ—টীকারি-রাণীর ঠাকুরবাড়ী।—বৃন্দাবনের উত্তরদিকে যমুনাতীরে, গয়া জেলার অন্তর্গত টীকারি নামক রাজ্যের অধিপতি, হিতকাম ঠাকুরের বিধবা রাণী—ইন্দ্রজিৎকুমারী, ইংরাজী ১৮৭১ সালে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে, এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে, রাধাকিষণ, রাধাগোপাল ও লাড্ডুগোপাল নামে তিনটী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। সেবার ব্যয়ের জন্য মাসিক পনের শত টাকা বৃত্তি বরাদ্দ আছে। প্রতিদিন ৬০ জন করিয়া অতিথি ও অভ্যাগত প্রসাদ পাইয়া থাকে। মন্দিরটি ভরতপুর হইতে আনীত ঈষৎ পীতবর্ণ পাথরে নির্ম্মিত ও নানা কারুকার্য্য-সুশোভিত; উচ্চ শিখরের উপরে, সোণার গিল্‌টি করা কলসটি সূর্য্যকিরণে ঝক্‌মক্ করিয়া জ্বলিতে থাকে। মন্দির ও নাটমন্দিরতলে মার্ব্বেল বিছান। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় বেতনভোগী গায়ক-দলেরা, সারঙ্গ ও মৃদঙ্গ বাজাইয়া, সুস্বরে গান করিয়া থাকেন। এ মন্দিরটি উত্তম কারুকার্য্য-বিশিষ্ট, ও দর্শনীয় স্থান। গৃহাদির বিন্যাসও বেশ পরিপাটী। তাহাতে বায়ু বা আলোক-সঞ্চরণের কোন ব্যাঘাত হয় না। এই মন্দিরের সম্মুখে, রাস্তার অপর পার্শ্বে, যে ক্ষুদ্র উদ্যানটি আছে, তাহা যমুনার প্লাবনে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে।



ব্রহ্মচারীর মন্দির

৭ম—সাজাহানপুরের মন্দির।—বেতিয়া-বাজার-পথে, লালা ব্রজকিশোর নামক সাজাহানপুরের দেওয়ান, ১৮৭৩ খৃঃঅঃ রাধাগোপাল ঠাকুরের এই মন্দিরটি পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে পথের পার্শ্বে, দোতলার বারান্দায়, কতকগুলি বিবসনা সখী বা নারীমূর্ত্তি স্তম্ভগাত্রে খোদিত আছে। কিন্তু তীর্থক্ষেত্রে প্রকাশ্যপথ-পার্শ্বে এরূপ লজ্জাহীনতা অশোভন ও অসঙ্গত। ফটকটি যদিও উচ্চ এবং কারু-কার্য্যে ভরা, তথাপি ততটা মনোরম নহে এবং সামঞ্জস্য-হীন। বাহির অপেক্ষা ভিতরটা অতিশয় সঙ্কীর্ণ, সেখানে আলোক ও বায়ুর পথ রুদ্ধ।

৮ম—মহারাণী স্বর্ণময়ীর মন্দির—খনিগর্ভস্থ মণির ন্যায়, যে ক্ষণজন্মা রমণী, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত, ভাটীকুল নামক গ্রামে (১৮২৭ খৃঃ অঃ) নিঃস্ব-তিলি-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজ অলোকসামান্য রূপে ও সুপ্রসন্ন ভাগ্যবলে একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, কাশীমবাজারের সুপ্রসিদ্ধ কান্ত বাবুর প্রপৌত্র—কুমার কৃষ্ণনাথের সহিত পরিণয়সূত্রে গ্রথিত হইয়া, বিস্তৃত জমিদারী ও অতুল বিষয়বিভবের অধিকারিণী হইয়াছিলেন; যিনি অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে, নারীজাতির একমাত্র দেবতা—পতিরত্নে বঞ্চিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়া, (১৮৯৭ খৃঃ অঃ) স্বর্গারোহণ করেন; যাঁহার মুক্তহস্তের অজস্র দানে—বিদ্যালয়, চতুষ্পাঠী, চিকিৎসালয়, কূপ ও পুষ্করিণী প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; সেই প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা মহারাণী স্বর্ণময়ী, বৃন্দাবনে যমুনাপুলিনপার্শ্বে একটি ঠাকুরবাড়ী স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। এখানে, পূর্ব্বে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ছিল, মহারাণী নূতন গোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছেন। এ দেবালয়-টিতে বাহাড়ম্বরের ততটা সমাবেশ নাই। দেব ও অতিথি-সেবা বেশ সুশৃঙ্খলায় চলে। স্বদেশ-বৎসল সর্ব্ব-জন-বল্লভ গৌড়রাজর্ষি মহারাজ মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, বৃন্দাবনে আসিয়া এইস্থানেই সময়ে সময়ে বাস করেন।



লালা ব্রজকিশোরের মন্দির

৯ম—নরোত্তম ঠাকুরের পাট—পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের পার্শ্বেই, রাজসাহীর জমিদারদিগের ঠাকুরবাড়ীতে, পদ্মাবতী-তীরস্থ খেতরী গ্রাম হইতে, শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক অভিষিক্ত, ছয়টি বিগ্রহের অন্যতম ব্রজমোহন ঠাকুরটীকে আনিয়া, এইস্থানে রক্ষা করা হইয়াছে।

১০ম—নবল গোবিন্দ কুঞ্জ—এই ভগ্নপ্রায় দেবালয়টি রাজা রাজবল্লভের বংশীয়, কুমার গৌরবল্লভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শেষ-জীবনে এই স্থানেই তীর্থবাস করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র রাধাকান্তের ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম হয়। কমলার ক্রোড়ে লালিত হইলেও, বীণাপাণির কৃপায়, নানা ভাষায় সুপণ্ডিত রাজা, ৪৬ বৎসরে, অক্লান্ত অধ্যবসায়েও অজস্র ব্যয়ে, প্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান প্রণয়ন করেন। তিনি তৎকালীন সমস্ত স্বদেশী-সৎকার্য্যের অগ্রণী ছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, ৮০ বৎসর বয়ক্রমে বৃন্দাবনে বাস করেন। সে সময়ে মথুরার ইংরাজ সৈনিকেরা বৃন্দাবনে আসিয়া, বানর, ময়ূর প্রভৃতি শিকার করিয়া, জীবহত্যা করিত। ব্যথিত হৃদয়ে রাজা, গভর্ণর জেনারলকে জানাইয়া, বৃন্দাবনে কোনরূপ জীবহিংসা আর না হয়, সেইরূপ আজ্ঞা আনাইয়া, ছিলেন। মথুরা হইতে বৃন্দাবনের প্রবেশ-পথে, বালাবাইয়ের সেতুর নিকট, ইংরাজি হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায়, প্রস্তরে খোদিত সেই নিষেধ-লিপি রহিয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার সজ্ঞানে স্বর্গলাভ হয়।

১১শ—জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ মাধো-সিংহের ঠাকুরবাড়ী—জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ মাধোসিংহ, মথুরায় যাইবার প্রশস্ত-রাজপথ-পার্শ্বে, এই সুবিশাল দেবালয়টি, প্রায় ত্রিশ বৎসরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দির-নির্ম্মাণে তাঁহার বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রাঙ্গণের চারিদিকে কর্ম্মচারী ও রাজারাণীদিগের থাকি-

বার জন্ত গৃহাদি আছে। প্রাঙ্গন-মধ্যস্থ মন্দির ও নাটমন্দির প্রভৃতি সমস্তই ইংরাজী আদর্শে গঠিত। মূল মন্দিরটির তিনটি দ্বার, ইহাও তিনখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর দিকে আনন্দবিহারী, মধ্যে রাধামাধব ও দক্ষিণের গৃহে নৃত্যগোপাল, গিরিধারী, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতির মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত আছেন। মন্দিরের দ্বারগুলি চারু-কারুকার্য্য-খচিত ও পিত্তল-নির্ম্মিত। দ্বার-পার্শ্বে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারপাল চামর হস্তে দণ্ডায়মান। সম্মুখের প্রাচীরটা সমস্তই, আগরার তাজমহলের অনুকরণে, শ্বেত প্রস্তরের উপর বিবিধ বর্ণের মহামূল্য প্রস্তরের ফলফুল ও লতাপাতা বিজড়িত। মন্দির ও নাট-মন্দির-তল শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের মার্ব্বেল পাথরের দ্বারা গালিচার মত চিত্রিত। নাট-মন্দিরটির ছাদ, চারিটি মোটা মোটা শিল্পকলা-সুশোভিত থামের উপর রক্ষিত হইয়াছে। ছাদের তলাটি বেশ সুচিত্রিত। নাট-মন্দিরের চারিদিকে, মহিলাগণের জন্য দোতালা বারান্দা আছে। এখনও ফটক ও উদ্যানাদির কর্ম্ম শেষ হয় নাই। গত ১৯১৬ খৃঃ অঃ এই মন্দিরে দেব-প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। লোকে বলে—মহারাজ মাধো সিংহের বাল্যজীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত হইয়াছিল; তাহারই স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই মন্দিরটী স্থাপিত করা হইয়াছে।

এই মন্দিরের পশ্চাৎদিকে, পথের অপর পার্শ্বে, হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব উকীল, শ্রীযুক্ত তারাকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট দেবালয় অবস্থিত। তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত, কাটুয়া বাবা নামক গুরুর শিষ্য। তিনি স্বহস্তে দেবসেবাদি করেন। আজকাল তিনি শান্তদাস বাবাজী নামে, চৌরাশী ক্রোশ ব্রজধামের মোহান্তপদ লাভ করিয়াছেন।

১৯শ—পাণ্ডাবাড়ী কুঞ্জ—যমুনাতীরে, ভরতপুরের লক্ষ্মী-রাণীর দেবালয়ের পার্শ্বে, কাশীর রামপ্রসাদ চৌধুরী নামক আগরওয়ালা বেণিয়া, যে মন্দিরটি করিয়া দিয়াছেন, সেটি যমুনার উপর হইতে দেখিতে

বড় সুন্দর দেখায়। এখানে ললিতকিশোর নামে ঠাকুর আছেন। প্রবেশ-পথ যুগলকিশোরের মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া। যমুনার উপর যে লম্বা টানা বারান্দা আছে, তাহার কারুকার্য্য দর্শনযোগ্য। এখানে হিন্দুস্থানী যাত্রীরা অধিক আসিয়া থাকে।

১৩শ—জগদীশ পণ্ডিতের পাট ও গোপাল-গুরুর কুঞ্জ—প্রভৃতি চৈতন্যদেবের পরিবারগণের কয়েকটী দেবালয় এখানে আছে। সেগুলি তত প্রাচীন নহে। দ্বিতীয়টি উৎকলদেশীয় যাত্রীগণের ঠাকুর-বাড়ী। এখানে জগন্নাথ-দেবের বৃহদাকার চিত্র আছে। এই দুইটি মন্দির ধীরসমীর যাইবার পথপার্শ্বে অবস্থিত।

১৪শ—সোণার গৌরাঙ্গ—গোপীনাথের দক্ষিণ দিকের ফটকের সম্মুখে, গলির ভিতর একটি ক্ষুদ্র দেবালয়ে স্থাপিত আছেন। অষ্টধাতু-নির্ম্মিত নিত্যানন্দ ও চৈতন্যদেবের দুইটি মূর্ত্তি, এখানে এই নামে পরিচিত।

১৫শ—ষড়্ভুজ মহাপ্রভু,—রাধারমণজীর বাটীর সম্মুখে, বৃন্দাবনের অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট, পণ্ডিত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে, চৈতন্যদেবের ষড়ভুজ আধুনিক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। গোস্বামী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে, অনেক দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকাদি, এই দেবালয়-সংলগ্ন পুস্তকাগারে সংগৃহীত রহিয়াছে।

১৬শ—সওয়া মণ শালগ্রাম—লুই বাজারের মোড়ে ও শ্যামসুন্দরের বাটীর সম্মুখে, একটি দোতলা মন্দিরের ভিতর, রাম-সীতা বিগ্রহের সম্মুখে, প্রায় অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ, গণ্ডকী নদীতে প্রাপ্ত, কিছুমাত্র চক্রচিহ্ন-বিহীন এই শালগ্রাম শিলাটী আছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে আরও ৩০।৪০টি ক্ষুদ্রাকার শালগ্রাম শিলাও আছে। আসল সওয়া-মণ শালগ্রাম, গোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরে দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭শ,—অষ্ট সখীর কুঞ্জ—মদনমোহনজীর মন্দিরের ফটক পার্শ্বে, হেতমপুরের রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত এই দেবালয়ে,রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে, চারিটি করিয়া ৮টি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত, প্রায় দেড় হাত উচ্চ, ৮টি সখীর মূর্ত্তি আছে। তাহাদের নাম ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, চিত্রা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবিকা। এই মন্দিরের অপর প্রাঙ্গণে, শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত রাজা ও রাণীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেবালয়টী ১২৯৬ সালে, কার্ত্তিক মাসে, রাসপূর্ণিমার দিন হেতমপুরের মহারাজ রামরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ও তৎপত্নী রাণী পদ্মাসুন্দরী দেবী প্রতিষ্ঠা করেন, ঠাকুরের নাম—রাধারাসবিহারী জিউ।

১৮শ—রাজর্ষি রায় বনমালী দাস বাহাদুরের ঠাকুর-বাটী—তড়াসের জমীদারদিগের, প্রধান সুন্দর ঠাকুর-বাটী রাধাকুণ্ড তীরে অবস্থিত। বৃন্দাবন হইতে মথুরা যাইবার পথে, যে সুপ্রশস্ত সুবিন্যস্ত উদ্যানে, সময়ে সময়ে ঠাকুর আনিয়া উৎসবাদি করিয়া থাকেন, সে উদ্যানটি মথুরার শেঠেরা, তাঁহাদিগের গুরুকে উপহার দিয়াছিলেন; রাজর্ষি সেই উদ্যান ক্রয় করিয়া, তাহার এক পার্শ্বে দেবালয় করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের বংশীয়া কোন তনয়া, ইঁহাদের রাধাবিনোদ নামক ঠাকুরের সাতিশয় সেবাপরায়ণা ছিলেন, সেই কারণে ঠাকুরটিকে অনেকে "জামাই ঠাকুর" নাম দিয়াছেন।

১৯শ,—কালাবাবুর কুঞ্জ ও রামকৃষ্ণ মিশন্ চিকিৎসালয়—কলিকাতা শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র,গুরুপ্রসাদ বসুর প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জটি, এই নামে অভিহিত। ভিতরে ৩।৪ মহলে দেবসেবা হয়, ও যাত্রীরা থাকে। বাহির মহলে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম। অনেকগুলি বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক ভদ্রসন্তান, এখানে থাকিয়া

প্রতিদিন, রোগীগণকে ঔষধ দান, ও নিরাশ্রয় দরিদ্র রুগ্ন যাত্রীগণকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়া, সযত্নে সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকেন। মিশনের সেবকদিগের এই নিঃস্বার্থ লোকহিতকর কার্য্য,বাঙ্গালীগণকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। কাশী, হরিদ্বার, পুরী প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের যে সকল আশ্রম আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে আমরা এতদিনে মানুষ হইতে শিখিয়াছি। মিশনের সেবকেরা ঔষধালয় ও হাসপাতালের জন্য যমুনা-তীরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছেন। অর্থাভাবে তথায় আজিও গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই।

২০শ—প্রেম মহাবিদ্যালয়—কয়েক বৎসর হইল,যমুনার কূলে, হাতুয়ার মহারাজের আনুকূল্যে,তাঁহারই বিশাল বাটীতে,এই লোক-হিতকর বিদ্যালয়টি স্থাপিত হইয়াছে। এখানে চারি পাঁচশত ব্রজ বালকেরা, সংস্কৃত হিন্দী ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে। ইহার সংলগ্ন লেবরেটারিতে, ছাত্রগণকে কিয়ৎ পরিমাণে, রসায়ন-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। চিত্র-বিদ্যা ও জরিপাদি শিখিবার জন্য, স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে। এই বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী, একটি কারখানায় (Mork shop) লৌহ গালাই ও ঢালাই কার্য্য, শিখান হয়। বালকেরা এই কারখানার অপর অপর শ্রেণীতে, কাষ্ঠের কার্য্য (টেবিল, চৌকী, আলমারি প্রভৃতি নির্ম্মাণ),চীনা মাটির কার্য্য (বাসন, পুতুল ও মূর্ত্তি গড়া), দড়ির কার্য্য (গালিচা, সতরঞ্চি, তুলিচা প্রভৃতি তৈয়ার করা) প্রভৃতি শ্রমশিল্প শিখিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী হইতেছে। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারে যখন বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম, দেখিতাম, ১৮।২০ বৎসর বয়স্ক ব্রজবাসী বালকেরাও ২।১ টা ছড়া আওড়াইয়া,যাত্রীগণের নিকট ভিক্ষা করিয়া পথে পথে বেড়াইত। আজি কালি সেই সকল বালকেরাই, এই বিদ্যালয়ে বিনা-বেতনে,বিদ্যা শিক্ষা, ও সঙ্গে সঙ্গে; নিজ অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া লইতেছে।

২১শ—গুরুকুল বিদ্যালয়—ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কিছুদূর গেলে, এই বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে মাসিক দশ টাকা মাহিনা দিয়া, বিদ্যার্থীরা থাকিবার স্থান ও আহার পায়; বিনা বেতনে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করে। এখানে অধিক বিদেশী ছাত্রেরাই পড়ে। আর্য্য সমাজের অধীনস্থ এই বৈদিক শিক্ষালয়ে নিরাকারভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয় বলিয়া, ব্রজবাসীরা, তাঁহাদের সন্তানগণকে এখানে পাঠাইতে, সম্মত নহে। এ স্থানটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বালকেরা স্বহস্তে উদ্যান রচনা, ও কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়াম চর্চ্চা ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া,সুস্থ ও সবল দেহ হইয়া থাকে।

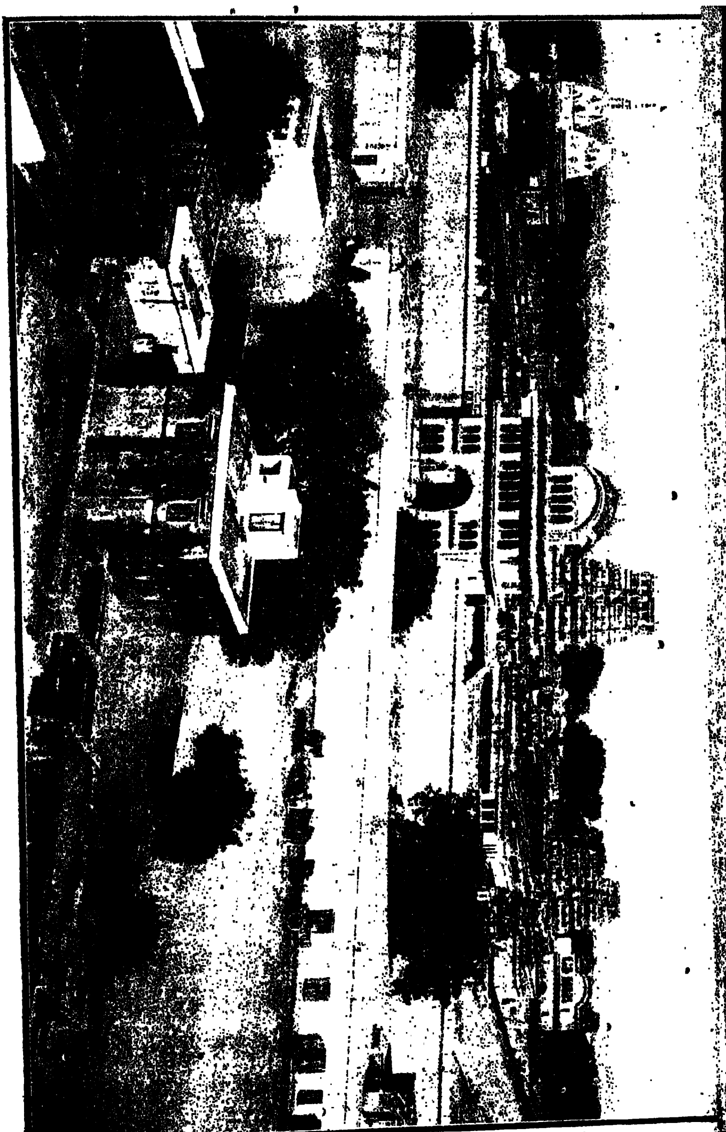
২২শ—তেজপালের ধর্ম্মশালা—বিদেশী পর্য্যটকগণের, পক্ষে ধর্ম্মশালা বা পান্থ-নিবাস কত প্রয়োজনীয়, তাহা পশ্চিমদেশীয় পর্য্যটক, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত মাড়োয়ারী, ক্ষত্রিয় ও আগরওয়ালা বেণীয়ারা যত বুঝেন, আমরা স্বগৃহপ্রিয় বাঙ্গালী, ততটা অনুভব করি না। এই জন্য পশ্চিমোত্তর প্রদেশে প্রায় সকল স্থানেই ধর্ম্মশালা আছে। এক একজন ধনী মহাজন বিপুল বিত্তব্যয়ে ধর্ম্মশালা করিয়া দিয়া থাকেন। সেখানে পান্থগণ বিনা-ব্যয়ে কয়েকদিন থাকিতে পারেন। কোন কোন পান্থশালার সঙ্গে দরিদ্র পথিকগণের জন্য সদাব্রতও থাকে। ইহাতে পর্য্যটকগণের কত যে সুবিধা হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই অবগত আছেন। বৃন্দাবনে নূতন ও পুরাতন কয়েকটি ধর্ম্মশালা আছে। তাহাদের মধ্যে পুরাতন সহরে, কলিকাতার সুবর্ণবণিক ৺নিমাইচরণ মল্লিকের ধর্ম্মশালা, এখানকার মিউনিসিপালিটির তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। অধুনা মির্জ্জাপুর-নিবাসী তেজপাল যমুনাদাস-নামক একজন সওদাগর রেলওয়ে ষ্টেশনের সন্নিকটে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি সুবৃহৎ ধর্ম্মশালা করিয়া

দিতেছেন। ইহার সহিত একটি দেবালয় ও সদাব্রত থাকিবে বলিয়া শুনিলাম। ঘর ও বারান্দাগুলিতে আলোক ও বায়ুর অবাধ গতি। ফটক ও সম্মুখভাগের কারুকার্য্যগুলি আধুনিক প্রণালীতে রচিত। ইহাও একটি দর্শনীয় স্থান। ইহা ছাড়া বারাণসীদাস নারায়ণদাস প্রভৃতির আরও কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

শেঠেদের মন্দির।

মথুরা হইতে যে প্রশস্ত রাস্তা আসিয়া বৃন্দাবনে শেষ হইয়াছে, তাহারই একপার্শ্বে গোবিন্দজীর মন্দির, অপরদিকে শেঠেদের সুবিস্তীর্ণ ঠাকুর-বাটী। ইহাতে ৪।৫টি মহল আছে। বাহিরের এক একটি মহল পার হইয়া ভিতরে যাইলে, ইহাঁদের ঠাকুর রঙ্গনাথজীর দর্শন মিলে। এ মন্দিরের অনেকগুলি ফটক আছে। আমরা মথুরার রাস্তার দিক হইতে আরম্ভ করিব। প্রথম ফটক পার হইলেই উভয় পার্শ্বে দোকানদার, এবং নিম্ন-কর্ম্মচারীদের আবাস-গৃহ। গো, অশ্ব, শকটাদিও এই মহলে থাকে। প্রথম ফটকের উপর ছাদ বা নহবৎ কিছুই নাই। কয়েকটা সিঁড়ি উঠিয়া, বৃন্দাবনী ধরণের অন্য একটা ফটক পার হইলে দ্বিতীয় মহলে যাওয়া যায়। ইহার চারিদিকে ব্রাহ্মণ ও পূজারিগণের বাস। তৃতীয় ফটকটি মান্দ্রাজ-দেশীয় গোপুরম্, নানা কারুকার্য্যে শোভিত ও সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। সপ্ততল এই ফটক পার হইলে, চারিদিকেই নানা দেবদেবীর গৃহ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর দিকে অনন্তনাগ-শয্যায় বিষ্ণু শয়ান, —লক্ষ্মী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন। দক্ষিণ দিকে রামসীতা; অপরাপর গৃহে কোথাও পরশুরাম, কোথাও সুদর্শন-চক্র, কোথাও



বঙ্কটেশ, বলদেব, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, বদ্রীনারায়ণ, নর-নারায়ণ ও বেণুগোপাল প্রভৃতি নানা দেবতার মূর্ত্তি। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে শ্রীরঙ্গনাথজীর মূল মন্দির, জগমোহন ও নাটমন্দির। মূল মন্দিরের ভিতর, দক্ষিণ হস্ত অভয়-মুদ্রাকারে উত্তোলিত, বাম হস্ত বিলম্বিত শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ-মূর্ত্তি; এটি বৃন্দাবনের অপর মূর্ত্তিগুলির মত ত্রিভঙ্গ মুরলীধর নহে। ইঁহার সঙ্গে বা মন্দিরের কোথাও রাধামূর্ত্তি নাই। এখানকার রঙ্গনাথের ধ্যান এইরূপ—

শঙ্খচক্রধরং দেবং গদাপদ্মধরং বিভুম্।
শ্রী-ভূমি-লীলা সহিতং নারায়ণমহং ভজে॥

শুনা যায়, শ্রীরঙ্গপত্তনে বিষ্ণুচিৎ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার গোদম্বা নাম্নী তনয়া বাল্যাবধি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শন-মানসে মথুরা, বৃন্দাবন ও যমুনা তীরে আসিবার জন্য পিতাকে বারংবার অনুরোধ করেন। বিষ্ণুচিৎ, এ সকল দেশ শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে অনেক দূর বলিয়া, নিজ রাজ্যেই শ্রীরঙ্গনাথ নামে দেবমূর্ত্তি ও একটি সুবৃহৎ দেবালয় স্থাপন করেন। আজন্ম-কুমারী থাকিয়া গোদম্বা শ্রীরঙ্গনাথের সেবা করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের অন্য নাম ছিল। শ্রীরঙ্গনাথের নাম হইতেই সে দেশের নাম শ্রীরঙ্গপত্তন হইয়াছে। সে যাহা হউক, শেঠদিগের এই বিস্তীর্ণ মন্দিরের এক স্থানে গোদম্বাদেবীর মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। সপ্তাহে একদিন করিয়া তথায় রঙ্গনাথকে লইয়া যাইয়া, উভয়ের একত্র পূজা করা হয়।

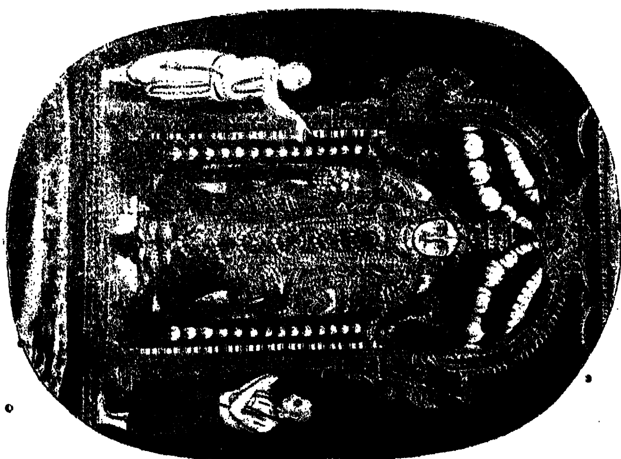
এখানকার সকল দেবতার দুইটী করিয়া মূর্ত্তি আছে। একটি সচল ও একটি অচল। সচল মূর্ত্তিটি লইয়া উৎসব সময়ে যানবাহনে বসাইয়া, নানা উদ্যানে ও নৌকা প্রভৃতির উপর স্থাপন করা হয়। অচল মূর্ত্তিটি মন্দিরে রাখিয়াই পূজা চলে। নাট মন্দির ও প্রাঙ্গণের চারিদিকের স্তম্ভ-



গোদম্বা দেবী



রঙ্গাচার্য্য



শ্রীরঙ্গনাথজী

গুলি চতুষ্কোণ, তাহার চারিদিকে উপরে চারিটী ও নীচে চারিটি দেবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। এখানকার স্তম্ভ, প্রাচীর, গৃহাদি সমস্তই ভরতপুর হইতে আনীত ঈষৎ পীতবর্ণের প্রস্তরে রচিত। প্রধান প্রধান মন্দিরগুলিতে ও নাট মন্দিরের ভূমিতলে মার্ব্বেল বিছান। স্তম্ভের ও প্রাচীরের গাত্রে যে সকল মূর্ত্তি আছে, সেগুলি দেখিতে অনেকটা মান্দ্রাজী ধরণের; তাহাদের মস্তকের মুকুটগুলি আমাদের দেশের বরের টোপরের মত। নাট-মন্দিরের সম্মুখেই বিষ্ণুধ্বজ। ইহাকে সাধারণ লোকে 'সোণার তাল গাছ' বলে। এটি উচ্চে ৬০ ফুট, সমস্তটাই তাম্র-নির্ম্মিত, উপরে সোণার গিল্‌টি-করা। ইহার পার্শ্বে অপর একটী ক্ষুদ্রাকার গিল্‌টি-করা পদ্মাসন আছে। তাহার নাম 'বলি প্রধান'; ইহাতে সর্ব্বদেবতার পূজা হয়। এই মহল পার হইয়া গেলেই পুষ্পোদ্যান। তাহার মধ্য-স্থলে নানা-কারুকার্য্য-শোভিত বারদুয়ারি; এখানে ঠাকুর মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকেন। ইহার একদিকে পাথরে বাঁধান পুষ্করিণী, অপরদিকে অনেকগুলি ফোয়ারা-শোভিত মণ্ডপ, এবং উহার পার্শ্বেই গোদম্বাদেবীর মন্দির। এ দেবালয়ে অনেকগুলি বড় বড় ইন্দারা আছে; তাহার একটির নাম বেণু কূপ। এতদ্‌ভিন্ন রন্ধনশালা ও গুরুদিগের থাকিবার অপরাপর গৃহাদিও আছে।

মথুরার প্রসিদ্ধ শেঠ বা শ্রেষ্ঠিদিগের নির্ম্মিত বলিয়া এ মন্দিরের নাম শেঠদের মন্দির। তাঁহাদের বংশাবলীর এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়;—গোয়ালিয়র-রাজের গোকুলদাস পারক-জী নামে, একজন কোষা-ধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজার বড় প্রিয়পাত্র। সে সময়ে গোয়ালিয়রে ঠগি ও দস্যুদিগের বড়ই উপদ্রব ছিল। পারক-জীর কৌশলে দস্যুদল ধরা পড়ে, ও রাজ্য হইতে তাড়িত হয়। দস্যুদিগের সঞ্চিত কয়েক লক্ষ টাকা ও জহরত পর্ব্বতগুহা মধ্যে পাওয়া গেল। রাজা চৌর্য্যসঞ্চিত সে





বিষ্ণুধ্বজ বা সোণার তাল গাছ,

টাকা নিজে না লইয়া, পারকজীকে সমস্তই পুরস্কার দিলেন। রাজার মৃত্যুর পর, গোকুলদাস পারকজী মথুরায় আসিয়া, সেই টাকা ব্যবসায়ে খাটাইয়া, কয়েক বৎসরে শতগুণ বৃদ্ধি করিলেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুহুরী মণিরামকে বিশেষ ভালবাসিতেন। একদিন মণিরাম কর্ম্মে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া, পরদিন তাঁহাকে পারকজী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মণিরাম বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "কল্য হুজুরের একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে।" (পুত্রটি অবশ্য মণিরামেরই; পশ্চিমাঞ্চলে বিনয়বশতঃ এইরূপ বলা হইয়া থাকে।) পারকজী তিনবার জিজ্ঞাসা করেন, "কাহার পুত্র হইয়াছে?" মণিরাম তিনবারই "হুজুর, আপনার পুত্র" বলিয়া উত্তর দিলেন। নিঃসন্তান পারকজী ইহাতে বড়ই প্রীত হইয়া, সেই শিশুর জাতকর্ম্মাদি মহা সমারোহে সম্পন্ন করাইলেন এবং শিশুটিকে নিজগৃহে আনিয়া তাহার নাম লছমীচাঁদ রাখিয়া, লালন পালন করিতে লাগিলেন। পরে মণিরামের অপর দুইটি পুত্র হইয়াছিল। তাহাদের নাম রাধাকিষণ ও গোবিন্দলাল মৃত্যুকালে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পারকজী তাঁহার অতুল বিষয়সম্পত্তি মণিরামকে দিয়া যান।

মণিরাম জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর (১৮৩৬ খৃঃ অঃ) সেই বিষয় তাঁহার তিন পুত্রেরা পাইলেন। রাধাকিষণ ও গোবিন্দদাস জ্যেষ্ঠের অজ্ঞাতে, গোবর্দ্ধন-নিবাসী মান্দ্রাজ-দেশীয় শ্রীসম্প্রদায়ী রঙ্গাচার্য্য নামক কোন গুরুর নিকট, গোপনে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং এই সুবৃহৎ দেবালয়টির পত্তন আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠ লছমীচাঁদ ইহা জানিতে পারিয়া, তিনিও জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, সেই গুরুর নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। এখন হইতে তিনজনে মিলিয়া, ১৮৪৫ হইতে ১৮৫১ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত, সাত বৎসরে ৪৫

লক্ষ টাকা ব্যয়ে, এই সুবিশাল মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার বহিঃপ্রাঙ্গণের প্রাচীরটি দীর্ঘে ৭৭৪ ফুট, প্রস্থে ৪৫০ ফুট। এই দেবালয়ের বার্ষিক আয় ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর, তাহা হইতে নিত্যসেবা ও অতিথি-সেবা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তদ্দ্বারা নিম্ন-লিখিত পর্ব্বগুলি মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

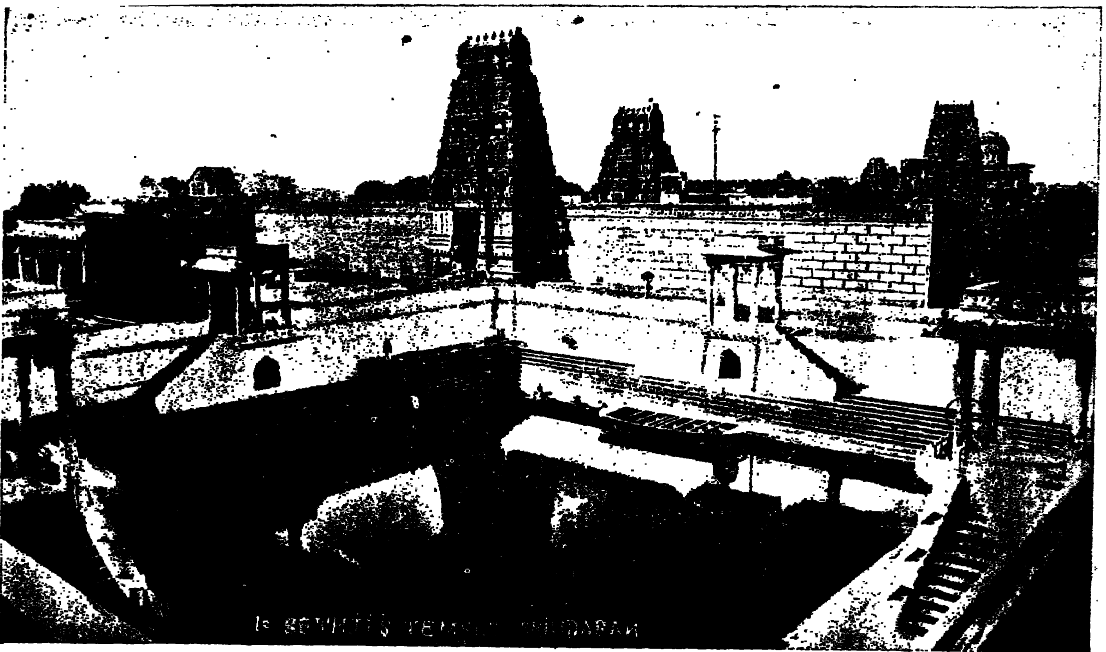
আষাঢ় মাসে লতা-পল্লব-পুষ্প-বিরচিত 'ফুল-বাঙ্গলার' ভিতর ঠাকুরের অধিষ্ঠান হয়। এখানকার বাঙ্গলাকে "বড় ফুল বাঙ্গলা" বলে।

শ্রাবণ মাসে পূর্ণিমা দিবসে, পাথরে বাঁধান পুষ্করিণীর উপর নৌকা করিয়া ঠাকুরকে লইয়া বেড়ান হয়, এবং সেই সময়ে গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে লীলা দেখান হয়।

ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিন, লাঠার মেলা হয়। একটি বিশ ফুট উচ্চ, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, গোলাকার স্তম্ভের গাত্রে তৈল ঘৃতাদি মাখাইয়া, তাহাকে মসৃণ ও পিচ্ছিল করা হয়। তাহার ডগায় টাকা ভরা ঘটি বাঁধা থাকে। এ অঞ্চলের বলবান্ ব্রজবাসীরা চৌবেরা ও পালওয়ানেরা ঐ টাকা লইবার আশায় উপরে উঠিতে থাকে; তখন পার্শ্ববর্ত্তী মঞ্চের উপর হইতে তৈল, হরিদ্রা ও নানা রঙ্ মিশ্রিত জল তাহাদের উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। লোকটা কিয়দ্দূর উঠিয়া পিছ্লাইয়া পড়িয়া যায়। চারিদিকে হাসির রোল উঠে। অনেকে বারবার নিষ্ফল হইলে, অবশেষে কেহ না কেহ সেই টাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষে, এখানে রামলীলার সময়, নিকটবর্ত্তী স্থান সকল হইতে অনেক লোক মেলা দেখিতে আইসে।

পৌষমাসে বৈকুণ্ঠের উৎসবের সময়, নাটমন্দিরটীকে বিচিত্রভাবে সাজাইয়া, ঠাকুরকে নগর ভ্রমণ করাইয়া আনিয়া, তথায় স্থাপিত করা হয়।



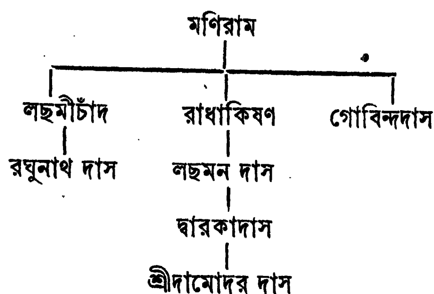
জন্দ্রমোক্ষণ কুণ্ড

চৈত্রমাসে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া হইতে ত্রয়োদশী পর্য্যন্ত, দশদিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব মেলার সময়, এখানে বহু দূরদেশ হইতে লোক-সমাগম হয়। অনেক দোকানপাটও বসিয়া থাকে। প্রতিদিন সচল বিগ্রহটিকে বিভিন্ন যানবাহনে বসাইয়া, অল্পদূরবর্ত্তী উদ্যানে লইয়া যাওয়া হয়। প্রথম দিন প্রভাতে পূর্ণকোটী নামক যানে, ও বৈকালে রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহপৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। দ্বিতীয় দিন প্রাতে সুবর্ণনির্ম্মিত সূর্য্যপ্রভা যানে, ও বৈকালে রৌপ্যনির্ম্মিত হংসে; তৃতীয় দিন প্রাতে স্বর্ণময়গরুড়ে, ও বৈকালে স্বর্ণনির্ম্মিত হনুমান-পৃষ্ঠে; (এই রাত্রিতে কিছু আতসবাজীও হয়।) চতুর্থ দিন প্রাতে রূপার শেষনাগে, ও বৈকালে কল্পবৃক্ষে; পঞ্চম দিন প্রাতে রূপার পাল্কীতেও বৈকালে সিংহশার্দ্দূলে; এবং ষষ্ঠদিন কেবল বৈকালে কাচ নির্ম্মিত বিমানে বসিয়া, ফাগ খেলিতে খেলিতে ঠাকুর বাহির হন। সপ্তম দিবস প্রাতে বিচিত্র-কারুকার্য্য-শোভিত বৃহৎ রথে চড়িয়া, ঠাকুর উদ্যানে গমন করেন। সেদিন সেখানে নানা বর্ণের ফোয়ারা চলে। অষ্টম দিবস স্বর্ণ-নির্ম্মিত ঘোড়ার উপর ঠাকুর বাহির হন। এই দিন রাত্রিতে মহা সমারোহে বহুবিধ আতসবাজী দেখান হয়। নবম দিবস প্রাতে সোণার পাল্কীতে, ও বৈকালে সোণার চন্দ্রপ্রভা যানে ঠাকুর বাহির হন। দশম দিবস অপরাহ্নে পুষ্পবিমানে ঠাকুর বিরাজমান হইলে মেলা সমাপ্ত হয়। প্রতিদিন ঠাকুরের শোভাযাত্রার সময় বোমার আওয়াজ করিয়া সকলকে জানান দেওয়া হয়। সর্ব্বাগ্রে একটি হস্তীর উপর ধ্বজা বাহির হয়। তাহার পর ঘোড়ার পৃষ্ঠে দামামা চলে, তাহার পিছনে চারিজন করিয়া সারি বাঁধিয়া, আট দশ লাইন পদাতিক চলে, ইহাদের গায়ে হরিদ্রা বর্ণের পরিচ্ছদ, মাথায় লাল পাগড়ী, ও স্কন্ধে কাষ্ঠের নকল বন্দুক। ইহার পর ইংরাজী ব্যাণ্ড, তৎপশ্চাৎ ব্রাহ্মণেরা মুখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে, ও হস্তে চামর ব্যজন করিতে থাকেন। যেদিন যে যান নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই যানেই ঠাকুর বাহির হন।

মন্দির হইতে অতি অল্পদূরেই সুবিন্যস্ত পাষাণময় ফটক, দালান, নহবৎ, মণ্ডপ ও ফোয়ারা-শোভিত উদ্যানটী অবস্থিত। শোভাযাত্রা করিয়া সচল রঙ্গনাথজীকে মৃদুমন্দ গতিতে তথায় লইয়া যাইতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। সেখানে ভোগ সমাপ্ত হইলে ঠাকুর পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আইসেন। এই মন্দিরের পুরোহিতেরা সকলেই মান্দ্রাজ বা দ্রাবিড় দেশীয়, তাঁহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া এই মন্দিরের ঘেরার ভিতর বাস করেন। ইঁহাদের জামাতা বা বধূ আবশ্যক হইলে নিজদেশ হইতে আনাইয়া বিবাহ দেন। এই মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে সংস্কৃত ভাষা ও পূজা-পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য একটি ছোটখাট পাঠশালা আছে। শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব-সঞ্জাত 'বেণুকূপ' এই মন্দিরের ঘেরার ভিতর রহিয়াছে। মন্দিরের গাত্রে ও ফটকের উপর এক দিকে শঙ্খ, অপর দিকে চক্র, মধ্যে রামানুজ-সম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। ইহাদের তিলকচিহ্ন নাসামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত দুইটি শ্বেত উর্দ্ধ রেখা, নিম্নভাগ ভ্রূমধ্যগত একটি রেখার দ্বারা উভয়টি সংযুক্ত। এই দুইটি উর্দ্ধ পুণ্ড্রের মধ্যস্থানে অপর একটি রক্তবর্ণ উর্দ্ধরেখা অঙ্কিত করা হয়। রক্তবর্ণ রেখাটিকে ইহারা শ্রী বা লক্ষ্মীর চিহ্ন বলেন। শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদের সহিত রাধাকৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ গৌড়ীয় বা বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের মত সম্পূর্ণ মিলে না। সেইজন্য উপাসনা-পদ্ধতি ও পর্ব্বাদিতে উৎসব বিভিন্ন প্রকার। ইঁহাদের পুরোহিতেরাও বিলাস-লালসা-শূন্য নহে। অনুমান খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামানুজাচার্য্য তাঁহার শ্রীসম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। টোটাদ্রি, রামেশ্বর, শ্রীরঙ্গ, কাঞ্চী ও আহোবালেম প্রভৃতি দক্ষিণ দেশেই ইহাদের প্রধান প্রধান মঠ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদান্তসার, বেদার্থসংগ্রহ, বেদান্তপ্রদীপ, গীতা-ভাষ্য, শ্রীভাষ্য, রামানুজ-কৃত সূত্রভাষ্য প্রভৃতি ইঁহাদের প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ।

ধীর সমীরের নিকট শেঠদিগের আরও একটি পুরাতন চারি পাঁচ মহল-বিশিষ্ট মন্দির আছে। তাহার শিখর শ্বেত-প্রস্তর নির্ম্মিত। সেখানে লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় শেঠেরা গবর্ণমেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। মথুরা সহরে ইহাদের আরও অনেক কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সে সকল কথা মথুরা বিবরণে বলিব।

শেঠবংশীয়দিগের এইরূপ বংশলতা পাওয়া যায়।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

সাহজীর মন্দির।

যমুনার তীরে গোবিন্দঘাটের উপর সাহজীদের যে দেবালয়টি অবস্থিত আছে, পূর্ব্বের সেখানে হিম্মৎ বাহাদুর ও গণেশ গিরি নামে দুইজন যোদ্ধা সন্ন্যাসী বাস করিতেন। হিম্মৎ বাহাদুরের আসল নাম অনুপ গিরি। নানা যুদ্ধে জয়ী হইয়া "হিম্মৎ বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনি প্রথমে দশনামী সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ভুক্ত রাজেন্দ্র গিরির নিকট বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। পরে শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দুর্দ্ধর্ষ নাগাদিগের দলে মিশিয়া, শৈব হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটি এখনও গোবিন্দঘাটের পার্শ্বে রহিয়াছে। তাহারা বাস্তবিক বুন্দেলখণ্ডের লোক।

কিন্তু বৃন্দাবনের লোকেরা ইঁহাদিগকে বর্গী বলিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইঁহারা অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য লইয়া, কখন ভরতপুরের জাঠ-রাজাদিগের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতেন এবং লুণ্ঠনাদি করিয়া ধনসঞ্চয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহাদের ভয়ে নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারেরা পর্য্যন্ত শঙ্কিত থাকিতেন। তবে ইঁহাদের একটি গুণের কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে, ইহাঁরা কৃপণ ধনীর সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া, নিরাশ্রয় অক্ষম দরিদ্রগণকে সাহায্য করিতেন। একবার ভরতপুরের রাজাদিগের নিকট ইঁহাদের কয়েক সহস্র টাকা পাওনা হয়। রাজারা সে টাকা দিতে অস্বীকার করিলে, হিম্মত গিরি ও গণেশ গিরির আদেশে, তাঁহাদের সৈন্যেরা যাইয়া, গোবর্দ্ধনের নিকটস্থ কুসুম-সরোবরের চারিদিক হইতে, বড় বড় পাষাণ খুলিয়া আনিয়া বৃন্দাবনে আপনাদিগের মন্দিরের সোপান ও ঘাট ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কুসুম-সরোবরটি ভরতপুরের রাজারা পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বেই জাঠ-সর্দ্দার ভরতপুরপতি সুরজমলের পাষাণ-রচিত, বহুব্যয়ে নির্ম্মিত সমাধি-মন্দির; সেটিরও কিছু কিছু অঙ্গহানি করিয়াছিল। ১৮০৩ খৃঃ অঃ ভরতপুর-যুদ্ধে ইংরাজের সপক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, বলিয়া সন্ধির সর্ত্তানুসারে ইঁহারা এলাহাবাদ হইতে কালপী পর্য্যন্ত যমুনাতীরবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগ জায়-গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুই তিন বৎসরের মধ্যে উভয়ের কাল হওয়াতে, তাঁহাদের উত্তরাধিকারীরা বৃটিশরাজকে সে সমস্ত ভূসম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিল। এই সময়ে তাঁহারা বৃন্দাবনে টাকশাল বসাইয়া নিজ নামে মুদ্রাও চালাইয়াছিলেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা প্রায় ৪০ বৎ-সর পরে, বৃন্দাবনের গোবিন্দঘাটের উপর তাঁহাদের যে ঠাকুরবাড়ী ছিল, তাহা লক্ষ্ণৌনিবাসী সাহ বিহারীলালের পৌত্র—সাহ কুন্দনলাল ও সাহ ফুন্দনলালকে বিক্রয় করেন। নব ক্রেতারা পূর্ব্ব মন্দিরের কিয়দংশ পরি-

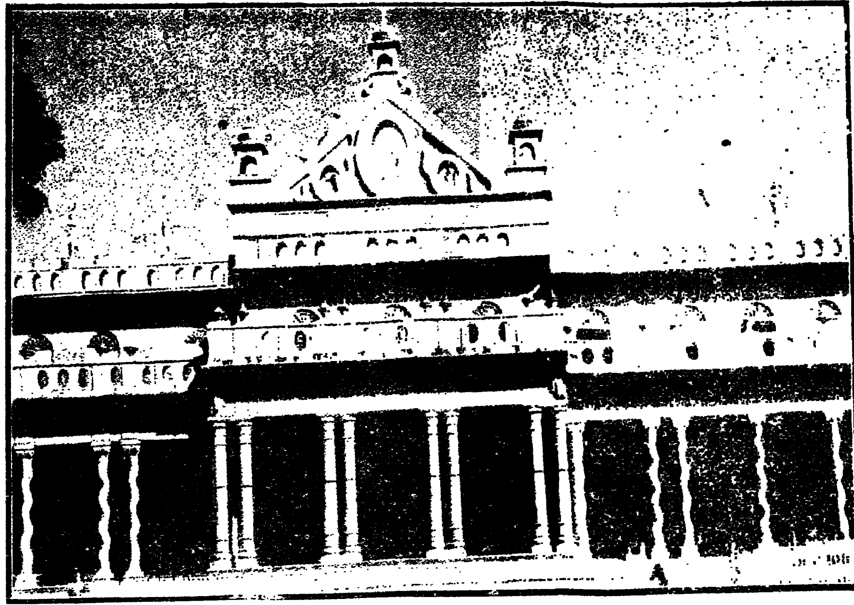
বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া,দশলক্ষ টাকা ব্যয়ে আগাগোড়া সুরম্য মার্ব্বেল নির্ম্মিত দেবালয় ১৮৫৫ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এটিকেই লোকে সাহজীর মন্দির বলে। এই মন্দিরটির প্রবেশদ্বার পূর্ব্বদিকে। ফটকটি দেখিতে লক্ষ্ণৌ নগরের কেশরবাগের ফটকের মত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে, ফরক্কাবাদ-নিবাসী আগড়ওয়ালা বেণিয়া—সাহ বিহারীলাল, লক্ষ্ণৌএর নবাবগণের জন্য, মণিরত্ন-বিজড়িত মুকুট,সিংহাসন ও রাজোচিত অলঙ্কারাদি সরবরাহ করিয়া,কোটীশ্বর হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবিন্দলাল ও পিতৃপথাবলম্বনে বিষয়সম্পত্তি আরও বর্দ্ধিত করিয়া যান। গোবিন্দলালের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত রঘুবর দয়াল ও মাখন লাল, তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুন্দনলাল ও ফুন্দনলালকে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ দিতে অস্বীকার করাতে, তাঁহারা আদালতের সাহায্যে অর্দ্ধেক অংশ প্রাপ্ত হন। কুন্দন ও ফুন্দন কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন ব্যবসাবাণিজ্য চালাইয়াছিলেন। ইহাঁরা ধীর ও ধর্ম্মপ্রবণ লোক ছিলেন বলিয়া, অধস্তন কর্ম্মচারীরা অনেক টাকা আত্মসাৎ করে। ক্ষতি দেখিয়- ইহাঁরা ব্যবসায় তুলিয়া দিয়া, বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ-জীবন তথায় ধর্ম্মকর্ম্মে অতিবাহিত করেন। ফুন্দনলালের পুত্র হয় নাই। কুন্দনলালের পুত্র মাধুরী শরণ, বিধবা পত্নী রাখিয়া অল্পবয়সেই দেহত্যাগ করেন। সেই বিধবা এখন পোষ্যপুত্র লইয়াছেন। ইহাঁরা গোপালভট্ট-প্রতিষ্ঠিত রাধারমণজীর পূজারী বংশের শিষ্য।

ফটক পার হইলেই পুষ্পবাটিকা। তাহার পর মক্রাণা হইতে আনীত বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের মার্ব্বেল-নির্ম্মিত দেবালয়। দেবালয়ের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকে দুইটি বারান্দা, সম্মুখদিকের বারান্দার কয়েকটি মার্ব্বেল-নির্ম্মিত স্তম্ভ ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত ঘুরান। অপরগুলি,লম্বাকৃতি। ভূমিতল ও প্রাচীরগাত্র শ্বেত-মার্ব্বেল-বিজড়িত। দেবালয়টি তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত।

দক্ষিণ দিকের প্রকোষ্ঠে, সিংহাসনোপরি দশ বার অঙ্গুলি পরিমিত ক্ষুদ্র রাধারমণ-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে লোকে ছোট রাধারমণ বলে। ঠাকুরের সম্মুখেই প্রতিদিন আরতির সময় ফোয়ারা হইতে জলধারা উত্থিত হয়। এই প্রকোষ্ঠের সম্মুখেই নাটমন্দির-গৃহ; তাহার উপরে ও নীচে গোপীগণের অনেকগুলি চিত্র আছে। চিত্রগুলি কৃত্রিম বর্ণে রঞ্জিত নহে। যেখানে যে বর্ণ লাগিবে, সেই বর্ণের মার্ব্বেল দিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ঘাগরা ও অলঙ্কার প্রভৃতি বিরচিত। একটি চিত্রে গোপিকা কার্পা করিয়া গোলাপজল ঢালিতেছেন। সে কার্পা (শিশি) দেখিলে, তাহার ভিতর জল যেন ঢল ঢল করিতেছে বলিয়া মনে হয়। অন্য চিত্রে কোন বালিকা পারাবত উড়াইতেছে, অপর চিত্রগুলিতে কেহ তাম্বুল, কেহ বা মাল্য, পুষ্প, চামর, আরতি ও বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি হস্তে করিয়া সেবার ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া আছে। এই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বে, পীতবর্ণ মার্ব্বেল-আচ্ছাদিত, নানা-আসবাব-সুশোভিত বাসন্তী গৃহ। তথায় শ্রীপঞ্চমীর সময় ঠাকুরের বার দেওয়া হয়। সম্মুখের দিকের বারান্দার প্রাচীর-গাত্রে এই মন্দিরের স্থাপয়িতা ভ্রাতৃযুগলের চিত্র দিবার জন্য মার্ব্বেল ফ্রেম লাগান হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা নিজ দৈন্য দেখাইয়া,ব্রজবাসী ও ভক্তগণের পদরজ-লাভ-প্রত্যাশায়, নিজ নিজ এবং পরিবারবর্গের চিত্র বারান্দার ভূমিতলেই অঙ্কিত করাইয়াছেন। ইহাঁদের এত দৈন্য যে, ইহাঁদের সমাজে সুসজ্জিত বিমানে করিয়া শবদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার প্রথা আছে; এই দুইভাই কিন্তু নিজ নিজ মৃতদেহ পায়ে দড়ি বাঁধিয়া ব্রজের সুপবিত্র রজের উপর দিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবার আদেশ করিয়াছিলেন। বংশধরেরা সেই আদেশ পালন করিয়াছিল।

বারান্দার প্রাচীরগাত্রে যে দুইখানি চিত্র আছে, তাহার একখানিতে



সাহজীর মন্দির

কুম্ভকক্ষে সখী ললিতা, অপরখানিতে স্নানোত্থিতা ভুজঙ্গিনীতুল্য-বেণী বিলম্বিতা রাধা-ঠাকুরাণী, এবং বেণীর নিম্নদেশে চঞ্চু ব্যাদান করিয়া একটি ময়ূর অঙ্কিত রহিয়াছে। এই শেষোক্ত চিত্রখানি সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। রূপগোস্বামী, তাঁহার রচিত চাটুপুষ্পাঞ্জলি নামক রাধিকা-স্তোত্রের প্রথম শ্লোকে, রাধার বেণীর সহিত কালভুজঙ্গীর উপমা দিয়াছিলেন। শ্লোকটি এই—

নব গোরোচনাগৌরীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্।
মণিস্তবকবিদ্যোতী বেণী ব্যালাঙ্গনাং ফণাং॥

অর্থ—নব গোরোচনা সদৃশ গৌরবর্ণা, ও সুনীল-কমল-তুল্য-বসনা রাধার মণিশ্রেণী-দেদীপ্যমানা বেণী দেখিতে যেন কালভুজঙ্গীর ফণার মত।

এইরূপ বিষধরীর সহিত রাধার বেণীর তুলনা দেখিয়া, সনাতন গোস্বামী কিছু ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং রূপগোস্বামীকে অনুযোগও করিয়াছিলেন। ব্রজপরিক্রমাগ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইহার কিছুদিন পরে, সনাতন গোস্বামী রাধাকুণ্ড-তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি পরমাসুন্দরী ব্রজবালিকার স্কন্ধবিলম্বিত বেণী দেখিয়া, বাস্তবিকই সর্প বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, নীচের ময়ূরটি বেণীকে যে সর্পভ্রমে খাইতে আসিতেছে, তাহাই সূচিত করিতেছে; কেন না, ময়ূরেরাই সর্প ভক্ষণ করে—ইহা কবিপ্রসিদ্ধি।

বারান্দার সম্মুখবর্ত্তী সোপানের উভয় পার্শ্বে দুইটি শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সিংহাসন ও কয়েকটি ফোয়ারা আছে। পর্ব্বোপলক্ষে ঠাকুরকে বাহিরে আনিয়া, বারান্দায় বার দেওয়া হয়। সেই সময়ে ফোয়ারাগুলিতে জলক্রীড়া চলিতে থাকে।

আমি একদিন চৈত্রমাসে কৃষ্ণা রজনীতে, এই দেবালয়ে উৎসব দেখিতে গিয়াছিলাম। সে রাত্রিতে ঠাকুরদিগকে নানাবিধ সমুজ্জ্বল বেশ-

ভূষায় ভূষিত করিয়া, সম্মুখের বারান্দায় বার দেওয়া হইয়াছিল। বহু-সংখ্যক ঝাড় ও দেওয়ালগিরি হইতে আলোকমালা নির্গত হইয়া, মসৃণ মার্ব্বেল-নির্ম্মিত স্তম্ভ ও প্রাচীর-গাত্রে প্রতিফলিত হইয়া স্থানটিকে বড়ই মনোরম করিয়াছিল। উৎস-বিনির্গত জলকণার উপর ও দেবাঙ্গভূষিত রত্নরাজির উপর, রশ্মিসকল ক্রীড়া করিতেছিল। আতর, গোলাপ ও কুসুম-সৌরভে স্থানটি সুরভিত হইয়াছিল। অদূরে নহবৎ হইতে সুমিষ্ট স্বরলহরী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আমি সম্মুখস্থ একটি বাঁধান বৃক্ষতলে বসিয়া, অতৃপ্ত নয়নে বহুক্ষণ ধরিয়া দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া পড়িলাম। মরি! মরি! এমন মধুরোজ্জ্বল শান্ত কান্ত বিমল সুষমা ইহজীবনে আর কোন দেবালয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ক্ষণ-কালের জন্য আমি চিত্তহারা হইয়া পড়িয়াছিলাম। কে যেন কোথা হইতে অতি সুকোমল রাগিণীতে 'কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া' গাহিতে লাগিল—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ, মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধী মৃদুস্মিতমেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

হে দেব! না জানি তুমি কতই মধুর!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

এবার আমরা বৃন্দাবনের ঘাট ও পল্লীর বিবরণ দিব। গঙ্গার উপর হইতে বারাণসীধামে ঘাট, মন্দির প্রভৃতির যেরূপ অনুপম শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, মথুরাতেও ঘাট ও মন্দিরগুলির কিয়ৎপরিমাণে শোভা সেইরূপ। বৃন্দাবনেও যমুনার উপর হইতে ঘাট ও মন্দিরগুলিকে যে এক সময়ে বড়ই রমণীয় দেখাইত, তাহা আজিও বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়

এই যে,কালীদহ ঘাট হইতে কেশীঘাট পর্য্যন্ত যে দিকে লালপ্রস্তর-বিরচিত সুন্দর সুন্দর ঘাট-মন্দিরাদি আছে, সেদিকে চড়া পড়িয়া যাইতেছে। আর ঘাটগুলিও সংস্কারাভাবে অনেক স্থানে ভগ্ন ও জলাভাবে স্নানার্থিগণের পক্ষে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এই সকল ঘাটগুলি ঠিক কোন্ কোন্ সময়ে নির্ম্মিত, তাহা বলিতে পারা যায় না। আমরা একে একে সেগুলির পরিচয় দিতেছি—

১ম, মোহান্তের ঘাট—নির্ম্মাতা পণ্ডিত মতিলাল। ২য়, রামপোল ঘাট—নির্ম্মাতা বিহারীজির গোস্বামীগণ। ৩য়, কালীদহ ঘাট—নির্ম্মাতা হোলকার রাও। ৪র্থ, গোপাল ঘাট—নির্ম্মাতা করৌলীর রাজা মদনপাল। ৫ম, নাভাওয়ালা ঘাট—নির্ম্মাতা নাভাপতি হীরাসিংহ। ৬ষ্ঠ, প্রস্কন্দন ঘাট—নির্ম্মাতা মদনমোহনের গোস্বামিগণ। ৭ম, সূর্য্য ঘাট—নির্ম্মাতা অজ্ঞাত। ৮ম, কড়িয়া ঘাট—নির্ম্মাতা কোলদেশীয় গোস্বামিগণ। ৯ম, যুগল ঘাট—নির্ম্মাতা হরিদাস ও গোবিন্দদাস ঠাকুর। ১০ম, ধূসর ঘাট—নির্ম্মাতা অজ্ঞাত। ১১শ, নয়া ঘাট—নির্ম্মাতা ভজনলাল গোস্বামী। ১২শ, শ্রীজী ঘাট—নির্ম্মাতা জয়পুরের রাজগণ। ১৩শ, বিহারী ঘাট–নির্ম্মাতা দক্ষিণ-দেশীয় আপ্পারাম। ১৪শ, ধরোয়ার ঘাট - নির্ম্মাতা ধূরারাজ রণধীর সিংহ। ১৫শ, নাগরীদাস ঘাট—নির্ম্মাতা নাগরী দাস। ১৬শ, ভীম ঘাট—নির্ম্মাতা কোটার রাজা ভীমসিংহ। ১৭শ, আন্ধেরা ঘাট—নির্ম্মাতা জয়পুরের রাজা মানসিংহ। ১৮শ, টেহরি-ওয়ারা ঘাট—নির্ম্মাতা টেহরির রাজা। ১৯শ, আমলীতলা ঘাট—নির্ম্মাতা অজ্ঞাত। ২০শ, বর্দ্ধমান ঘাট—নির্ম্মাতা বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্র। ২১শ, বারোয়ারা ঘাট—নির্ম্মাতা উদয়পুরের রাণারা। ২৩শ, শৃঙ্গার ঘাট—নির্ম্মাতা শৃঙ্গারবটের গোস্বামীগণ। ২৪শ, গঙ্গামোহন ঘাট—নির্ম্মাতা ভরতপুরের রাজা সুরজমলের পত্নী গঙ্গামোহিনী। ২৫শ, গোবিন্দ ঘাট—নির্ম্মাতা জয়পুর-রাজ মানসিংহ।



কালীয়দমন ঘাট

২৬শ, হিম্মত বাহাদুর ঘাট—নির্ম্মাতা অনুপগিরি হিম্মত বাহাদুর। ২৭শ, চীর বা চৈন ঘাট—নির্ম্মাতা অহল্যাবাই। ২৮শ, হনুমান ঘাট,—নির্ম্মাতা জয়পুর-রাজ জয়সিংহ। ২৯শ, ভ্রমর ঘাট—নির্ম্মাতা জয়সিংহ। ৩০শ, কিশোরী ঘাট—নির্ম্মাতা ভরতপুরের কিশোরী রাণী। ৩১শ, পাণ্ডা-ওয়ালা ঘাট—নির্ম্মাতা কাশীর রামপ্রসাদ চৌধুরী। ৩২শ, কেশীঘাট—নির্ম্মাতা ভরতপুরের লছমী রাণী।

পল্লী—আমরা কেবল পল্লীগুলির নাম দিয়াই ক্ষান্ত হইব। সকল গুলির বিবরণ দিতে হইলে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়ে। তবে কয়েকটি দেবালয়ের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি।

১। জ্ঞানগুদরী, ২। গোপেশ্বর মহাদেব, ৩। বংশীবট, ৪। গোপীনাথ বাগ, ৫। গোপীনাথ বাজার, ৬। ব্রহ্মকুণ্ড, ৭। রাধা-নিবাস, ৮। কেশীঘাট, ৯। রাধারমণ, ১০। নিধুবন, ১১। পাথরপুরী, ১২। নাগর গোপীনাথ, ১৩। গোপীনাথ ঘেরা. ১৪। নাগর গোপাল, ১৫। চীর ঘাট, ১৬। মণ্ডি দরওয়াজা, ১৭। গোবিন্দজী, ১৮। নাগর গোবিন্দজী, ১৯। টাকশাল গলি, ২০। রানজীদ্বার, ২১। কণ্ঠিওয়ালা বাজার, ২২। সেবা-কুঞ্জ, ২৩। কুঞ্জ-গলি, ২৪। ব্যাসজীকা ঘেরা, ২৫। শৃঙ্গার-বট, ২৬। রাসমণ্ডল, ২৭। কিশোর-পুরা, ২৮। ধোবিওয়ারি গলি, ২৯। রঙ্গীলাল কি গলি ৩০। সুখন খাতা গলি, ৩১। পুরাণ সহর, ৩২। লারিওয়ালা গলি, ৩৩। গাব ধূপকি গলি, ৩৪। গোবর্দ্ধন দরওয়াজা, ৩৫। আহীর পাড়া, ৩৬। দুগাইত পাড়া, ৩৭। বরওয়ার মহল্লা, ৩৮। মদনমোহনের ঘেরা, ৩৯। বিহারীপুর, ৪০। পুরোহিতওয়ারা গলি, ৪১। মণি পাড়া, ৪২। গৌতম পাড়া, ৪৩। আটখাম্বা, ৪৪। গোবিন্দবাগ, ৪৫। লুই বাজার, ৪৬। রেতিয়া বাজার, ৪৭। বনখণ্ডি মহাদেব, ৪৮।

ছিপিকি গলি, ৪৯। রায় ওয়ারি গলি, ৫০। বুন্দেলকি বাগ, ৫১। মথুরা দরওয়াজা, ৫২। সবাই জয়সিংকা ঘেরা, ৫৩। ধীর সমীর, ৫৪। মৌনীদাসকি টাটী, ৫৫। গহ্বর বন, ৫৬। গোবিন্দ কুণ্ড, ৫৭। রাধাবাগ।

বৃন্দাবন হইতে মথুরা ৬ মাইল দূরে; যাইবার সময় অহল্যাগঞ্জ ও জয়সিংহ-পুরা নামে দুইটী গ্রাম পার হইয়া যাইতে হয়। মধ্যপথে একটি গভীর খাল বা খাত আছে। মাধোজী সিন্ধিয়ার তনয়া বালাবাই ১৮৩৪ খ্রীঃ অঃ তাহার উপর একটি পাষাণ-রচিত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সেতু হইতে অনতিদূরে (১৮৭৩ খৃঃ অঃ) লালা-কিষণলাল নামক একজন বণিক পথিকদিগের জন্য একটি পাকা-গাথা তলাও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মথুরা যাইবার পুরাণ রাস্তাটি যমুনার নিকট দিয়া গিয়াছিল। এখন অনেক স্থান বে-মেরামত রহিয়াছে ও অনেক স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ধারে গুজরাট দেশের কুশলচাঁদ শেঠের ৪০ বিঘা বাগান ও মথুরা শেঠেদের পুরাতন বাগান; সেখানে এখন রাজর্ষি রায় বনমালীবাহাদুরের ঠাকুরবাটী হইয়াছে। আজকাল মথুরা হইতে বৃন্দাবনে যাইবার ছোট রেল হইয়াছে। পূর্ব্বে পদব্রজে, এক্কায় বা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত হইত।

আমরা যে সকল মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। করৌলী, নাভা, অযোধ্যা, ত্রিপুরা, কুচবিহার, কোটা, টিকমগড়, দতিয়া, বিকানীর, আলোয়ার, জম্বু, হাতরাস, দিনাজপুর, ধুরা, ময়মনসিংহ, টিহরি, উদয়পুর প্রভৃতি নানা স্থানের রাজা ও জমিদারগণের প্রতিষ্ঠিত আরও অনেক দেবালয় আছে। তাহার কতকগুলিতে সুশৃঙ্খল-ভাবে, কতকগুলিতে বা বিশৃঙ্খলভাবে সেবা চলিতেছে। সর্ব্বসমেত বৃন্দাবনে অনুমান এক হাজারের উপর দেবালয় আছে। তাহার কত

পরিচয় দিব ? এমন কি কয়েক-জন ধনবতী বেশ্যারাও কয়েকটি দেবালয় স্থাপিত করিয়াছে। সুতরাং এই স্থানেই এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ করিলাম।

পর্ব্বাদি—এখানে ফুলদোল, ফুলবাংলা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, অন্নকূট প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব পর্ব্বে উৎসব হইয়া থাকে। তবে ঝুলন, জন্মাষ্টমী, শরতের রাস ও হোলীর সময় বহুলোক-সমাগম হয়। ইহা ছাড়া কেশী, কালীয়, অঘাসুর, বকাসুর, কংস প্রভৃতি দৈত্যবধ, দাবানল ভক্ষণ, গোচারণ, অন্নভিক্ষা এবং রামলীলাও প্রদর্শিত হয়।

মথুরা হইতে সমাগত প্রশস্ত রাজপথের পূর্ব্বদিকে গবর্ণমেণ্ট বিনির্ম্মিত চুঙ্গি ও মিউনিসিপাল আফিস, ডাকঘর, থানা, রেজেষ্টারী আফিস, স্কুল, হাঁসপাতাল, ডাক বাঙ্গালা প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ ভাবে পরে পরে অবস্থিত। এই সকল পার হইয়া গেলেই শেঠেদের বড় বাগান। বৃন্দাবনে খ্রীষ্টান মিশনারিদিগের নির্ম্মিত একটী মিশন হাউস, ও স্ত্রীলোকেদিগের জন্য হাসপাতাল স্থাপিত আছে। ইংরাজ-আমলে একটি মসজিদও নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ৪০।৫০ ঘর মুসলমান বাস করে। তাহাদের বালকেরা মসজিদ-সংলগ্ন মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়ে উর্দ্দূ ভাষা শিক্ষা করে। মুসলমানদিগের মৃতদেহ এখানে কবর দেওয়া হয় না, তাহাদের কবর-স্থান মথুরায়। এখানকার মুসলমানগণ তৈল-নিষ্পেষণ, এবং ঘুটিং পোড়াইয়া চূর্ণ প্রভৃতি প্রস্তুত করে। ইহার সর্ব্বপ্রকার নীচ কর্ম্ম করিয়া থাকে। তবে দারোগা, জমাদার বা পাহারাওয়ালা প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেক মুসলমান আছে।

বৃন্দাবনকে বাঙ্গালীর উপনিবেশ বলিলেও চলে। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে প্রায় আট আনা লোক বাঙ্গালী ও বাকি আট আনা অপর দেশীয়। বৃন্দাবনে সর্ব্বসমেত অনুমান ২৫ হাজার লোকের বসতি। এখানকার ভূমি তিন রকমেই বিক্রয় হইয়া থাকে—

১ম, জড় খরিদ্দা—ইহাতে ক্রেতা সমস্ত জমির মালিক হইয়া থাকেন, অর্থাৎ কাহাকেও কর বা খাজনা দিতে হয় না।

২য়, মশলা খরিদ্দা—ইহাতে ক্রেতা ভূস্বামীদিগকে খাজনা দিয়া জমির উপর বাড়ীঘর নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আবশ্যক মত দান-বিক্রয়ও চলে। আমাদের দেশে মৌরসী পাট্টা দাতার মত, ভূস্বামী কেবল বাটির মালিকের নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনা পাইয়া থাকেন।

৩য়, ভেটনামা—ইহাতে কোনও ভক্ত যে-কোন দেবালয়ের ভূসম্পত্তির জন্য যৎকিঞ্চিৎ ভেট বা সেলামী দিয়া এবং আপনার ইচ্ছামত বাটী ঘর নির্ম্মাণ বা পরিবর্ত্তন করিয়া,জীবিত কালের জন্য ভোগ করিতে পারেন। ভক্তের মৃত্যুর পর, সেই ভূমি বা বাটী, যে দেবালয়ের সম্পত্তি, তাহা সেই দেবালয়ের সম্পত্তি-ভুক্ত হইয়া যায়।

৪র্থ, পারশাল্লী—ইহাতে একজন ভক্ত, কোন প্রসিদ্ধ দেবালয়ে ২৫০৲ হইতে ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা দিয়া,বাসের জন্য দুই একখানা ঘর পান এবং প্রতিদিনের আহারের জন্য সেই দেবালয় হইতে অন্ন, রুটী এবং তদুপযোগী ব্যঞ্জনাদি পাইয়া থাকেন। আজকাল খাদ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে, জমার টাকার পরিমাণও বাড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিত্যক্ত যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, সমস্তই দেবালয়ের লোকেরা 'ফৌতি মাল' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন; তাঁহার সৎকার ও মহোৎসবাদির ব্যয় জন্য তাহা হইতে খরচ দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক বৃদ্ধ, বিধবা ও অপুত্রক লোকে এই ভাবে বাস করিতেছেন। ইহাতে শেষে তাঁহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য ভাবনা থাকে না।

এখানে লালাবাবু, ব্রহ্মচারী, দাগবী দাস, কাসীমবাজার, টিকারী বনোয়াবাড়ী, কিশোরী রাণী, অহল্যাবাই, সাহজী, বাবুলাল আগর, ওয়ালা প্রভৃতি কয়েকটি দেবালয়ে সত্র বা সদাব্রত আছে—তথায় নির্দ্দিষ্ট

সংখ্যক অতিথির সেবা হইয়া থাকে। যাত্রীরা, যে কোন দেবালয়ে ঠাকুর-দের ভোগের জন্য টাকা জমা দিলে, তথাকার প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এখানকার পাণ্ডাদিগকে ব্রজবাসী বলে। তাঁহাদের আর একটী নাম সনোড়িয়া বা সনাঢ্য। ইঁহারা বলেন যে, শ্রীরামচন্দ্র যখন অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রামচন্দ্রের নিকট সুবর্ণ দান পাইয়াছিলেন। সেই সম্মান জন্যই ইঁহাদের নাম সনাঢ্য হইয়াছে। তাঁহার পর শত্রুঘ্ন যখন লবণ দৈত্যকে বধ করিয়া, মথুরা নামে রাজধানী স্থাপন করেন, সেই সময় হইতে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আসিয়া, ব্রজমণ্ডলে বাস করিতেছেন। রেল হইবার পূর্ব্বে ব্রজবাসীরা নানা দূরদেশে যাইয়া, যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। যাত্রীগণকে মন্দিরে মন্দিরে লইয়া যাইয়া ঠাকুর দেখানই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য। যাত্রীগণের অর্থাভাব হইলে, ইঁহারা কখন কখন টাকা কড়িও কর্জ্জ দিয়া থাকেন। পরে যাত্রীরা দেশে যাইয়া সে টাকা পরিশোধ করেন। ইহাঁদের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সংস্কৃত ভাষা জানেন। সামান্যরূপ হিন্দী পড়িয়া, নিজ যজমানী ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। কেবল ২।১টা অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলেই হইল।

বৃন্দাবনে 'গোরে বা গো-রহে' (গো-রক্ষক) ছত্রী নামে এক শ্রেণীর রাজপুতের বাস আছে। তাহারা বলে, দেবমন্দির-রক্ষার জন্য মহারাজ মানসিংহ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণকে এদেশে ভূসম্পত্তি দিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইহারা অনেকেই দ্বারবান, পেয়াদা প্রভৃতির কর্ম্ম করিয়া থাকে। কেহ কেহ চাষবাস করিয়া থাকে। গোবিন্দজী ও মদনমোহনের মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে, এখন ইহাদের কয়েক ঘর মাত্র বাস করিতেছে। অবশিষ্ট লোকেরা যমুনা-পারে নানা গ্রামে বাস করে; তাহারা প্রায় সকলেই কৃষিজীবী।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাদের প্রবীণ ব্রজবাসী—প্যারীলাল টেঁট-ওয়ালা মহাশয় বলিলেন—"গিরি গোবর্দ্ধন, যমুনা মাই ও ব্রজের পবিত্র রজ ভিন্ন, দ্বাপর যুগের বা কৃষ্ণলীলার সময়ের, অন্য কোন নিদর্শন (relic) আপনি এখানে পাইবেন না। যাহা কিছু ছিল,সে সমস্তই বৌদ্ধ ও মুসলমান-বিপ্লবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন যাহা কিছু দেখিতেছেন, সে সমস্তই চারিশত বৎসরের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। সেই দুঃখেই ত রূপ গোস্বামী 'যদুপতে ক্ব গতা মথুরা পুরী" বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন।" গ্রাউস সাহেবও বলিয়াছেন, "আকবরের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভবনাদি এখানে মেলা যায় কি না সন্দেহ।"

চৈতন্যদেব ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন বৃন্দাবন দেখিতে যান, তখন এখানে একটিও মন্দির বা দেবমূর্ত্তি ছিল না। মথুরা অতি প্রাচীন নগরী হইলেও, আজি-কালি বৃন্দাবনে তদপেক্ষা অনেক দেব-মন্দির হইয়াছে এবং তীর্থ-যাত্রীর সংখ্যা, বৃন্দাবনেই অধিক হইয়া থাকে। এই রূপ পরিবর্ত্তনের মূল কারণ, বাঙ্গালী চৈতন্যদেব ও তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী। গ্রাউস সাহেব তাঁহার মথুরা-বিবরণে লিখিয়াছেন—

The first named community (Bengali or Gauriya Baishnavas) has had a more marked influence on Brindaban than any of the others, since it was Chaitanya, the founder of the sect, whose immediate disciples were its first temple-builders" (p. 183.)

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

তীর্থযাত্রীর করণীয়।

হাবড়া হইতে রেলপথে বৃন্দাবনের দূরত্ব ৮৩৮ মাইল, তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ন্যূনাধিক ১৩৲, অবিশ্রান্ত গতিতে ৩৫।৩৬ ঘণ্টায় সেখানে পঁহুছান যায়। তুণ্ডলা বা হাথরস জংসনে গাড়ি বদল করিয়া, মথুরা জংশন ষ্টেসনে যাইতে হয়, তথা হইতে ছোট রেলপথ বৃন্দাবনে গিয়াছে। যাঁহারা স্বল্প লোক সঙ্গে, দু-চারি দিনের জন্য, বেড়াইবার হিসাবে সেখানে যান, তাঁহারা তেজপাল, ৺নিমাই মল্লিক অথবা অন্য কোন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া দর্শনাদি করিতে পারেন। যাঁহারা অধিক লোক লইয়া, অপেক্ষাকৃত অধিক দিন থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এখানকার তীর্থ-পুরোহিত, (আপন আপন ব্রজবাসী) ঠিক করিয়া লইবেন। ভ্রমণক্লান্ত পথিকের পক্ষে দলবদ্ধ পাণ্ডাগণের অনুসন্ধান, বিরক্তিকর হইলেও, অপরিচিত দেশে একজন গাইডের আবশ্যক, নতুবা নবাগতকে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; তাই ইহা বলিলাম। পাণ্ডা ব্রজবাসীর সাহায্যে কোন কুঞ্জে (বাটীতে) ভেট দিয়া, অথবা ভাড়া ধার্য্য করিয়া, আপন পছন্দমত বাসা ঠিক করিয়া লইবেন। কেহ কেহ 'ধূলা-পায়ে' (বাসায় যাইবার পূর্ব্বে) গোবিন্দজীকে দর্শন করিয়া থাকেন। অপরে যমুনায় স্নান পূজা করিয়া, ও গোপেশ্বর শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া, শ্রীশ্রী গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি অপরাপর ঠাকুর দেখিতে যান।

ঠাকুর দেখিতে যাইলে, ভেট বা প্রণামী দিতে হয়, তৎসঙ্গে প্রধান প্রধান দেবালয়ে ছড়িদারি প্রভৃতি বাবও আছে। কোন দেবালয়ের প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করিলে, তথায় ভোগের জন্য টাকা জমা দিলেই উহা পাওয়া যায়। কেশী-ঘাটে শ্রাদ্ধ করা, বা নগর পরিক্রমা করা, আপনার স্বেচ্ছাধীন। ধনী লোকেরা ঠাকুরদিগের জন্য, বস্ত্রালঙ্কারাদিও দিয়া থাকেন। অনেকে এখানে সপ্তাহ পারায়ণ মহোৎসব দিয়া, নগর-সঙ্কীর্ত্তন বাহির করিয়া থাকেন, এ সমস্ত অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। কোন দেবালয়ের প্রাঙ্গণে, অথবা বারান্দায় আপনার, বা পূর্ব্বপুরুষগণের নাম, ধাম লিখাইতে ইচ্ছা করিলে, সেজন্য পৃথক খরচ দিতে হয়। সাধু বা ব্রজবাসীদিগের ভোজন করান, আপন ইচ্ছামত করিলেই চলে। আপন আপন গুরুর পাটে ভেট দিবার প্রথা আছে। তীর্থ দর্শন শেষ হইলে, নিজ নিজ তীর্থ-পুরোহিত ব্রজবাসীকে, তাঁহার পারিশ্রমিক দিয়া, তাঁহার নিকট সুফল লইয়া বিদায় হইতে হয়। বৈষ্ণবের আবশ্যক সমস্ত উপকরণ এখানে পাওয়া যায়। এখানকার ছোলা ভাজা ও চীনা বাদাম প্রসিদ্ধ। দেশস্থ আত্মীয়-স্বজনের জন্য, এখান হইতে পাড়-ছাপান ধুতি, সাটী, উড়ানি প্রভৃতি অনেকেই লইয়া যান। বানরদিগের উপদ্রব হইতে, আপনাদিগের দ্রব্যাদি, সতত সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য।

মাঘ মাসের মধ্য হইতে চৈত্র মাসের মধ্য পর্য্যন্ত, এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর থাকে। মশা মাছি, হিম বর্ষার, বা কোন সংক্রামক রোগের আশঙ্কা থাকে না। মৎস্য মাংসাহার এখানে নিষিদ্ধ। অন্যান্য নিরামিষ খাদ্যদ্রব্য, কাশীর মত উৎকৃষ্ট না হইলেও, চলনসই। ভাল ও মন্দ লোক সর্ব্বত্রই আছে, মন্দ অপেক্ষা ভালর ভাগ স্বল্প, তীর্থস্থান বলিয়া এখানে, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।



শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত